দোলগোবিন্দের কড়চা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ভূমিকা ও উৎসর্গ

কল্যাণবর শ্রীভানু রায় ওদের একখানি হাসির গল্প লিখে দিতে বলে আমায়। এ-গল্প প'ড়ে পাঠক-পাঠিকা কারুর যদি একটুও হাসি পায় তো তার যশ অনেকটা ওর প্রাপ্য; যদি না পায়, বিড়ম্বিত বোধ করে তো তার দায়িত্বও।

এই সব ভেবে-চিন্তে বইখানি ওকেই উৎসর্গ করা গেল। ব. ভ. ম.

॥ এই লেখকের ॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী
কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং
রাণুর প্রথম ভাগ
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ
রাণুর তৃতীয় ভাগ
দুয়ার হতে অদূরে
রাণুর কথামালা
আগামী প্রভাত
রিক্‌শার গান
মিলনান্তক
শারদীয়া
চৈতালী
লঘুপাক
রূপান্তর
বসন্তে
বাসর
বর্ষায়
অষ্টক
হৈমন্তী
দৈনন্দিন
বরযাত্রী
কথাচিত্র
সরস গল্প
নয়ান-বৌ
পরিশোধ
হাতে-খড়ি
নীলাঙ্গুরীয়
কাঞ্চন-মূল্য
পঙ্ক-পল্বল
গল্প-পঞ্চাশৎ
তোমরাই ভরসা
ক্ষণঃ অন্তপুরিকা
কবি ও অ-কবি
অযাত্রায় জয়যাত্রা
কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি

দোলগোবিন্দের কড়চা

॥ এক ॥

বালিগঞ্জের একটি অ্যামেরিকান প্যাটার্নের দ্বিতল বাড়ি। সামনে নীচের তলার মত ওপরেও দু প্রান্তে দুটি ঘর, প্রত্যেকটির সামনে বাহারে রেলিং দেওয়া একটি করে গোল ব্যালকনি। দুটি ঘরেরই পাশে নিজের নিজের স্পাইর‍্যাল বা ঘোরানো সিঁড়ি ব্যালকনির ধারে গিয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্যটা যদি কেউ বাইরে থেকে এসে ঘরের কারুর সঙ্গে দেখা করতে চায়, সোজা উঠে যেতে পারে, পড়বে গিয়ে ব্যালকনিতে। সামনেই ঘরের দরজা।

সন্ধ্যা, চেরাগ-বাতির সময় হয়ে গেছে। দোলু বাড়ির সামনের ছোট বাগানটুকু পেরিয়ে ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। দরজাটা বন্ধ, সোজা বাইরের সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে ঘরে কেউ না থাকলে বন্ধই থাকে। দোলু কড়া ধরে নাড়ল। উত্তর নেই। "সরিৎ!"—বলে একটু জোরেই হাঁক দিল। একবারে হলো না, দ্বিতীয়বারের পর সরিতের মতই চটি টেনে টেনে আসবার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঘরের ওপ্রান্তের দরজায় প্রবেশও করল, তবে গতি বড় অলস। এগিয়েই আসছে, তবু দোলু অসহিষ্ণুভাবে একটা শেষ তাগাদা দিল, "খোল না রে রাস্কেল!"

"কে?"

ভারী গলা। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা, দুটো পাল্লাই। ভেতর দিকেই খোলে, তবু এমন ছিটকে উলটে গেল দোলু যে, ব্যালকনির রেলিংটা না থাকলে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ত। ঝলঝলে র‍্যাপারটা জড়িয়ে নিতে নিতে উত্তর করল, "আমি সরিৎকে খুঁজছি, এই ঘরে থাকত কিনা।"

"রাস্কেলদের ঘরই এটা?"—প্রশ্ন হলো।

জিভ কাটল দোলু লজ্জিতভাবে, বলল, "দেখুন না, ফরেন থেকে এল—পুরনো বন্ধু, তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম সব কাজ ফেলে এত দূর থেকে, ও এইটুকু আসবে—তা হেলতে দুলতে গদাই-লস্করি চালে…"

"আসছিলাম আমি—ওর কাকা।"

"আজ্ঞে তা তো দেখছি।…কী ভুলটাই হয়ে গেল! কী লজ্জায় যে ফেলল হতভাগা!"

এগিয়ে গিয়ে ওঁর—"থাক থাক, হয়েছে"—বলে বারণ করা সত্ত্বেও পায়ের ধূলো নিয়ে বুকে ঠোঁটে মাথায় দিল, প্রশ্ন করল, "আছে বাড়িতে ?"

নিশ্চয়, কথা বলার ভঙ্গির জন্যই একটু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখছিলেন, উত্তর করলেন, "আছে হয়তো। ও থাকে সেই একেবারে বাঁদিকের ঘরটায়, দেখতে পার।"

"সেফ্ তো ?"

"বুঝলাম না ; ভাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করছ ?"

"আজ্ঞে না, ভাল থাকবে না কেন ?...বলছিলাম—মুখ ফস্‌কে আবার যদি কিছু বেরিয়ে যায় এইরকম..."

"ও, বুঝেছি, রাস্কেল ফাস্কেল—আবার যদি কাকা-জ্যাঠা কেউ বেরিয়ে আসে। না, সে ভয় নেই। তা, না বললেই তো পার কথাগুলো।"

"না, বলব না তো বটেই ; একটা শিক্ষা হলো। তবে, পুরনো বন্ধু, এতদিন পরে এল..."

"বুঝেছি—অন্য সম্ভাষণ বেরুচ্ছেই না মুখ দিয়ে, তাই না ?.. বেশ, যাও, ছাখো।"

ঘুরে তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমেছে, উনি দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন, ডাক দিলেন, "ওহে, শোন !"

উঠে এলে প্রশ্ন করলেন, "তাড়াতাড়ি আছে কিছু ?"

"আজ্ঞে...ঐ আর কি, ওই হতভা...মানে সরিৎটা আবার বেরিয়ে না যায়।"

"সে ব্যবস্থা আমি করছি। একটু ভেতরে এসে বসো তা হলে। এস।"

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিভাবে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ভেতরে গিয়ে একটা সোফায় বসল। উনি একটা ছোকরা চাকরকে ডেকে বলে দিলেন সরিতের ঘরে গিয়ে দেখবে সে আছে কিনা, থাকলে বলে দেবে যেন কোথাও না বেরোয়, তার এক বন্ধু দেখা করতে আসছে।

"নামটা কি বলবে !"—দোলুকে প্রশ্ন করলেন।

"ওটা থাক না এখন।" উত্তর করল দোলু।

"ও! সারপ্রাইজ ? একটা গালাগালের জন্যেও নিশ্চয় জিভ চুলকুচ্ছে ? তা বেশ।...যা তুই।"

চাকরটা চলে গেলে বললেন, "খুব পুরনো বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। কি নাম তোমার ?"

একটু যেন লজ্জিতভাবে ঘাড় হেঁট করে রইল দোলু, তার পর মাথা তুলে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতেই চেয়ে বলল, "দোলু বলেই ডাকবেন আপনি। সরিতের কাকা, আমারও তো তাই।"

"সে তো একশ' বার। তবু জানতে বাধা কি নামটা ?"

দোলু একবার চকিতে হালফ্যাশানে সাজানো গোলাকৃতি ঘরটার ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল, "আজ্ঞে, এ ঘরে বসে শোনবার মতন নয়। কত সেঞ্চুরি আগের ছাতাপড়া একটা নাম তার তো হিসেব নেই···"

"তবু ?"

"দোলগোবিন্দ।"

বলে এমন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল যে উনিও অল্প একটু না হেসে পারলেন না। বলল, "দিদিমা। তিরাশি বছর বেঁচে ছিলেন এই উপকারটুকু করবার জন্যে। দাঁত নেই, কান নেই, চোখ নেই; তিনদিন পরেই মারা গেলেন।"

এবার গাম্ভীর্য রক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও হাসিটুকু অল্প একটু দুলিয়েই দিল ওঁকে, বললেন, "তা এমন মন্দ নাম কি ? যাক সে কথা, জিজ্ঞেস করছিলাম, সরিতের খুব পুরনো বন্ধু তুমি তা হলে ?"

"আমার দিক থেকে তো তাই, তবে ও রাস···মানে সরিৎটা কি আর স্বীকার করবে ? ফরেনে দু বছর কাটিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে এল।"

চাকরটা এসে জানাল—সরিৎ ঘরেই আছে। বলল নাম জিজ্ঞেস করে আসতে।

দোলু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "বলেন তো উঠি। একবার 'না' বলে বসলে তখন আবার···"

"তা হবে বৈকি তোমার অভিমান। তবে সেরকম ব্যবহার কারুর সঙ্গে তো করছে না। তবু দেখই না হয় সোজাসুজি গিয়ে, ভাবটা কি।"

চাকরটাকে প্রশ্ন করলেন, "বাইরের দিকের ঘরটা খোলা আছে ?"

চাকরটা জানাল—খোলাই ছিল, ওকে বলায় ও বন্ধ করেই এল।

একটু দৃষ্টি-বিনিময়ের পর চুপচাপই গেল, চিন্তান্বিত কয়েকটা মুহূর্ত, দুজনেরই দৃষ্টি নত, একসময় উনিই মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "তা হলে ?"

"গালাগালে ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষণটা সেইরকম। ধমকধামক খেয়েছে কি কর্তার কাছে?...কিন্তু এখন তো সাবালক হয়ে উঠল ঘুরে এসে।...কি করছে রে?"

চাকরটা জানাল—চেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ছে।

"ওর মুণ্ডু করছে। বুঝেছি।" কতকটা যেন ওঁর উপস্থিতি ভুলেই কথা ক'টা বলে একটু অপ্রতিভভাবে চেয়েই উঠে পড়ল। বলল, "থাক, ভেতর দিয়েই যাই। দরকার নেই।"

উনিও উঠে পড়লেন, প্রশ্ন করলেন, "তোমার বাড়ির ভেতরেও যাওয়া-আসা আছে তা হলে? এতক্ষণ বল নি কেন?"

ঝোঁকের ওপর এগিয়েই গেছে ভেতরের দরজা পর্যন্ত, ঘুরে একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল, "গোড়াতেই সে ভুলটা করে বসলাম! আশা তো ছিল না, ডেকে কথা কইবেন।"

॥ দুই ॥

একটু সাড়াই জাগিয়ে দিল বাড়িটাতে। বড় বাড়ি; গোটা চার ঘর, বারান্দা, একটা হলঘর পেরিয়ে শেষদিকে সরিতের ঘর। ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ—যার সঙ্গেই দেখা—কোথায় ছিল এতদিন? আসে নি কেন? আছে কেমন? ইত্যাকার প্রশ্ন। প্রশ্ন করল না শুধু সরিতের বোন শীলা, নিজের ঘরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের কোণ তুলে বাইরের দিকে কান পেতে বই খাতা গোছাচ্ছিল, দোলুর পায়ের শব্দ কাছাকাছি হতে ঘাড় হেঁট করে মনোযোগটা আরও বাড়িয়ে দিল, "কেমন আছিস্?"—বলে অন্যমনস্কভাবে হনহন করে এক দোরে ঢুকে অন্য দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল দোলু।

বারান্দায় এসে পড়তে সরিতের ছোটভাই সলিল ছুটে এসে ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। তার অনেক প্রশ্ন, অনেক ফরমাশ, অনেক নালিশ। এলে ওকে আলাদাই সময় দিতে হয় অন্য অন্য দিন, আজ একরকম ঝুলিয়ে নিয়েই এগুতে এগুতে অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে এক-আধটা কথার উত্তর দিয়ে চলল—আসে না যে বলছে, এই তো সেদিন এসেছিল।...সে তো নেমন্তন্নর দিন, সলিল বলল। তা নেমন্তন্ন করলেই তো পারে আবার—দোলু উত্তর দিল...হ্যাঁ,

ভাল করেই খাবে নেমন্তন্ন এবার, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে রাখুক। দাদা বলছে…

সরিতের ঘরের সামনে এসে ছেড়ে দিল কথাটা।

সরিৎ একটা খুব দামী ড্রেসিং-গাউন পরে মেঝের শতরঞ্জির ওপর চটি টেনে টেনে পায়চারি করছিল, মুখে একটা চুরুট। দু বছর পরে দেখা, অভ্যর্থনা কিন্তু নিতান্তই অনুচ্ছ্বসিত। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে একটু ব্যঙ্গও। "এই যে এসে গেছিস, আয়।"—ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে একটু বক্রদৃষ্টির সঙ্গে কথাটা বলে সলিলকে বলল, "এইবার যাও সলিলবাবু, পথ চিনিয়ে দেওয়া তো হলো দোলুদাকে।"

সলিল চলে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, "তা সত্যিই পথ ভুলে বসেছিলি নাকি? আজ ঠিক পনের দিন হলো নেমেছি জাহাজ থেকে…"

"একগ্লাস জল আগে, অন্য কোন কথা নয়।"

খোলা দেয়াল আলমারিতে সোরায়ের ওপর নজর পড়তে নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাচের টামব্লারটায় পুরো এক টামব্লার ঢেলে ঢকঢক করে পান করে ফেলল। সরিৎ বেশ একটু কৌতূহলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখল; দোলু—"আহ্!" করে গেলাসটা নামিয়ে রাখতে প্রশ্ন করল, "ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ শীতকালে এত তেষ্টার ঘটা।"

"অমন কাকা পেলি কোথায় আগে তাই বল তো", বুড়ো আঙুলটা কাঁধের ওপর ওপ্রান্তের ঘরটার উদ্দেশে উলটে প্রশ্ন করল দোলু, বলল, "এ বালাই তো তোর ছিল না।"

"মাসতুতো কাকা।" হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে উত্তর করল সরিৎ।

"হেঁয়ালি রাখ। মাসতুতো কাকা, পিসতুতো মামা! একে মাথা গুলিয়েই রয়েছে।"

"বাবার মাসীর ছোট ভাই। এখানে নতুন…"

"দাঁড়া দেখি"—হাত উঁচিয়ে থামতে বলে একটু চোখ তুলে রইল দোলু, বলল, "সে তো বাবার মামা, তোর ঠাকুর্দা হলো, কাকা বলছিস কি হিসেবে? বিলেতে তাই বলছে আজকাল?"

সরিৎ একটু চিন্তা করল, তার পর তর্জনীটা তুলে বলল, "হয়েছে! মাঝখানে

একটা ছেড়ে গেছে। মাসীর ভাই নয়, ছোট ছেলে। হলো না কাকা আমার ?… যাক্, পাল্লায় পড়েছিলি তো ?"

"দোর খোলবার আগেই 'রাসকেল' !"

"বললেন তোকে !"

"শুনলেন আমায় কাছে। কি করব ? তুই হতভাগা যে ডাইনে থেকে বাঁয়ে চলে এসেছিস ; এদিকে ডাকের পর ডাক দিয়ে যাচ্ছি, উত্তুর নেই।"

"তার পর ?"

"তার পর…সেইজন্যেই তো এসে এই এক টামব্লার জল ভেতরে সাঁদ করানো। একদিকে আলগা মুখ, হাজার চেষ্টা করেও এতদিনে বাগে আনতে পারলাম না, অন্যদিকে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একরাশ দাড়ির পেছনে এক জাঁদরেল কাকা ! আরও ঘাবড়ে গিয়ে আবোল-তাবোল কী সব বলে গেছি হুঁশ তো নেই…"

"কিছু বললে নাকি ?"

"কিছু নয়। তাই তো আরও দিলে ঘাবড়ে। গাল দিয়ে ফেলেছি, যখন ভাবছি দু-ঘা দিলে বুঝি বসিয়ে, ডেকে আলাপ-পরিচয়—মিষ্টি কথায়। সোজা লোককে চেনা যায়, যার—"

"বাস্তুঘুঘু, সাবধানে থাকবি।"

"মানে ?"

"সে অনেক কথা। মা আনিয়েছে, ভূত ঝাড়াবার জন্যে।"

"কার ?"

"আমার। ওরা যা বলছে আর কি। আয় বোস্। কিছু খাবি তো ?"

"যখন বেঁচে এসেছি, খেতে হবে বৈকি।"

সরিৎ দরজার কাছে গিয়ে ছোকরা-চাকরটাকে ডেকে ভেতর থেকে চা আর জলখাবার নিয়ে আসবার কথা বলে দিল, তার পর একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে পা ছড়িয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে আরম্ভ করল।

দোলু যেন ধাঁধায় পড়ে গেছে একটা। বছর দুই আগে বিলাত যাওয়ার সময় যে-সরিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তাকে যেন খুঁজে পাচ্ছে না। প্রথমত, বেশ একটু স্টাইল হয়েছে। দুই বন্ধুর প্রকৃতির মিলের মধ্যে যে জিনিসটা সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ত তা এই স্টাইলের অভাব। দোলুর অবস্থা খারাপ নয়, তবে সরিৎরা রীতিমতো বড়লোক। বাবা পশুপতি রায় বিখ্যাত

হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট (Hardware Merchant) রয়, গুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার। শহরতলীতে বিরাট কারখানা। ব্রেবোর্ন রোডে এক ছ-তলা বাড়ির ওপরে একটা প্রকাণ্ড হল জুড়ে খুব বড় অফিস। কাজ সামলাতে ট্রাক, ভ্যান্, জিপ্, সেডানবডি মিলে খানদশেক গাড়ি হিমশিম খেয়ে যায়। পড়াশুনো শেষ করে বছরখানেক অফিসের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টগুলো ঘুরে খানিকটা ধারণা করে নিয়ে বাপের সহকারী হয়ে একটা চেম্বার নিয়ে বসেছিল। দিনদিনই বন্ধুর থেকে এদিক দিয়ে আলাদা হয়ে গেছে, কিন্তু কখনও বুঝতে দেয় নি। যা কিছু স্টাইল—অফিস-মর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, তা ছিল অফিস পর্যন্তই, তার পর আর দুই বন্ধুর মধ্যে ইতর-বিশেষ কিছু ছিল না। না পোশাকে, না চালচলনে, না ঢিলেঢালা প্রাণখোলা আলাপ-সম্ভাষণে।

আজ বেশ বদলে গেছে; অনেকখানি। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর গুরুতর কিছু যে একটা হয়েছে এটা যেন আন্দাজ করা যায়। তবু—নাম নাই বলা হোক, যে-কোনও এক বন্ধু দেখা করতে এসেছে শুনে সরিৎ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে এটা মোটেই ভাবা যায় না। সরিতের গায়ে ড্রেসিং-গাউন, যখন একটা যেমন-তেমন ফ্লানেলের পাঞ্জাবিতে চলে যায়, মুখে সিগার—এও না হয় মেনে নেওয়া যায় বিলাত-প্রবাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে। কিন্তু দোলু এসেছে, তাকে সেই সিগার দাঁতে চেপে বসতে বলে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেই ড্রেসিং-গাউনের নীচে পা দোলানো, এটা যে একেবারেই কল্পনাতীত! তবু একটু অপেক্ষাই করল দোলু, আড়চোখে বার দুই ওর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে। একবার লোভও হলো আগেকার মত সাদর সম্ভাষণের সঙ্গে ঘাড়ে একটা চড় মেরে চটকাটা দেয় ভেঙে; তার পর, বোধ হয় গোড়াতেই কাকা-ঘটিত ব্যাপারটুকুর জন্য মনটা একটু দুর্বল থাকায় হঠাৎ কোথা থেকে একটা অভিমানই এল ঠেলে। উঠে পড়ে বলল, "তা হলে তুই বোস্। চা ভেতরেই খেয়ে নিয়ে বেরুব একবার; কাজ আছে।"

পা বাড়াতেই বাঁ হাতটা ধরে ফেলল সরিৎ, বলল, "অমনি উঠল! গোসা হয়েছে বাবুর। অথচ বম্বেতে নেমেই এই লোকটাকে এক্সপেক্ট্ করেছি আমি, ট্রাঙ্ক-কল দিয়েছি, সাড়া পাই নি, এখানে এসে প্রতিদিন খোঁজ নিচ্ছি, পাত্তা নেই।"

পেছু হটে আবার বসে পড়ল দোলু। বলল, "তোর কাছ থেকে শেষ খবর, প্লেনে আসছিস, দমদমে সতোরোই নভেম্বর ল্যাণ্ড করবি। গিয়ে শুনলাম

কি একটা মাইনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে প্লেন আসে নি। জানি পেল্লাদ-মার্কা ছেলে, মরবি নি, তবু দমদম্ থেকে এখানে ফোন করলাম, টের পেলাম ও প্লেনটায় শেষ পর্যন্ত বেরুস নি।…"

"বেরুলেই ভাল করতাম।"—উদাসভাবে বলল সরিৎ, মুখ থেকে সিগারটা সরিয়ে ধোঁয়াটুকু আস্তে আস্তে বের করে দিতে দিতে। দোলু একটু বিস্মিত-ভাবে চাইতে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "নেহাত মাইনার নয়, দুটো লোক মারা যায়, তিনজন জখম হয়।"

"তা তুই ছোঁড়া তার জন্যে এত হেদিয়ে পড়েছিস কেন? তাদের ডাক পড়েছিল, গেছে। জানাশোনা কেউ ছিল তাদের মধ্যে?

মাথাটা নাড়ল, "না, কেউ ছিল না।" তার পর আঙুলের টোকা মেরে সিগারের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে দিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "নিজের কথাই বলছি, কেন যে ক্যান্সেল্ করতে গেলাম…"

বিস্ময়টা বেড়েই যাচ্ছে। ঠিক এ ধরনের নেকামি কখনও দেখে নি ওর মধ্যে বলে একটু বিরক্তিও এসে পড়ছে হেঁয়ালির ভাবটা টেনে রাখার জন্য। বলল, "ক্যান্সেল্ না করলে নিজেই ক্যান্সেল্ড্ হতিস তো। সত্যি তো আর পেল্লাদ নয়।"

"কি ক্ষতি হতো একটা লোক মরলে? উফ্।"

"একেবারেই কিছু নয়।" আগেকার ভাষাটাও বেশ সরল-সচল হয়ে এসেছে; প্রশ্ন করল, "কিন্তু জ্যান্ত ফিরে এসেছিস বলে বাড়ির সবাইকে চটিয়েছিস কি?"

বিরক্তভাবে একটু চুপ করেই রইল; সরিৎ আস্তে আস্তে সিগার টেনে যাচ্ছে। এক সময় আবার আরম্ভ করল, "বম্বেতে যাই নি, তার পর আমার কাছে তো কোন খবরই নেই, পরের দিন এখানে এসে শুনলাম, কেব্ল্ (Cable) এসেছে, জাহাজে আসছিস, কবে কোন্ জাহাজে কিছুই নাকি বলতে পারছিস না অত তাড়াতাড়ি। ওঁরা উল্টে আমায় জিজ্ঞেস করছেন, আমার কাছে কোন খবর এসেছে কিনা সে সম্বন্ধে।…আমার কাছে খবর! সে ছোঁড়া এখন সেখানে গাউন চড়িয়ে সিগার মুখে দিয়ে পা দোলাবার স্টাইল আদায় করছে, মনে আছে কি যে দোলু বলে একটা ভ্যাগাবণ্ড…"

॥ তিন ॥

"হোল শেষ?" ঘুরে অ্যাপীলের দৃষ্টিতে চাইল সরিৎ, বলল, "আমায়ও একটু চান্স্ দে বলবার।"

"মুখ বুজে সিগার টানতে থাকলে বলবি কি করে? নইলে সবটাই তো তোরই বলবার।"

"সিগার আর গাউন দেখলি শুধু! কী কষ্টে যে কাশি চেপে টেনে যাচ্ছি সেটা বুঝতে তো পারছিস না।"

"দেখছি তো রাঙা হয়ে উঠছে মুখটা মাঝে মাঝে, তা সেটা ঐজন্যেই তা কি করে জানছি? তা ভিন্ন এ কসরত তোকে করতেই বা বলেছে কে, নিজের বাড়িতে বসে বসে?"

প্রশ্ন দুটোর উত্তর এড়িয়েই গেল সরিৎ। সিগার টানতে টানতেই সামনে দৃষ্টি মেলে শুনছিল, ও থামলে বলল, "বাকি থাকে ড্রেসিং গাউনটার কথা।... এদিকে সরে আয়।"

নিজেই ওর দিকে খানিকটা ঝুঁকে ওর ডান হাতটা টেনে নিয়ে গাউনের ভেতর বুকের কাছটায় সাঁদ করিয়ে দিল। দোলু বের করে এনে তেলোর ওপর আঙুলগুলা ঘষতে ঘষতে বিস্মিতভাবে বলল, "ঘেমে গেছিস যে!"

"বল্ এও একটা স্টাইল।"

"তার চেয়েও বিটকেল কিছু যে! কিন্তু জিজ্ঞেস করি এ দুর্গতি কেন—শখ করে বসে বসে এইরকম গলদঘর্ম হওয়া!"

"শখ করে? পড়তিস আমার মতন অবস্থায়!"

"না হয় সেটাই খুলে বল, সাবধান থাকি। এ যে ডাহা পাগলের লক্ষণ!"

চুপ করেই রইল সরিৎ, কী যেন একটু ভাবল। তার পর, ঝুঁকেই ছিল দোলুর দিকে, আরও হেলে পড়ে ওর ডান হাতটা দু হাতে চেপে ধরে বলল, "পাগলই করে দিয়েছে ভাই; আমাতে আর আমি নেই; কী যে।..."

"দাঁড়া, দাঁড়া!"—এমনভাবে নিজের ধড়টা একটু পেছন দিকে টেনে নিয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল দোলু যেন কী আজগুবি এক জিনিস দেখছে; বলল, "এ যে পাগলেরও বাড়া লক্ষণ! কারুর কু-নজরে পড়ে যাস নি তো?—তোরা ন্যাকামি করে যাকে বলিস ভালবাসা। তাই তো বলি—

ছোঁড়া কী গেল এখন থেকে, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, ফিরে এল একটা…"

"ন্যাকামি বলছিস? একটা অসহায় মানুষের পক্ষে যা জীবন-মরণ সমস্যা একেবরে—একটু বাধল না তাই নিয়ে এরকম নিষ্ঠুর ঠাট্টা করতে তোর? আমি একটা তপ্ত মরুর বুকের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কোথায় ওয়েসিস্, কোথায় গেলে একবিন্দু জল পাব⋯"

"হয়েছে! যা ভেবেছি! এবার থাম।"—নিজের চিবুকটা দু আঙুলে টিপে হাঁ করে শুনছিল দোলু, থামিয়ে দিয়ে বলল, "নির্ঘাত মরেছে ছোঁড়া! সিনেমার ভাষা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে নুন-আদা খেয়ে! বুঝলাম, আর আওড়াতে হবে না। এইবার, কোথায় মাথা মুড়ুলি বল্ দিকিন্ খোলসা করে। আমি তখনই জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, বিলেত পাঠাচ্ছই তো দেগে দিয়ে পাঠাও, সোঁদা ছেলে পাঠিও না এমন করে। তোমরা কামরূপ-কামাখ্যার কথা বলো, সে যা জায়গা, অমন দশটা কামরূপ-কামাখ্যা পেটে পুরতে পারে।"

"তোর গা ছুঁয়ে বলছি দোলু, বিশ্বাস কর আমায়, বিলেত নয়। তোরা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে যেমনটি পাঠিয়েছিলি ঠিক তেমনিটি ফিরে আসছিলাম—তার পর—ওফ!"

"তার পর?"

"ঐ তো বললাম প্লেন্ ক্যান্সেল্ করেই কাল হলো।"

"কিসে? চটপট বের করে ফেল, আর ঝুলিয়ে রাখিস নি। ক্যান্সেল্ করবার দুর্বুদ্ধিই বা হলো কেন?"

"ভাবলাম এয়ারে তো এলাম, এবার সি-ভয়েজটা কি রকম একবার দেখে নিই। পেয়েও গেলাম একটা ভাল জায়গা। একজন গোয়ানীজ ম্যাগনেট আমারই মতন শেষ মুহূর্তে আসা ক্যান্সেল্ করেছে, তারই কেবিনটা। তার পরেই তার সঙ্গে দেখা। আমায় একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দিয়েছে ভাই।"

"সেই ব্যাটা গোয়ানীজ? জোচ্চোর ছিল নাকি? কিন্তু এই তো বললি, সে এল না বলেই তার কেবিনটা পেয়ে গেলি তুই।"

"ঠাট্টা করছিস আবার?"

"নাও ঠ্যালা! মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে, উল্টে কথায় কথায়—'ঠাট্টা করছিস!"

"শুধু টাকা গেলেই নিঃস্ব হয় দোলু? আমায় নিঃস্ব করেছে মিস্ আইচ, মিস্ কেতকী আইচ! এ নিঃস্ব যে কী নিঃস্ব হওয়া!"

"মিস কেতকী আইচ! মিস্!"—বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে চেয়েই রইল একটু দোলু, প্রশ্ন করল, "তোর সঙ্গে এক জাহাজেই এল?"

"আমার কেবিনের পাশেই তার কেবিন।"

"সর্বনাশ করেছে! তার পর?"

"তার পর দেখতেই পাচ্ছিস।"

"সঙ্গী? কার সঙ্গে এল?"

"একাই। কী যে স্মার্ট কী করে বোঝাই তোকে? বিলেতে বছরখানেক কাটিয়ে লীডস ইউনিভারসিটি থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে একাই সমস্ত কন্টিনেণ্টটা ঘুরে ফিরছে। বাপ স্নেহময় আইচ খুব একজন বড় ইণ্ডাসট্রিয়ালিস্ট, পার্ক সার্কেসের ওদিকে নিজের বাড়ি, কারবার বেশির ভাগ বাইরের সঙ্গে—অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান। কেতু এর আগেও ঘুরে এসেছে, বাপের সঙ্গে, বড় ভাইয়ের সঙ্গে। এবারে গিয়েছিল ভাইয়ের সঙ্গেই, তার পর কী খেয়াল হলো—খেয়ালী মেয়েই তো ভয়ানক! কী খেয়াল হলো, থেকেই গেল ঐ একটা ছুতো করে, ডিগ্রি নেবে। আমায় বললও তো—বড় ফ্র্যাঙ্ক মেয়ে, মনটা যেন খোলা বই একটা—আমায় বলল, 'সরিৎ, তোমায় ভেতরের কথাটা বলি, ওসব ডিগ্রি-ফিগ্রি ছুতো, আসলে…' "

"দাঁড়া।"—অবাক হয়ে শুনছিল দোলু, থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, "জাহাজটা আসতে কদিন লাগল?"

"কেন, সাত দিন, আজকাল মেলগুলো আসতে যা নেয়।"

"এর মধ্যে ঐভাবে নাম ধরে ডেকে তোর সঙ্গে আলাপ করছে? একটু ভদ্রতা করে মিস্টার রায় নয়, বাবু নয়, আপনি নয়? একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে পারলি নি? বয়েস কত? ওদের তো আবার বয়েস ধরতে পারা যায় না। তোর চেয়ে ছোট মনে হলো, না, বড়?"

"চটলি তার ওপরে?"—করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল সরিৎ, বলল, "তা হলে কী আশায় তোকে এত করে বলে যাচ্ছি দোলু? ভালবাসা কি ভাষার ব্যবধান মানতে চায়? বিদায়ের সময় হাতটা দু হাতে ধরে ছলছল চোখে বলল 'রিৎ, মনে রেখো'…আমি বললাম, 'আমার মন কোথায় যে…' "

"কি মনে রেখো?" বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল দোলু।

"রিৎ, তখন আর পুরো সরিৎ বলবারও অবস্থা নেই তো।"

"যত সব!"—বলে বেশ রেগেই কি বলতে যাচ্ছিল, চাকরটা একটা ট্রেতে চা আর জলখাবার নিয়ে এল। দোলু বলল, "থাম, খেয়ে নিতে দে।"

বেশ পরিতোষের সঙ্গে নীরবে শেষ করে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল, "নে, কি বলছিস বল।"

সরিৎ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সিগার টেনে যাচ্ছিল, কোন উত্তর না পেয়ে দোলুই আবার এগিয়ে দিল, "ও বলল—রিৎ, মনে রেখো। তার উত্তুরে তুই বললি, আমার মন কোথায় যে মনে রাখব?···সাবাস! বেশ মুখের মতন জবাব!···তুমি, মাই ডিয়ার সাত দিনের মধ্যে যে কাণ্ডটি ঘটিয়ে বসলে—মনই নেই তো রাখব কিসে করে? খাসা উত্তুর দিয়েছিস!"

—বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে ডালা খুলে একটা টেনে নিল, ঠোঁটে চেপে আগুন ধরিয়ে প্রশ্ন করল, "তার পর?"

সরিৎ না ঘুরেই বলল, "থাক্; কেবলই রাগ, ঠাট্টা!"

"এই ত্যাখো!···তা সত্যি কথা যদি বলতেই হয় তো হয়েছিল একটু রাগ। খালি পেটে টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার পর ঐ মাসতুতো কাকা, সেসব থেকে যদি রেহাই পেলাম তো···তা, এমন বলেছিই বা কি? ক'টা দিনের মধ্যে 'সরিৎ' থেকে 'রিৎ' হয়ে গেল; আরও খানিকটা এগুলে সব ছেঁটে গিয়ে যখন শুধু 'খণ্ড-ত'টুকু বাকি থাকবে তখন উচ্চারণ করবে কি করে ভেবে দেখেছে? মরুক গে, যার ভাবনা সে ভাববে, তুই বল্। দেখছি তো, মাথায় ছুবলেছে, তবু যদি একটা উপায় বের করতে পারি। দেখতে-শুনতে কি রকম?

"সে কী করে বর্ণনা করব তোর কাছে?

"কেন?" আবার একটু ঝেঁঝে উঠল দোলু, সিগারেটটা সরিয়ে মাথাটা দোলাতে দোলাতে ওর আতুর ভাবটার নকল করে বলল, "কেন পারবে না শুনি? মানুষে চোখে না দেখে উর্বশী-মেনকা-রম্ভার পায়ের নখ থেকে মাথার ব্রহ্মতল পর্যন্ত বর্ণনা করে ছেড়ে দিলে আর তুমি···বেশ, তাও যাক, আর মুখ ঘুরিয়ে বসতে হবে না। এখানে এসে দেখা হয়েছে?"

"দিল্লী-এলাহাবাদ হয়ে কাল সন্ধ্যেয় এখানে আসবার কথা ছিল। কাল ফোন্ করেছিলাম—এন্‌গেজড্।"

একটু চকিত হয়ে মুখ থেকে সিগারেটটা সরিয়ে নিল দোলু, বলল, "তবে আর হ্যাংলার মতন এগিয়ে যাওয়া কেন? কার সঙ্গে এন্‌গেজড···বাড়ি ফিরতে-না-ফিরতে?"

"ফোন্ এন্‌গেজড্? পাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম"—একটু আড়চোখে চেয়ে নিয়ে উত্তর করল সরিৎ।

"ও! বেগ ইওর পার্ডন। তা, বাড়িতে বলেছিস?"

"নিজের মুখে বলা চলে এসব কথা? কে বুঝবে? বলে, যে বুঝবে বলে এতদিন পর্যন্ত ভরসা ছিল সেও তো দেখছি…"

"থাক্, সে বুঝেছে। হবে উপায়, যদি হাতে থাকে। ইতিমধ্যে তুমি গাউন নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হও তো। যখন দরকার হবে আবার টাঙিয়ে নিলেই হবে। আর সিগারটাও…"

"ও-ই এই ব্র্যাণ্ডটা জাহাজে রেকমেণ্ড করেছিল।"

আবার স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল দোলু, জিজ্ঞেস করল, "টানে নাকি?"

মুখটা ভার দেখে সামলে নিয়ে বলল, "সিগারেটটা চলে ওদেশে, তাই বলছি। মরুক গে। তা যখন দেখা করতে যাবি তখন একটা ধরিয়ে নিলেই তো হবে। ড্রেসিং গাউন—সেও যদি আসে কখনও দেখা করতে, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেই আসবে, গায়ে চড়িয়ে নিয়ে তোয়ের থাকবি; বাইরে পরে যাওয়ার জিনিসও তো নয়। এখন অযথা ঘেমে কেশে সারা হচ্ছিস…"

"প্র্যাক্‌টিস্ না থাকলে…"

"মর কেশে তা হলে, নয় তো দম বন্ধ করে। এমন মানুষের পাল্লায় পড়েছিস, স্রেফ স্টাইলের খাতিরে ঘেমে কেশে না নাকাল হলে 'লভ' হবে না—এখন ভুগবে কে? আমি উঠি এখন। জ্যাঠাইমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাব।"

সরিৎও উঠে ওর সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করল, "তুলছিস কথাটা তা হলে মার কাছে?"

বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল দোলু, বলল, "রোস্! আগে আট-ঘাট বেঁধে নিই। লভে পড়েছিস তুই, আমি তো নয় যে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসব? · হ্যাঁ, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম, ওদের ঠিকানাটা দে।"

ঘুরে এসে লিখে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সরিৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেতাদুরস্তভাবে তর্জনীটা মাথার ওপর তুলে বলল, "টাটা!"

যথাসাধ্য স্টাইল বজায় রেখেই উত্তরটাও দিল দোলু, তার পর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে বলতে এগিয়ে গেল, "কাঁচা মাথাটা কষদাঁতে চিবিয়ে খেয়েছে একেবারে।"

॥ চার ॥

রায়-পরিবার এক পুরুষেই বড়লোক। তবে হঠাৎ-বড়লোকে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে সে ধরনের নয়। সরিতের পিতা সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে উঠেছেন। এটা হয়তো তাঁকে দেখলে বোঝা যায় না; বড় কারবার, শখ করেই হোক বা প্রয়োজনবোধেই হোক আচার ব্যবহার, পোশাকে-পরিচ্ছদে একটা স্টাইল রেখে যান, তবে বাড়ির ভেতরে গেলে বোঝা যায় পরিবারটির নোঙরটা কোথায় পোঁতা রয়েছে।

গিন্নী বরদাসুন্দরী একেবারে সেকেলে মানুষ; এবং শক্ত মানুষ। হুগলী জেলার এক সুদূর অখ্যাত গ্রামে পিত্রালয়। সেখান থেকে ওঁর যখন নয় বৎসর বয়স সেই সময় পশুপতি রায় ওঁকে বিবাহ করে নিয়ে আসেন। বর্ণ-পরিচয় নেই; সে যুগে শহর অঞ্চলে সবে গার্গী-মৈত্রেয়ী-খনার নাম খুঁজেপেতে বের করে মেয়েদের একটু চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করছেন দেশের মাতব্বরেরা; বরদাসুন্দরীর পিত্রালয়ের দিকে তখনও মেয়ের অক্ষর-পরিচয় মানে সাধ করে করে বৈধব্য ডেকে আনা। বিয়ের পর বছরখানেক হুগলী শহর। তার পর এই আটচল্লিশ বছর একটানা কলিকাতা। আগে বাগবাজার, তার পর ভবানীপুর, তার পর এই বালিগঞ্জ। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত পরিবর্তন হলো, তার অনেকখানিই মেনে নিয়েছেনও বরদাসুন্দরী—নিরুপায় হয়ে, আবার ইচ্ছা করেও; কিন্তু নিজের মধ্যে এক বয়স যা পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার অতিরিক্ত কিছু আসতে দেন নি। ফলে, বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে কর্তার, ভেতরের সঙ্গে বাইরের বিস্তর প্রভেদ। এমন অবস্থায় সংসারে সাধারণত অশান্তিরই সৃষ্টি হয়; রায় পরিবারের সেটা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্তত তার বহিঃপ্রকাশ বিশেষ কিছু নেই; এবং আভ্যন্তরিক কিছু যদি থাকে তো কর্তার মধ্যেই থাকতে পারে অল্পবিস্তর।

দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন-মেজাজের বিভিন্নতার জন্য যে-সংসারে অশান্তি বর্তমান, সেখানে আসল কারণ এই বিভিন্নতা নয়, পরন্তু ব্যবস্থাটাই উল্টো বলে; অর্থাৎ কর্তাই প্রধান। বিধাতা স্ত্রীলোকের হাত দুখানি পেশীবহুল করেন নি পুরুষের হাতের মত, কেশ-কর্কশও করেন নি, কিন্তু পুরুষের মুখে লাগাম কষে সংসারের রথটা পূর্ণবেগে চালিয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম ক্ষমতাটুকু তারই

হাতে তুলে দিয়েছেন। যে পুরুষ একথাটা নির্বিবাদে মেনে নেয় তার পেছনে রথটাও চলে ভালো, সামনে জিহ্বাও থাকে সংযত; ফল অটুট শান্তি। যে মানে না, নিজের হাতে লাগাম তুলে নিতে চায় সে ভ্রান্ত, কেননা স্ত্রীর মুখে লাগাম কষবে—রথটা চালাবার জন্যই হোক বা জিহ্বাটা সংযত করবার জন্যই হোক, এমন পুরুষ বিধাতার কল্পনাতেও আসে নি আজ পর্যন্ত।

পশুপতি রায় হয়তো বুঝেছেন। "হয়তো" বলার কারণ এই যে, ফলাও কারবারের মধ্যে দিয়ে বাইরের জীবনটা গড়ে তুলতে তাঁর সমস্ত সময়টা এমন কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটেছে যে, ভেতরের লাগামটা তাঁর হাতে থাকা উচিত কি মুখে, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার অবসর হয় নি।

ব্যবস্থাটা মেনে নিয়ে ভাল আছেন, এর সঙ্গে স্ত্রীর পিত্রালয় থেকে আমদানি করা কিছু বিশ্বাস এবং সংস্কারও। অন্তত বাইরে মেনে নিয়েছেন।

এর মধ্যে যেটি প্রধান, সেটি একটি অষ্টধাতুর তাবিজের রূপ পরিগ্রহ করে সোনার চেনে পশুপতি রায়ের বুকের মাঝখানে ঝুলছে। অফিসের পোশাক পরলে যেখানে গলায়-বাঁধা টাইটা (Tie) এসে পড়ে।

মা ওলাইচণ্ডীর তাবিজ। বরদাসুন্দরীর বিশ্বাস, বাইরে এত যে অনিয়ম—অত্যাচার, তার সমস্ত কুফল নষ্ট করে এই তাবিজ তাঁর বৈধব্য নিরোধ করে যাচ্ছে। রোজ বেরুবার সময় বরদাসুন্দরী নিজে উপস্থিত থেকে তাবিজ-ধোওয়া জলটুকু পান করিয়ে দেন। এতটা আত্মবিলোপ ঘটিয়ে স্ত্রীকে সধবা করে রাখতে যদি উৎসাহের অভাব বোধ করেনই পশুপতি রায় তো সেটা বাইরে প্রকাশ হতে দেন না। ভাবেন এতেই যদি এদিককার শান্তিটা বজায় থাকে তো দরকার কি অধৈর্যতার ?

বেরিয়ে এসে তিনি আবার যে পশুপতি রায়, সেই পশুপতি রায়। কড়া প্রিন্‌সিপল্‌, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বরাট ; রয়-গুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্ণধার।

দোলু বাইরে আসতে সলিল আবার সঙ্গ নিল। অপেক্ষাই করছিল, বলল, মা নীচে, সে দোলুর আসার কথা বলে এসেছে। বলেছেন, দাদার কাছ থেকে বেরুলেই ডেকে নিয়ে আসবে। ততক্ষণ ঘরে যেতে উনিই মানা করে দেন।

বাড়িটারও সামনের সঙ্গে পেছনের অংশের মিল নেই। সামনেরটার কথা বলাই হয়েছে, পেছন দিকে একটা বড় উঠানের চারিদিকে চকমেলানো কয়েকটা ঘর। উঠানের একপাশে শ্বেতপাথরে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ, পাশেই একটা

মালসায় ফণীমনসার গাছ, সিঁদুর পরানো। উঠানটায় একটা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে।

তুলসীমঞ্চটার কাছে আলপনা দেওয়া হচ্ছে।

জন-ছয়েকের সঙ্গে বরদাসুন্দরী নিজেও রয়েছেন ; চওড়া রাঙাপেড়ে গরদের শাড়িপরা, পাশে কালো পাথরবাটিতে পিটুলি-গোলা। উঠানে নামতে তিনটে ধাপের সিঁড়ি। একটা বাকী থাকতেই বরদাসুন্দরী বললেন, "থাম্, নামবি নি দোলু।"

"জুতো খুলে ?"

"গায়ে তোদের রাজ্যির অনাচার, শুধু জুতোতে কি দোষ করেছে ? দাঁড়া আমিই আসছি এটুকু সেরে। কথা আছে।"

মোটা মানুষ, যেখানে বসেন আসনপিঁড়ি হয়েই বসতে হয়। আরব্ধ আলপনাটুকু শেষ করে হাতটা ওখানেই ধুয়ে ফেললেন, তার পর বাঁহাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে পড়ে একটু হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এলেন।

"কোথায় বসি বল্ দিকিন্ ?"—দ্বিধাগ্রস্তভাবে প্রশ্নটা করে নিজেই বললেন, "পূজোর ঘরেই চল। কাল ইতু পূজো, আলপনা দিচ্ছি। এ কাপড়ে আর কোথায় ঢুকব ?"

"উঠোনে নামতে দিলেন না, পূজোর ঘরে ঢোকাবেন জেঠাইমা ?"

"তুই আয়, ডেঁপোমি করবি নি মেলা। ছেলেদের নাকি আবার দোষ ধরেন ঠাকুরেরা ? ওখানটায় আলপনা দিচ্ছিলুম নেহাত। কাল ইতু পূজো তো ?"

"দূর থেকে দেখলাম বটে সাপের মতন···"

"চুপ কর, ঐ নাম করতে আছে যেন রাত্তিরে। আর ইতু পূজোয় ওঁদের আলপনা! তোরা যেন কী হয়েছিস আজকালকার ছেলেমেয়ে বাবা! শাস্তোরের আর কিছু রাখলি নি।"

"আলপনাই তো জেঠাইমা, যদি হয়েও পড়ে থাকে তাঁদের মতন তো ঢোঁড়ার চেয়েও নির্বিষ, তুমি ভেবো না।"

"ডেঁপোমি রাখ দিকিন্। যত বারণ কর, তত আরও বাড়াবে!"

চটিয়েও দেয়, আবার ঠাণ্ডাও করতে জানে, ঘরের কাছে এসে বলল, "থাক জেঠাইমা, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি চৌকাঠের বাইরেই আছি। ঠাকুর তো আর জেঠাইমা নয়, চটতে কতক্ষণ বলুন না।"

"মন সুস্থ্য না হয়, তাই বোস্, ঠাকুর আমার ঠাকুরই আছেন। আমি এই চৌকাঠের এদিকটায় বসছি।"

আসনটা টেনে এনে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন, "ছাখো মরণ! ভুলেই বসে আছি। খাবার-টাবার কিছু দিয়েছিল? আমি তো এদিকটায় ছিলুম।"

চৌকাঠের বাইরে মেঝেতেই বসে পড়ল দোলু। বলল, "হ্যাঁ, চা জলখাবার অনেকক্ষণ..."

তার পরেই কথাটাকে ঘুরিয়ে নিল, "তবে জলখাবার সে একরকম না পাওয়ারই মতন, বোধ হয় শীলা দিয়ে থাকবে, আপনারা তো এদিকে।"

শীলাকে দেখতে পেয়েই বলা, সে একটু হন্তদন্ত হয়েই নেমে এসে বারান্দার ওদিকে চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দেখে বলল, "তুমি এখানে দোলুদা? আমি সারা বাড়িটায় গোরুখোঁজা করছি এদিকে। লক্ষ্ণৌয়ের-কাকা ডেকে বললেন যাওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলে দিতে তোমায় অতি-অবিশ্যি।...হ্যাঁ, শীলার নামে কি লাগানো হচ্ছিল?"

"আপনিই ওকে বলে দিন জ্যাঠাইমা কী এমন ভয়ানক লাগাচ্ছিলুম। আপনার কাছে বসলেই আমি ওর নামে লাগাই, এদিকে পেটে মারছে, গোরু বানাচ্ছে তাতে কিছু নয়।"

"তোর না বয়েসে বড় শীলা? আবার কলেজে ঢুকলেন তো মেয়ে?... খাবার দিয়েছিস্ তা একটু যে দেখেশুনে দিবি—

"তিনটে রাজভোগ মা, বড বড় দুটো সিঙাড়া, চারটে রসকদম্ব!"

চোখ দুটো বড় বড় করে বলল শীলা। জুড়ে দিল, "চার আর দুয়ে ছয় আর তিনে নয়; তার একটাও ফিরে আসে নি!"

"ঐখানে রাগ শীলার জ্যাঠাইমা।"

"দেখ্, আর কিছু থাকে তো, ফিরে আসবার জন্যেই যেন দেয় মানুষকে!"

"তোমাকেও যা বোঝালেন, অমনি বুঝে গেলে! আমি আর এতে নেই। অখিল বেয়ারাকে বলো, দোকানসুদ্ধ্য উঠিয়ে নিয়ে আসুক!"

একটা ঢেঁকুর তুলল দোলু, বলল, "কাজ নেই আর জ্যাঠাইমা; নজর লেগেছে।"

শীলা যেতে যেতে ঘুরে একটা তির্যক দৃষ্টি হানল, বলল, "দিচ্ছে যেন এনে ওঁকে!...দেখাটা করে যাবে কাকার সঙ্গে।"

॥ পাঁচ ॥

ও চলে গেলে দোলু প্রশ্ন করল, "আমায় ডেকেছিলেন ?"

ডাকলুম বৈকি। ছাখো, কেন যে ডাকলুম, দিলে ভুলিয়ে বাজে কথা এনে…"

"বোধ হয় সরিতের কথা কিছু বলবেন।"

"হ্যাঁ, এই তো হয়েছে।"

ঘাড়টা বাড়িয়ে গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার বল্ দিকিন্? দেখলিই তো ? পনেরো দিন হলো এসেছে ; ঐ একভাব, যা দেখলি। জিজ্ঞেস করলে কিচ্ছু রা কাড়ে না। বেরোয়ও না বাড়ি থেকে বেশি ; বাইরের কারুর সঙ্গে দেখাও করতে চায় না বড একটা। দিদিরা কতরকম করে জিজ্ঞেস করলে, কিছু সন্ধানই দেয় না। এই তোর সঙ্গে এতদিন পর খানিকটা গল্পগুজব করছে শুনলুম, তাই সলিল এসে বলতে বললুম দেখা করে যায় যেন। কিছু পেলি হদিস বাবা ? সে শুনেছি বড় খারাপ দেশ। লেকরোডের মিত্তিরদের ছেলেটা তো বিয়ে করে থেকেই গেল সেখানে।"

"তা বলে আপনার ছেলেও তাই করবে জ্যাঠাইমা ?"—একটু হাসল দোলু আশ্বাস দিয়ে।

"করে নি তো। মা ওলাইচণ্ডী রক্ষে করেছেন, তবে এমনও তো হতে পারে—যা সবাই ভয় করছে…"

"বুঝেছি। সেরকম কিছু হলে আমার কাছে তো লুকুত না। লুকুতে চাইলেও এই বছর-দুয়েক বিলেতে গিয়ে এত ধড়িবাজ হয়ে উঠবে যে আমার কাছে পার পাবে এটা সম্ভব মনে করেন ?"—এবার আত্মপ্রসাদে হাসল।

"তা তো করি না মনে বাবা। সেই জন্যেই তোর পথ চেয়ে বসেছিলুম। রোজই খোঁজ নিচ্ছি ; শুনছি কোথায় গেছিস, ফিরিস নি।…তা পেলি কোন হদিস ?"

জানলেই বলবার একটা লোভ হয়, বিশেষ করে এইরকম অবস্থায়। কিন্তু এত শীগগির ঠিক হবে কি না বুঝে উঠতে পারছিল না দোলু। ঠিক করে ফেলে বেশ সহজভাবেই হেসে হাতটা চিতিয়ে বলল, "পেয়েছি হদিস—একেবারে কিছু নয়।"

মাথায় একটা আইডিয়াও খেলে গেল হঠাৎ, বলল, "কে নাকি কানে তুলে দিয়েছে বিয়ে দেওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি ডেকে আনিয়েছেন জ্যাঠামশাই।"

"জ্যাঠামশাই। চুপ কর দোলু, আর জ্বালাস নে। তোদের জ্যাঠামশায়ের তো এসব ভেবে ঘুম হচ্ছে না! বললুম, তা বললেন, ওখান থেকে ফিরলে প্রেথম-প্রেথম অমন একটু আধটু হয়, ওর জন্যে তুমি মাথা ঘামিও না, আবার ঠিক হয়ে যাবে।...তা ঐ ঠিক হচ্ছে, দেখলি তো?"

ঘাড়টা আবার বাড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং গলাটা আরও নামিয়ে বললেন, "জ্যাঠামশাই নয়, আমিই। তোর কাছে লুকুলে তো চলবে না। ঠিক করেছি একটি মেয়ে। তা ওর কানে কথাটা কি করে পৌছুল?"

আবিষ্কারটা কাজে লাগাল দোলু। ওদিককার জাহাজ-ঘটিত ব্যাপারটারও তো পুরোপুরি এখনও সমাধান হয় নি। তবে এই হঠাৎ-আবিষ্কারের বিস্ময়টা অবশ্য প্রকাশ পেতে দিল না, বেশ সহজ কথাবার্তার টোনে একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে বলল, "এসব কথা যে বাতাসে ছোটে জ্যাঠাইমা। দেখলাম তো কত।"

"তা হলে বলি—বয়েসও তো হয়েছে বাবা, আর কি, ছাব্বিশ বছর হতে চলল।"

"জ্যাঠাইমা এখনও সেই তাঁর বাপের বাড়ি ধরেই বসে আছেন; ঐ জন্যে তো আমিও কাছে আসতে ভয় পাই। ছাব্বিশ আজকাল আর বিয়ের বয়েস আছে? ওদিকে আইনওয়ালারা ভাবছে নীচুর দিকে ওটাকে ছত্রিশে বেঁধে দেওয়া যায় কিনা। ঠাকুর-দেবতাদের নিয়েই রয়েছেন, তাঁদের তো বয়েসও নেই, এসব বালাইও নেই।...মরুকগে, সে যখন দেবে বয়েস বেঁধে তখনকার কথা। আপাতত একটা যে কাণ্ড করে বসেছেন জ্যাঠাইমা।—খানিকটা তো ভুগতে হবে।"

"কি বাবা, কী কাণ্ড, বল!"—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন বরদাসুন্দরী।

"বিলেতে দু বছর কাটাল, তা খানিকটা তো ছোঁয়াচ লাগবেই। পোশাক-আশাকে দেখছেনই। মনের দিকটা অমনি যাবে?"

"কী মনের দিকের কথা বলছিস আবার—ভয় করছে!"

"না, সেরকম নয়; সে তো বলেছিই। ঠাকুরঘরের সামনে বসে তো আর মিছে কথা বলব না। বলছিলাম, অন্তত বিয়ের বয়সের মতটা বদলে যাবে ছেলের—এটুকুর জন্যে তো তোয়ের থাকতে হবে জ্যাঠাইমা। সেখানে

তিরিশের কমে ওকথা মুখে আনে না কেউ। তা অন্তত দুটো বছর এখন সবুর করবেন তো?"

"দিব্যি মেয়েটি বাবা, লক্ষ্মী পাঠশালায় পড়ে।"

"পড়তে দিন না। সে মেয়ে যতই পড়ুক, মেমেদের মতন চুল ছেঁটে ঠোঁটে রং মেখে তো বাড়ি ঢুকবে না আপনার। ভাবনা কিসের?...তা হলে হলো তো আপাতত? আমি এখন উঠি। আবার কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।...হ্যাঁ, ওঁকে যে নতুন দেখছি জ্যাঠাইমা?"

"আমিই আনালুম বাবা, বড় চৌকোশ লোক। শুনলুম তোর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে একবার। মনে হয় না তাই?"

"তা যতটুকু দেখলাম,...তবে ওঁকে আর মিছিমিছি আটকে রাখা কেন? কাজের মানুষ, নাহক্ ক্ষতি করাচ্ছেন তো?...আর, আমি যখন এসেই গেলাম..."

ওঁর ঘরের দিকেই যাচ্ছিল, ছোঁড়া চাকর লখার সঙ্গে ওপরের বারান্দায় দেখা। এদিকেই আসছিল, বলল, "আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। কাকাবাবু ডাকতে বললেন, তার পর আবার বললেন, থাক, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, কাল বিকেলে আসতে বলে দিয়ো।"

"আবার কাল!" কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল যেন ও-বিপদটা কেটে গেলেই ছিল ভাল।

"ডেকে দিই? এখনও হয়তো নেমে যান নি সিঁড়ি দিয়ে।"

ঘুরে ছুটতে যাচ্ছিল, দোলু হাতটা ধরে ফেলল, বলল, "পেছু ডাকে ছাখো ভালমানুষ পেয়ে!"

॥ ছয় ॥

পরদিন সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা খারাপ হয়ে রইল। বৃষ্টি, মাঝে মাঝে দমকা উত্তরে হাওয়া; 'ব্লাংকেট'টা ভাল করে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় পড়ে রইল দোলু। কয়েকটা দরকারী কাজ রয়েছে নিজের, তার ওপর পার্ক-সার্কাসের দিকে গিয়ে আইচ-পরিবার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে আড়ে-

আবডালে যতটা পারা যায়। আবার লক্ষ্ণৌয়ের কাকার সঙ্গে দেখা করা আছে। ঘুরে ঘুরে আইচ-পরিবার সম্বন্ধে অনুসন্ধানটা না চললেও কয়েকটা কাজ সারা যায়, অন্তত লক্ষ্ণৌয়ের কাকার সঙ্গে দেখা করা। ভদ্রলোকের নাম জেনে নিয়েছে, পরাশর। যাওয়া যায়, যেতে হবেও, কিন্তু কেমন যেন গা তুলতে ইচ্ছা করছে না।

পড়ে পড়ে নামটা নিয়ে মনে তোলাপাড়া করছে। এবং যতই তোলাপাড়া করছে, ততই যেন আরও অদ্ভুত এবং রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে দোলুর।…নামটা শোনা আছে, তবে ঋগ্বেদে আছে বলে শুনেছে কি রামায়ণে, কি মহাভারতে, কি সাংখ্য-দর্শনে ঠিক মনে করতে পারছে না। মুশকিল হয়েছে, এক রামায়ণ আর মহাভারতের অল্প কিছু কিছু জানা ভিন্ন বাকি বইগুলোর মাত্র নামই শোনা। হাতড়ে পাচ্ছে না পরাশর নামটা।

তবে যতই তোলাপাড়া করছে, ততই ভারিক্কে হয়ে উঠছে নামটা; সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও। এও বুঝেছে, শুয়ে অলস আলোড়নই এর কারণ, নয়তো যেমন নাম দোলগোবিন্দ, তেমনি নামই তো পরাশর। দোলগোবিন্দ নামটাই ধরা যাক না। এক শীলাকেই নাক সিঁটকুতে দেখেছে, তেমনি আবার ওদিকে জ্যাঠাইমাও তো রয়েছেন। বলেন, 'একবার মুখে আনলেই জিভটা মিষ্টি হয়ে যায়। বসে বসে জপ করবার মতন নাম।…তবু মনে হয় যেন শীলারই জয়। কি ক্ষতি হত যদি দিদিমা জপ করতে করতে দিন-চারেক আগেই সরে পড়তেন? …এঁচে রেখেছিলেন, ছেলে হলে নাম রাখবেন দোলগোবিন্দ, মেয়ে হলে তুলসীমঞ্জরী। বেঁচে গেছে মেয়েটা না জন্মে…

চা আনতে বেয়াড়া এই নামের জগৎ থেকে মনটা বেরিয়ে এল। একটু হাসিও পেল কি ভেবে।

চা শেষ করতে করতে ও-জগৎটা একেবারে মিলিয়েও গেল। পাগলামি। পরাশর, সুতরাং লোকে এই এইরকমের হবেই! হুঁঃ!

ঝড়বৃষ্টির দাপট বেড়েই যাচ্ছে, দুর্যোগে দাঁড়াবে নাকি? দাঁড়াক, বেশ লাগছে। চাকরটা খালি কাপ নিয়ে যেতে এলে বলল, 'কোনো ফোন্-টোন্ এলে বলে দিবি বাড়ি নেই। নাম জিজ্ঞেস করতে যাবি নি। যদি নিজে হতে বলে তো বলবি, ফিরে এলে বলে দোবখন। যা।"

ব্লাংকেটখানা টেনে নিয়ে বেশ মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, পাশের ঘরে ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে উঠল।

আটটা! যখন ভেবেছিল ছ'টা কি সাড়ে ছ'টার বেশী হবে না। নাঃ, তা হলে আর পড়ে থাকা চলল না। মনে জোরটুকু এনে ফেলতে ফেলতেও আধঘণ্টা হয়ে গেল, ঘড়িতে সাড়ে আটটার ঢং করে আওয়াজ হলো। এই সময় হলঘরে ক্রিং ক্রিং করে ফোন্‌টা বেজে উঠল। চাকরটা যেন ওৎ পেতেই বসে ছিল, তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল, "হ্যাল্লো ?"

নতুন চাকরি, এ কাজটা ভাল লাগে, ওৎ পেতেই থাকে।

এর পরই—

"হ্যাঁ, তাঁরই বাড়ি।···না, তিনি বাড়ি নেই।···কখন বেরিয়েছেন ? তা—ঘণ্টাখানেক হবে। হ্যাঁ, তা হবে বৈকি, বরং বেশীই।···এত সকালে বৃষ্টিবাদলে কেন বেরিয়েছেন? খুব দরকারী কাজ ছিল।···না, গাড়িটা গ্যারেজেই আছে···"

সিঁটকে-মিটকে উদ্বিগ্ন হয়ে শুনছিল দোলু, উঠে পড়ে পা টিপে টিপে এগুল। ও চালিয়ে যাচ্ছে, "না, আর কাউকে বলে যান নি···", তার পর ও যখন পা টিপে টিপে হলঘরের মোটা গালিচায় গিয়ে উঠল, "ঐ আসছেন···না, না, উনি নয়···" বলে সঙ্গে সঙ্গেই রিসিভারটা হ্যাঙ্গারে রেখে দিয়ে দোলুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। মুখটা থমথম করছে দোলুর, প্রশ্ন করল, "তোকে এত কথা চালিয়ে যেতে কে বলেছিল ? এলোমেলো, যা মুখে আসছে তাই—ঝড়-বৃষ্টিতে একটা লোক না গাড়ি নিয়ে এমনি বেরিয়ে গেল! আবার এই আসছেন!"

বুড়ো আঙুলটা দোরের দিকে উলটে বেরিয়ে যেতে ইশারা করল, বলল, "আর ছুঁবি নি ফোন্—খবরদার নয়। বেজে যেতে যেতে আপনি থেমে যাবে।··· 'ঐ এসে গেছেন—উনি নয়।'···ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি!"

একটা সোফায় বসে পড়ল। হেঁকে বলল, "সিগারেট কেস আর দেশলাইটা দিয়ে যা ও ঘর থেকে।"

নিয়ে এলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "দেখে আয় ওপরে সবাই উঠেছে কি না।"

একটু চিন্তিত ভাবেই টানতে লাগল সিগারেট। কে করেছিল ফোন্? মনেই বা কি করল ?

তার পর হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতে উঠে গিয়ে ডায়াল করে রিসিভারটা কানে লাগাল।—"কে ?—সরিৎ ?···ভালই হলো। তুই ফোন্ করেছিলি নাকি ?

একটু আগে ? · কি বললি ?···তুই নয়, শীলা ? তা হঠাৎ শীলা ফোন্ করতে গেল যে ?···লক্ষ্ণৌয়ের কাকা আছে কিনা খোঁজ নিতে বলেছিলেন ? কেন রে ? ওঃ, বুঝেছি। তা ভাই বলে দিবি, এই দুর্যোগটুকু না কাটলে গিয়ে দেখা করতে পারছি না। এক্ষুনি নয়, ধর, এই ঘণ্টাখানেক পরে বলে দিবি, মানে বেরিয়ে গেছি, ফিরে আসবার একটু সময় হাতে রাখতে হবে তো।···কি বললি ? এখন হবেও না দেখা। কেন রে বেরিয়ে গেছেন ?···হঠাৎ এই দুর্যোগে বাইরে গেলেন যে!···আমিও তো বেরিয়েছিলাম ? দাঁড়া, দাঁড়া।"

গলাটা নামিয়ে দিল দোলু, বলল, "এই শোন, কাছেপিঠে আর কেউ আছে নাকি ? অনেক ভেতরকার কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে তো ? কি ?···"

আবার গলা তুলে, "আমি বেরিয়েছিলাম বলে···দাঁড়া তো, কার মোটরটা এল। এই এক জ্বালাতন—কাজ, কাজ, কাজ! এক বেটা বাড়ি ভাড়া নিতে চায়, উঠে পড়ে লেগেছে; সেই বোধ হয়।"

চাকরটা এসে জানাল—ওপরে উঠে গেছে সবাই। দোলু ফোনের মুখটা চেপে তাকে বলল, "দেখে আয় তো কে এল।···পাশের ঘরে বসা। বলবি, এক্ষুনি আসছি ফোন্‌টা সেরে নিয়ে।"

ও চলে গেলে আবার হাতটা সরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম···বেশ বেশ জোরেই বলছি, এদিকেও বেড়েই চলেছে ঝড়বৃষ্টি। বলছি, তুইও বিশ্বাস করলি নাকি যে আমি সত্যিই বেরিয়েছিলাম—এই দুর্যোগে ? একটা ভাঁওতা—তাও হতভাগা চাকরটা এমন গোলমাল করে দিলে! নৈলে এ দুর্যোগে এক তোমার লক্ষ্ণৌয়ের কাকাই বেরুতে পারে বাবা! কাজের লোক তো, জ্যাঠাইমা বলেন চৌকোশ মানুষ! তা, হ্যাঁ রে, কি রকম লোক বল্ দিকি ? জ্যাঠাইমা বলছিলেন চৌকোশ মানুষ, তাই তোর ওপর গোয়েন্দা-গিরি করতে আনিয়েছেন।···হ্যাঁ, হলো বৈকি কথা খানিকটা জ্যাঠাইমার সঙ্গে। ···না, তেমন বিশেষ কিছু নয়—এই মনমরা হয়ে গিয়েছিল এসে পর্যন্ত, খাওয়া-দাওয়ার রুচি নেই—এই সব আর কি।···না, না, লুকুব কেন ? লুকুবার আর কি আছে ? লুকিয়েছি অবশ্য ওঁর কাছেই।"

খানিকটা অবশ্য এর কাছেও মুকুল, লক্ষ্মী-পাঠশালার মেয়ের কথাটা তুলল না। এদিকটা চাপা দেওয়ার জন্যই আবার পরাশর কাকার কথাটা তুলল, "তা হ্যাঁরে, চৌকোশ তো বুঝলাম, কিন্তু আসলে লোক কেমন ?···কি বললি ?—বেশ মাই-ডিয়ার ? আমারও তাই মনে হলো বটে। তুই হতভাগা

এক আজগুবি খেয়াল নিয়ে বসে আছিস—আইচ-কন্যা ক'টা দিনেই মস্তকটি চর্বণ করে দিয়েছে তো একেবারে।…না ভাই, আজ আর পার্ক সার্কাসের ওধারে যেতে পারলাম কই? নামটা কি বললি তখন?—স্নেহময় আইচ না? ঠিক আছে। যদি আকাশ ক্লিয়ার হয়ে যায় তো বেরুব ওবেলা; একটু যেন কমে আসছে না?…হ্যাঁ রে হ্যাঁ, বাঃ, সিমপ্যাথি থাকবে না? সাত দিনের জাহাজ-সফরেই চোখের জলে বিদায়, সে বেচারীর কথাও ভাবতে হবে বৈকি? তা হলে থাক এই পর্যন্তই, রেখে দিচ্ছি। তুই ভাই "মাই-ডিয়ার" লক্ষ্ণৌয়ের কাকাকে জানিয়ে দিবি, নিজেই হোক বা কাউকে দিয়ে। নাম আবার শুনলাম নাকি পরাশর। কোথা থেকে আমদানি কয়া জানিস?…হ্যাঁ, আমার পেটের কথা বের করবে সে কাকা নিজে এখনও, কি যে বলে, নিজের মায়ের পেটে। উঠি ভাই, দেখি কে, কি কাজ।"

পাশেই বসবার ঘর। ভদ্রলোক বসেও রয়েছেন এদিকের দোরের পাশেই। চোখোচোখি হতে একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল দোলু।

॥ সাত ॥

খোদ লক্ষ্ণৌয়ের পরাশর কাকা! দাড়িটা বাঁ হাতে চুমড়ে বললেন, "এস বাবাজী, বোসো। হয়ে গেল সব কথা?"

বসবার মতো অতটা একেবারে নিজেকে সামলাতে না পারলেও খানিকটা সামলে নিয়েছে দোলু; বলল, "আপনি…এ দুর্যোগে?"

"আমার আর দুর্যোগ কোথায়?—একটু যে হাসলেন ভারী গোঁফের নীচে তার অর্থটা অস্পষ্ট রইল না দোলুর কাছে, বললেন, "বোসো আগে।…সরিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ…সরিৎ…মানে, সরিৎই ছিল।"—পাশের একটা কুশন্-চেয়ারে বসতে বসতে বলল দোলু। বেশ সামলে নিয়েছে। বলল, "দেখুন না ফ্যাসাদ!…ভাবলাম তাঁকে কাল কথা দিয়েছি—একবার হয়ে আসি—ঝড়বৃষ্টি হঠাৎ বেড়ে গেল। একটু দোমনা হয়ে পড়তেই হলো। তার পর তেড়েফুঁড়ে উঠেছি, না, যেতেই হবে, গুরুজন তিনি, অপেক্ষা করছেন—হঠাৎ টেলিফোনের

ক্রিং ক্রিং শব্দ। চাকরটা কাছেই ছিল, আমি যেতে যেতে কী সব আবোল-তাবোল বকে ততক্ষণে চেপে দিয়েছে হ্যাঙ্গারে। বেটা নতুন এসেছে, ফোন্ ধরবার ভারী শখ—জিজ্ঞেস করলাম, কে করেছিল—তা কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। সকাল বেলায় কে ফোন্ করে—ভীষণ এক ধুকপুকুনিতে পড়া গেল, তার পর মনে হলো সরিৎদের বাড়ি থেকেই কেউ নয়তো! ডায়াল করে সরিৎকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে…”

“তার কতকটা আন্দাজ পেয়েছি বাবাজী, বসে বসে শুনছিলাম কিনা।”

যেটুকু সামলে আনছিল সব আবার গোলমাল হয়ে গেল দোলুর, থেমে গিয়ে মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ওঁর মুখে সেই একটু সূক্ষ্ম হাসি; বললেন, “না বাবাজী, আমায় ভুল বুঝো না। তোমাদের জ্যাঠাইমার কথায় যদি ধরেই নেওয়া যায় আমি লোকটা চৌকোশ—অন্তত মার পেটে নেই এটা তো ঠিক—কিন্তু মেয়েদের মতন আড়ি-পাতা দোষ যে নেই এটা জোর করে বলতে পারি। তা হলে গোড়া থেকেই বলি। শীলাকে দিয়ে ফোন্ করিয়েছিলাম আমি—শীলা বললে চাকরটা বলছে তুমি নাকি ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছ—এই দুর্যোগে গাড়ি না নিয়েই। কেমন কেমন বোধ হয় না? তাই ভাবলাম, আর ফোন্ নয়, আমিই না হয় গাড়িটা করে একবার গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে আসি। এখানে আসতে চাকরটা বললে ফোন্ করছ, বসতে বলেছ। ঘরের ওদিকটায়—সোজা ঝড়ের ঝাপটা, আড়াল দেখে এই সোফাটায় এসে বসলাম—ফোন্ যে একেবারেই পাশে—কানের কাছে—প্রথম আসা আমার, জানা তো নেই অতশত…”

“আপনার চা’র কথাটা বলে দিই আগে—নিজেই বলে আসি।”

সিঁড়িতে উঠে, চোখের আড়াল হয়ে যেন বাঁচল দোলু। ল্যাণ্ডিংয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে মনটাকে ভাল করে গুছিয়ে নিল। সবই তো শুনে ফেলেছে লোকটা, মায় মিস্ আইচের কথা পর্যন্ত। যতটুকু কানে গেছে—আর, গেছে কমই বা কি?—তা থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হবে না ওর—যে ধরনের ধূর্ত লোক। এখন ইতি-কর্তব্য কি? এর সঙ্গে আর লুকোচুরি করতে যাওয়া কি ঠিক হবে?…আবার এমন হাসে গোঁফের মধ্যে লুকিয়ে, মনে হয় যতটা বাইরে বাইরে টের পাওয়া যায় তার চেয়ে যেন ঢের বেশি খোঁজ রাখে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। মুঠোয় চিবুকটা চেপে আস্তে আস্তে উঠে গেল। পরাশর

কাকার পরিচয়টা দিয়ে একটু ভাল করেই চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে আবার সেইভাবে নেমে এল। সিঁড়ির মোড়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার—

না, লুকোচুরি চলবে না ; আর তো একেবারেই নয়। তা ভিন্ন দরকারই বা কি ? ওঁর সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যের একটা মিলই তো রয়েছে। আপাতত হয়তো এইটুকু প্রভেদ যে, দোলু কেতকী আইচের ব্যাপারটা ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে একেবারে ছেঁটে ফেলতে চায় না। যদি ছাখে চলতে পারে তা হলে, সরিৎকে যেমন কথা দিয়েছে, করবেই চেষ্টা—কত ও ধরনের মেয়ে বিয়ের পর বদলে গেছে শুনেছে। সে-ক্ষেত্রে পরাশর কাকার সঙ্গে একচোট পাঞ্জা-কষাকষি হয়তো চলবে। সে পরের কথা পরে। আপাতত ওঁকে দিয়ে একটা কাজ অন্তত হয়। জ্যাঠাইমার কাছে খাতির আছে, লক্ষ্মী-পাঠশালার মেয়ের ব্যাপারটা ঠেকিয়ে রাখা যায়।

আরও খানিকটা দূর পর্যন্ত পরিষ্কার করে ভেবে নিলে হতো, কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। শরীরটা বেশ ঝেড়ে নিয়ে, ঠিক হাসি না হোক, মুখে একটা স্বচ্ছন্দ প্রসন্নভাব ফুটিয়ে তর তর করে নেমে এল দোলু। পরাশর কাকা বেশ একটু স্পষ্টভাবেই হেসে বললেন, "তা হলে আশা হচ্ছে শুধু এক কাপ চায়ের কথাই বলে আস নি।"

এতই অপ্রত্যাশিত যে দোলু বসতে যাচ্ছিল, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই অবশ্য মুখের ভাব ফিরিয়ে এনে বলল, "আপনি এসেছেন, কত বড় সৌভাগ্য !···তবে, অবশ্য চায়ের বেশিই বা কি এমন ?"

"বোসো। এই জন্যে বলছি যে, ওখানে সবই তোয়ের, খেতে বসব, ছেড়ে-ছুড়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো···"

"এঃ ! কী যে···"

চাকরের দোষ দিতে যাচ্ছিল, আর চলবে না মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গিয়ে একটু অপ্রতিভভাবে চাইল। পরাশর কাকাও ওদিকটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "চলে আসতে হলো তার কারণ কাজটা বিশেষ দরকারী !"

ঐটুকু ভূমিকা করেই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলেন—

"একটা সুবিধে, এখানে এসে দেখলাম তুমি সব জানই। ঐ সরিতের কথাই। বৌদিদি যদি খানিকটা ভাবনায় পড়ে গিয়ে থাকেন তো দোষ দেওয়া তো যায় না। বিলেত থেকে ছেলেকে তোয়ের করে আনা হলো, কোথায় কাজে বসবে, না, জবুথবু হয়ে ঘরের কোণ চেপে বসে রইল ; না নিজে হতে কাউকে

কিছু বলে, না, জিজ্ঞেস করলে একটা উত্তর দেয়। লক্ষণ ভাল নয় তো। আমায় ডাকলেন। কিন্তু হাজার 'মাইডিয়ার'…

সেই সূক্ষ্ম হাসি। দোলুর মুখটা একটু ঝুঁকে গেল।

"কি যে বলে, হাজার 'মাইডিয়ার আঙ্কল্' হই, ভাইপোর সঙ্গে তো আর খোলাখুলি ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করা চলে না। কি করব ভাবছি, এমন সময় তুমি কাল—'রাস্কেল, দোর খোল' বলে উপস্থিত হলে। এত মিষ্টি লাগল।…"

"আজ্ঞে…"

"না, না, মিষ্টি লাগল বলছি—দেখলাম তা হলে ঠিক লোক পাওয়া গেছে; নেহাত সেরকম অন্তরঙ্গ বন্ধু না হলে তো এতটা ফ্রী হতে পারে না। তার পর লক্ষ্যও করলাম, যে লোক কাউকে আমলই দিচ্ছে না, সে একনাগাড়ে এতখানি সময় রাখল তো নিজের ঘরে। মনস্থির করে ফেললাম, একেই ধরতে হবে। তোমার যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যেতে বললাম। কালই ধরতাম তোমায়, তবে তোমারও বৌদিদির কাছে দেরি হয়ে গেল, আমারও একটা বিশেষ দরকারী কাজ ছিল বাইরে, সেটা সেরে নিলাম। একটা রাস্তা বেরিয়েছে, মনটা ভাল আছে, ভাবলাম কাল সকালেই তখন ধীরেসুস্থে হবে সব কথা।…ব্যাপারটা কি বল দিকিন্? সরিৎ ভাঙলে কিছু তোমার কাছে?"

"ঐ তো শুনলেন।"—লজ্জিতভাবে অল্প একটু হেসে বলল দোলু, যেমন ভাবে বন্ধুর প্রণয়ঘটিত কথা তার গুরুজনের কাছে বলতে হয়। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য জেনে নেওয়া কতখানি কানে গেছে ওঁর।

একটু হাসলেন পরাশর কাকা, বললেন, "এই ছাখো! বাবাজী, আবার ভুল করছ! শার্লক হোম্স্ তো নই যে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দু-চারটে কথা যা কানে গেছে—তাও আবার একতরফাই—তাই থেকে একটা কেস্ দাঁড় করিয়ে নোব। তবে এইটুকু বলতে পারা যায় যে একটা শুভলক্ষণ আছে আপাতত…"

দোলু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে চাইতে বললেন, "এই জন্যে বলছি যে, কোন সাদা চামড়ার পাল্লায় পড়েন নি বাবাজী। সেটা একেবারে মাথায় ছোবল দেওয়ার মতনই হতো তো। তেমনি আবার আইচ-কন্যাও যে একেবারে মস্তকটি চর্বণ করেছেন, এও তো খুব ভরসার কথা নয়। মাথাটাই যদি লোপাট হয়ে গেল ধড়ের ওপর থেকে…"

একটু হাসলেন।

দোলুও সেইভাবে হেসে বলল, "আজ্ঞে, চিবুনো—ও একটা কথার কথাই বলছিলাম তো…"

"তা তো বটেই। সত্যি হলে ভালোই বা লাগবে কেন? আর, তা না হলে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ তো কন্ধকাটা হয়ে ঘুরে বেড়াত, কি বল?…তা হলে তুমি বলতে চাও, সেরকম সিরিয়াস্ কিছু নয়?"

"আজ্ঞে, নাঃ। ঐ একটু কি যে বলে—ইয়ে হয়েছে আর কি।"—খানিকটা হাতে রেখেই দোলু বলল আপাতত।

"তা একটু হবে বৈকি বাবাজী। দুটো গোটা মানুষ, ওর নাম কি, সম্বন্ধটাও ইয়ে হওয়ারই, ক'টা দিন জাহাজে পরস্পরের সঙ্গী হয়ে এল, অন্যরকম আশা করাই যে অন্যায়। চোখের নেশা হয়, কেটে যাবে; খাঁটি হয়, টেঁকে যাবে। স্বজাতি যখন, ভয়টাই বা কিসের? এখন একটু ভাল করে খোঁজ নেওয়া, তা তুমি করছই চেষ্টা। এই শহরেরই ব্যাপার, বেশি বেগ পেতেও হবে না। তার পর তোমাদের দুজনের যেরকম সম্বন্ধ দেখছি, তাতে তুমি যে জেনেশুনে ওর… নাও, ঐ খাবার এসে গেল।"

দোলুকে বলার চেয়ে যেন নিজের মনেই স-রব চিন্তা করে যাচ্ছিলেন পরাশর কাকা, চাকর ট্রেতে করে খাবার-চা নিয়ে আসতে নড়ে চড়ে প্রস্তুত হয়ে বসলেন। চাকরটা পাশ থেকে একটা টিপয় টেনে নিয়ে তার ওপর রেখে সামনে করে দিতে বললেন, "এত নয় তা বলে।…তুমিও তো খাও নি।"

চাকরটাকে বললেন—"তুই আর একটা প্লেট নিয়ে আয়।"

॥ আট ॥

আহার-পর্বটা একেবারে নিঃশব্দে কাটল। বেশ বোঝা যায়, দ্বিতীয় দফা যে আলাপ হবে তার জন্য এই সুযোগে উভয় পক্ষের ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলছে। আলোচনার বিষয় খানিকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে, তা ভিন্ন জানাজানি তো হলো আরও কিছুটা। দোলু বিশেষ সতর্ক থাকবে এ দফায়। কেতকী আইচকে না দেখা পর্যন্ত ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে কি এগিয়ে দেওয়ার, সে সম্বন্ধে কোন কথা দিয়ে বসবে না। কথার ধরনে আশা হচ্ছে, পরাশর

কাকাও সে-সম্বন্ধে কিছু জিদ করতে যাবেন না তবে ধূর্ত মানুষ, কি উদ্দেশ্য নিয়ে কোন্ কথা বলে এসব মানুষ—বোঝা শক্ত। সাবধান থাকতে হবে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে সোফায় ঘাড়টা উল্টে দিলেন পরাশর কাকা। ভাবটা যেন পরিতৃপ্ত ভোজনের আলস্য। দোলু লক্ষ্য করল ওরই মধ্যে দৃষ্টি ঘুরিয়ে, কয়েকবার ঘাড়টাও অল্প ঘুরিয়ে হলঘরটাকে যেন লক্ষ্য করে দেখছেন—এর কার্পেট, আসবাব, ছবি, আলোর ব্যবস্থা, দেয়ালের রং, সব কিছু। হাতে কাজ না থাকলে যেমন করে থাকে লোকে। টিপয়টা চাকরকে সরিয়ে নিতে বলে দোলু প্রতীক্ষা করতে লাগল; ওদিক থেকেই শুরু হোক কথা। দেখা যাক না, কিভাবে হয় শুরু।

বেশ সজাগ সপ্রতিভ থাকতে হবে; প্রথম দফায় একটু মিইয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কারণ হয়েছিল তার, ফোনে অমনভাবে কথাগুলা বেরিয়ে গেল যে।

উনি অন্যমনস্কভাবে রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন, দোলু নিজের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। যেন অন্যমনস্ক হয়েই, তবে আসলে খুবই সতর্ক।

"দুর্যোগটা দেখছি আজ আর থামবে না।"—একবার বাইরের দিকে চেয়ে নিয়ে হালকা মন্তব্য করলেন পরাশর কাকা।

"মনে হচ্ছে যেন।"—সংক্ষেপেই সারল দোলু।

আবার খানিকটা সেইরকম চুপচাপ, তার পর—

"বাড়িটা ভাড়ার, না, তোমাদের নিজেদেরই ?"—অনুৎসুক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন পরাশর কাকা।

"আজ্ঞে না, নিজেদেরই; বাবা করেছিলেন।"

"জীবিত আছেন তিনি ?"

"আজ্ঞে না।"

"এখন বাড়ির কর্তা ?"—একটু যেন মনোযোগী হয়েই প্রশ্ন করলেন এবার।

"মা বেঁচে আছেন।"—প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল দোলু। আলাপের হঠাৎ দিক পরিবর্তনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

"জিজ্ঞেস করছি, বেটাছেলেদের মধ্যে বড়…"

"বড় বলুন, ছোট বলুন, এই এক আমিই।"—একটু হাসল।

"তাই নাকি ?…বোন ?"

"দুটি বোন, আমার চেয়ে ছোটই।"

"এই তোমাদের সংসার তা হলে! বিবাহ তো কর নি এখনও, তাই না?"

কণ্ঠস্বর নিরুৎসুকই, দোলু বলল, "আজ্ঞে না, করি নি।"

"কর কি তুমি?...বসে না থেকে গল্প করা একটু, এই আর কি। কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি তোমার সম্বন্ধে কাউকেও। অথচ তুমি সরিতের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"করি না তেমন কিছু।"

"তবে?"—ওকে যেন একটু ভালো করে দেখে নিয়ে করলেন প্রশ্নটা।

"কি করে চলে বলছেন? কয়েকখানা বাড়ি আছে, বড়বাজারের ভেতর একটা কাটরায় কিছু অংশও; ভাড়া আসে।"

"আসুক না, সে তো ভালো কথাই। নিজের দিক দিয়েও কিছু করতে হবে তো, বাড়াতে হবে তো আয়।"

কুণ্ঠিতভাবে ঘাড়টা একটু নামিয়ে নিল দোলু, তুলল একটু হেসে ফেলেই। বলল, "নিরিবিলিতে যদি একটু ভোগ করি, তেমন কিছু দোষের হয় সেটা?"

অদ্ভুত প্রশ্নের কিছু উত্তর পাওয়ার আগেই সেইভাবে আবার একটু হেসেই বলল—"ঠাকুরদাদার ছিল মুৎসুদ্দির কারবার—সেই কোম্পানীর আমলে, ঝড়েতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। বাবা ধরলেন বিল্ডিং কন্‌ট্রাক্ট, বেশ বেড়ে আসছিল আয়, কন্‌ট্রাক্টের চরতলা বাড়ি ধসে মারা গেলেন। বংশে কেমন সয় না। বাড়িভাড়া বাড়াতে গিয়ে কিছু মকদ্দমা হয়ে পড়ে, ভাড়া কমে কনট্রোল্ রেটে নেমে এল। সয় না।"

হাসি নিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল। নির্লিপ্তভাবে বলবার ভঙ্গিতে পরাশর কাকাও হেসে ফেললেন, বললেন, "দিব্যি সার বুঝে নিয়েছ দেখছি। মন্দ নয়। কিন্তু অন্য উপায়ও তো আছে। পড়াশোনা হয়েছে কতদূর?"

"সরিতের সঙ্গে বি-এসসি পাস করি। তার পরে ও অফিসে ঢুকল, আমিও, কি যে বলে..."

"বাড়ি এসে ঢুকলাম। কেন, তুমিও তো ওদের আফিসে ঢুকতে পার, সরিতের বন্ধু।...বল তো, রায়মশাইকে বলে..."

"আপনি সরিতের কাকা হয়ে এমন একটা আঘাত দেবেন? ফাইল চাপা পড়ায়, বাড়ি চাপা পড়ায় তফাত কতটুকু বলুন না। পরিণাম তো সেই একই।"

হেসে একটু চুপ করে রইলেন, কী যেন একটা ভাবছেন। একটু পরে

বললেন, "অবশ্য, তোমার নিজের জীবন তুমি যেভাবে চালাতে চাও তাতে অপরের বলবার কিছু নেই, তবে সরিতের বন্ধু, সেই হিসাবে একটা কথা যদি বলি…"

"বলুন; ভালোর জন্যেই তো বলবেন আমার।"

"যা আছে তাইতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাও, ক্ষতি নেই। তবে বিয়েটা করে রাখা উচিত মনে হয়।"

"আজ্ঞে, কেউ যদি যা নেই তাতেও সন্তুষ্ট থাকতে চায়?"

হেঁয়ালির আকারে বলা, বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড যা দেরি হলো, তার পরেই আবার একটু হেসে উঠলেন পরাশর কাকা, আবার গম্ভীর হয়েই বললেন, "কলকাতা জায়গাটা বড় সাংঘাতিক বাবাজী। বিয়েটা হয়ে থাকলে তবু অনেকটা নিশ্চিন্দি থাকা যায়।"

"বিয়ে করা মানেই আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়ানো, হিসেবের গোঁজামিল দিতে দিতে প্রাণান্ত। তার পর, আপনি যা বললেন—আমার সেদিক দিয়ে কোন বিপদ আছে বলে মনে হয় আপনার?"

"কেন থাকবে না?"

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন টীকাস্বরূপ নিজের মুখের ওপর দিয়ে হাতটা টেনে এনেছে দোলু। দিন-চারেক মুখে ক্ষুর বোলানো হয় নি, মাথার সঙ্গে চিরুনির সাক্ষাৎ কখনই ঘটে কিনা সন্দেহ, জামাকাপড়েও একটা নিতান্ত অবহেলার ভাব। কালও এইরকম দেখেছিলেন, তবে এতটা খেয়াল হয় নি। গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, সে ভাবটা বদলে একটু হেসেই বললেন, "কি জান বাবাজী, কথামালার একচক্ষু হরিণের গল্পটা পড়েছ তো? বিপদ কোন্ দিক দিয়ে আসে কিছু বলা যায়? মনে হল বেশ সতর্ক আছি, তার পর হঠাৎ দেখা গেল… এই ত্যাখো। কি করতে আসা, বাজে কথাতেই সময় কেটে যাচ্ছে। মেয়েটি সম্বন্ধে তুমি তা হলে নিচ্ছ খোঁজ। বেশ, আমি নিশ্চিন্দি রইলাম। আপত্তির কিছু না দেখ, আমি তখন তোমার দিকেই, অর্থাৎ সরিতের দিকে। থাকে কিছু আপত্তির, আবার দুজনে মিলে প্ল্যান বদলাতে হবে। আমার একবার লক্ষ্ণৌয়ে দরকার আছে, এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রাম পেয়ে চলে আসা তো—আজ এগারো দিন হয়ে গেল। একবার ঘুরে আসি, কেমন?"

"আপনি নির্ভাবনায় যান, যতদিন দরকার, ক্ষতি নেই।"—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস খুব সন্তর্পণে নামিয়ে দিল দোলু।

"হ্যাঁ, চালিয়ে যাও।...আর একটা কথা, জানি না তুমি কি মনে করবে।"

"আজ্ঞে, মনে করবার কি আছে? আপনি গুরুজন, যা বলবেন ভালোর জন্যেই তো। শিরোধার্য করে নোব।"

একটা গুরুভার নেমে যাচ্ছে, বেশ হালকা হয়ে বলল দোলু, দুটো কথা বাড়িয়েই।

"বলছিলাম, একেবারে এইরকম চেহারা করে যাওয়া, একটু, কি যে বলে..."

"আজ্ঞে, তা কখনও পারি? কলকাতা জায়গা, একটা ভ্যাগাবণ্ড্ বাড়ির আনাচে-কানাচে খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছে, বড় মানুষ, আমার খোঁজ নিতে পাঁচটা গুণ্ডা লাগিয়ে দেবে না? কিভাবে এগুব সেটা অবশ্য এখনও ঠিক করি নি, তবে যেভাবেই এগুই, লেফাফা-দুরস্তই থাকবে সব। সে আপনি ভাববেন না। নিশ্চিন্দি হয়ে যান।"

"তা হলে উঠি। আকাশটাও ধরে এসেছে।"

"হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে ওবেলাই একটা চক্কোর দিয়ে আসব। আপনি তা হলে আজই বেরিয়ে যাচ্ছেন?"

"দরকার কি দেরি করে? তুমি তো রইলে।"

গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে ওঁকে বিদায় দিয়ে এসে ফোন্‌টা তুলে নিল দোলু—

"সরিৎ আছে?"

"আমিই। কে, দোলু নাকি?"

"হ্যাঁ, চৌকোশ এসেছিল—পরাশর-কাকা রে।"

"বেরুল বটে মোটর নিয়ে। তা তোর ওখানেই গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, অনেক কথা। তার মধ্যে বড়টা হচ্ছে—সরে যাচ্ছে মঞ্চপট থেকে। আপাততঃ। আজই লক্ষ্ণৌ যাত্রা।"

"তার পর?"

"ঐ তো বললাম, অনেক কথা। আজ আর নয়, থাক, কোস্ট্ ক্লীয়ার (coast clear) হোক, তুই কাল সকালে আয়। আমি ইতিমধ্যে ওবেলা পার্কসার্কাসটা ঘুরে আসি। ঠিক রইল তো?"

"বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে না? কা—ল সকা—ল!"

"এসেছে পর্যন্ত অসূর্যম্পশ্যা হয়ে বসে আছে যে-ছেলে, পরাশর-কাকা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বারমুখো—এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রাম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়ে আনুন জ্যাঠাইমা।"

কণ্ঠে বেশ বিরক্তির ভাব।

সরিৎ বলল, "না না, থাক্ তবে—কাল সকালই।"

॥ নয় ॥

দিনটা আজ পরিষ্কার।

সকালবেলা হলঘরের দক্ষিণের বারান্দায় যে রোদটুকু এসে পড়েছে তাতে দুখানা চেয়ার পেতে দুই বন্ধুতে বসে আছে, মাঝখানে একটা টিপয়ে দু কাপ চা, এইমাত্র দিয়ে গেল চাকরটা। কাল পরাশর-কাকাঘটিত সব কথা এক চোট বলে গেছে দোলু। তার পর থেকেই দুজনে খুব গম্ভীর; কয়েক মিনিট হয়ে গেল, কোন কথা নেই। সরিতের গায়ে কালকের ড্রেসিং গাউন, মুখে সিগার; মাঝে মাঝে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

এক সময় দোলু তুলে নিল ওর দিকের কাপটা, ঠোঁটের কাছে পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বলল, "কিছু আন্দাজ করতে পারছিস? ··সামনে ছিল, তবু একরকম বোঝা যাচ্ছিল, এ কী যে এক বোড়ের চাল দিয়ে আড়াল হয়ে পড়ল, মাথা যেন গুলিয়ে দিয়েছে।···নে, চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

সরিৎ দু-তিন চুমুকে সবটুকু শেষ করে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, "বাস্তু-ঘুঘু, বলি নি? খুব পা টিপে টিপে এগুতে হবে।"

"পা টিপে টিপে এগুতে হবে!"—বেশ চটে উঠল দোলু। বলল, "ওর কাছ থেকেই লুকুনো আগে দরকার, কখন এসে পা টিপে টিপে দোর ঘেঁষে বসে একটি একটি করে সব শুনে নিয়েছে! আত্মীয়তা দেখিয়ে খাবার চেয়ে নেওয়া। ব্যস্, তার পর আর এদিকই মাড়াল না।···বসে না থেকে গল্প করি এস। সেই যে গল্পে শোনা—জামাই জিজ্ঞেস করছে শ্বশুরকে, মশাইয়ের বিবাহ হয়েছে? এ না হয় উল্টে জামাইকে—বাবাজী, এখনও বিয়ে কর নি কেন?·· আচ্ছা এক হেঁয়ালি আমদানি করেছেন জ্যাঠাইমা। তা আমিও···"

সরিৎ সিগারটা সরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বলল, "ওয়েট্! হয়তো

ধরে ফেলেছি। 'হয়তো' বলি কেন, নির্ঘাত, অন্যকিছু হতেই পারে না। উঃ, পাকা খেলোয়াড় একটা!"

"খুলে বলবি তো?"

"চাণক্য-নীতি, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।"

"ব্যস্, সংস্কৃত আওড়াতে আরম্ভ করে দিলে!"

"তোকে ভিড়িয়ে দিলে। মিলিয়ে দেখ। খাবার আনাতে বলে আত্মীয়তা করা থেকে বিয়ে করিস নি কেন খোঁজ নেওয়া, শেষে কেতুদের বাড়িতে ফিট-ফাট হয়ে যাওয়ার উপদেশ পর্যন্ত—কত যেন আপনজন হয়েই।...আমি আইবুড়ো আছি, চুল আঁচড়াই না, রেগুলারলি শেভ করি না তাতে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন বাপু? তুমি যে মহর্ষি বেদব্যাসের মতন একমুখ দাড়ি গজিয়ে বসে আছ, আমি তাতে মাথা গলাতে যাই?...মিলিয়ে দেখ। আর দরকার কি ওর এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার? একখানি মোক্ষম চাল দিয়ে সরে পড়ল। কাছে থাকলে তুই একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকবি তো; মাঠ ফাঁকা করে বেরিয়ে গেল; চরে খাক...একচক্ষু হরিণ, উফ্!"

দোলু চুপ করে ভাবতে লাগল।

"আরও আছে। কাল এখান থেকে যাওয়ার পর মা-র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুজগুজ ফুসফুস হয়েছে; তুই ফোন্ করে দিতে আমি খুব লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম তো। মা-রও সম্পূর্ণ ভাবান্তর; আর সে মা-ই নয়। এসেছি পর্যন্ত এতদিন মুখটা সর্বদাই যেন ভার ভার—খানিকটা রাগ, খানিকটা অভিমান, কাল নিজের হাতে শ্বেত পাথরের রেকাবি করে গোটা-আষ্টেক সন্দেশ নিয়ে হাজির—'নে খা, তোর মামার বাড়ির ডাকসাইটে নলেন গুড়ের সন্দেশ।' তার পর দুটো একথা সেকথা বলে—'তোর আর এমন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকা চলে বাবা? ওঁর বয়েস হয়ে আসছে, এখন তো সব ভার তোকেই তুলে নিতে হবে। আপিসে বেরিয়ে দেখ্ শোন। তার পর ঐ একটা বোন, বয়েস হয়েছে, আর কত দেরি করা যায়? হিঁদুর ঘরে তো খিশ্চানী কাণ্ড ঢোকানো যায় না।'...মার্ক করে যাবি দোলু, সব ঐ ঘুঘুর শিখিয়ে যাওয়া। আমি ভেবে সারা—হঠাৎ শীলাকে টেনে এনে আমায় উপদেশ দেওয়ার ঘটা—মা সাদাসিধে মানুষ, তাঁর এত কূটবুদ্ধি এল কোথা থেকে! এখন তোর মুখে সব শুনে তো বোঝা যাচ্ছে কেরামতিটা কার। খ্রীশ্চানী কাণ্ড—মানে কেতকীর ব্যাপারটা—ওরা যেটাকে বলছে খ্রীশ্চানী কাণ্ড, সেটা আমার ঘাড় থেকে তোর ঘাড়ে চাপিয়ে মাকে

সামনে ঠেলে দিয়েছে—আমি মোক্ষম চাল দিয়ে এসেছি, এ চালের মার নেই, এবার তুমি সইয়ে সইয়ে ছেলের মনটা তোয়ের কর। থাকলেই সন্দেহ করবে, সরে পড়ল—চলুক, খবর তো পেতেই থাকবে, আবার একদিন এসে একটি সূক্ষ্ম চাল···"

"হয়েছে ?"—প্রশ্ন করল দোলু। শোনার চেয়ে যেন একটা চিন্তা নিয়েই ছিল বেশি করে। সরিৎ নিজের আবিষ্কারে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল, "তার মানে ? বিশ্বাস করছিস না ?"

"তুই নিজে করছিস ?"

"প্রত্যেকটি কথা—যা যা বললাম। চিরকাল দুনিয়ায় যা হয়ে আসছে।"

"বেশ···তা হলে···"

একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল দোলু। আর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেটের কেস্‌টা বের করে আস্তে আস্তে ডালাটা খুলল, আস্তে আস্তে বের করে নিল একটা সিগারেট, তার পর সেইরকম মন্থর ভাবেই দেশলাই জেলে অগ্নিসংযোগ করে চেয়ারের পিঠে ঘাড়টা একটু উলটে দিয়ে টানতে লাগল। সরিৎ বিমূঢ়ভাবে একটু দেখল ; প্রশ্ন করল, "কি হলো আবার ?"

"কি বাকি রইল হতে ?"—মুখটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর করল দোলু।

"তার মানে !" অতিরিক্ত বিস্ময়ে ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করে চাইল সরিৎ।

"মানে খুব পরিষ্কার। যা বললে, দুনিয়ায় চিরকাল হয়ে আসছে বলে তার প্রত্যেকটি কথা যদি বিশ্বাস কর তো আমায় সরে দাঁড়াতে দাও।"

"সরে দাঁড়াতে দোব ?"

"দিতে হবে বৈকি। খোঁজখবর নেওয়ার ছুতো করে বন্ধুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছি এ দুর্নাম নিতে যাই কেন আমি ?"

"উঃ, তুই মুখ দিয়ে কথাটা বের করতে পারলি দোলু !"

"তোমার মুখ দিয়ে বেরুতে দোষ হলো না কিছু ? আমার তো বের করতে হলো আমার আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে। বিলেত যাই নি বলে ও জিনিসটা কারুর চেয়ে যে কম হবে···"

"দোলু ! তুই সেই দোলু !"

"মিলিয়ে ত্যাখো। সেই গেরস্তপোষা কাঁচিমার্কা সিগারেট, সেই ঝলঝলে

ব্যাপার, সস্তা চপ্পল। মুখখানাও মিলিয়ে নাও, যদি এতটুকু তফাৎ হয়ে থাকে এই দুটো বছরে...”

“দোলু! বাড়িতে ডেকে এনে আর কত জুতো মারবি? আমি এইরকম অসহায় হয়ে পুরনো বন্ধু জেনে তোর কাছে এসে দাঁড়ালাম, আর তুই কিনা পরাশর কাকার কথা ধরে...”

“কথাগুলো পরাশর কাকারই?”

“তবে? আমি তো তাঁর যা ভেতরকার কু-মতলব সেই কথা ধরে বললাম যে...”

“যা বললি তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে... এটা তো নিজের মুখেই বললি।”

সরিৎ শূন্যদৃষ্টিতে একটু চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে, যেখানে আরম্ভ হয়েছে কথাটা সেইখানে ফিরে আসায় যেন বুঝে উঠতে পারছে না এ-গাঁট কি করে ছাড়াবে। দোলুর মুখটা হয়ে উঠেছে আরও কঠিন, তর্কে একজন প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতে পারলে যেমনটা হয়। একটু ঘুরিয়েও নিল আবার, আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

কয়েকটা নির্মম মুহূর্ত দুজনের দুই তীরে অসহ্য চাপ দিয়ে মাঝখান হয়ে গেল বেরিয়ে।

একসময় সরিৎ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, “দোলু, দোহাই, চেষ্টা কর আমায় বোঝবার!”

“কথাটা সরাসরি গিয়ে মিস্ আইচকে বল, ফল হবে।”

“বলতে পারলি কথাটা আমায় তুই?”

“তুই এর চেয়ে শক্ত কথা আমায় বলেছিস।”

“বলি নি। বলছি আমি ও মীন করে বলি নি, শুধু পরাশর কাকার...”

“মীন না করলে বিশ্বাস করতে যাবি কেন? বল্, বলিস নি যে প্রত্যেকটি কথা মনের বিশ্বাসেই বলেছিস।”

আবার শূন্য দৃষ্টিতে চাইল সরিৎ; থৈ পাচ্ছে না। ঘাড়টা একটু ঘুরিয়েছিল এদিকে, আবার ফিরিয়ে নিল। আবার ক'টি কঠোর মুহূর্তের স্তব্ধ প্রবাহ, তার পর সরিৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, “বেশ, তবে তাই। আর আসব না তোকে কষ্ট দিতে; নিজের অদৃষ্ট নিজেই করব পরীক্ষা।...তারই বা আর দরকার কি? সব যাক!”

হঠাৎ সংকল্পে ওর মুখটাও কঠিন হয়ে উঠল, একটু শূন্য দৃষ্টিতে ওপরে সিলিঙের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "ছাড়লাম তো সবই ছাড়ি। কিসের কেতকী আইচ ?"

বলতে বলতেই ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা খুলছিল, হাত দুটো বের করে নিয়ে বারান্দার কিনারায় ছুঁড়ে ফেলল গাউনটা। সিগারটাও মুখ থেকে যেন ছিনিয়ে বের করে বাইরে ফেলে দিল। "তা হলে আসি দোলু।" বলে গটগট করে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে, দোলু না উঠেই প্রশ্ন করল, "একেবারে ছাড়লি ?"

ঘুরে দাঁড়াল সরিৎ, বলল, "রইল আর ফিরে আসবার অধিকার ?"

"তার মানে আমার যাওয়ার অধিকারও তো বাতিল হলো আজ থেকে ও-বাড়িতে ?"

আর এক ধাপ নেমেছিল সরিৎ, একটা যেন অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। একটু চিন্তা, তার পর বলল, "তা কেন ? আমার আর কি রইল এখানে ? কিন্তু তোর তো···থাক্, যেভাবে নিস ; টীকা তো নিজেই করছিস নিজের মনের মতন করে।"

স্তব্ধভাবে বসে রইল দোলু। অনেকক্ষণ। এবার মুহূর্তগুলো অতি মন্থর, যেন কাটতে চাইছে না। সিগারেটের আগুনটা আঙুলের কাছে এসে প্রায় ঠেকে যেতে যেন সাড় হলো। ফেলে দিতে গিয়ে প্রায়-আস্ত, ধূমায়মান সরিতের সিগারটার দিকে নজর পড়ল। একদৃষ্টে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল দোলু। সেও অনেকক্ষণ। তার পর চাকরটাকে ডেকে গাউনটা গুছিয়ে আলনায় তুলে রাখতে বলে, নিজেও গেল নেমে। গ্যারাজ খুলল, মোটরটা বের করে নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল।

॥ দশ ॥

সেইদিনই বিকালবেলা।

খুব ধীরে ধীরে ড্রাইভ করে দোলু সরিৎদের গাড়িবারান্দায় এসে উপস্থিত হলো। বেশ অন্যমনস্ক। আস্তে আস্তে সোজাই উঠে যাচ্ছিল, কি মনে হতে নেমে এসে বাঁ দিকে চলে গিয়ে সরিতের ঘরের স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির ধাপে পা

তুলে দিল। একটু অপেক্ষা, তার পর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বন্ধ দরজায় ঘা দিল। কাঁধে গাউনটা আলগা ভাবে ফেলা রয়েছে।

"কে ?"—প্রশ্ন হলো ভেতর থেকে।

"আমি···দোলু।"

একটু বিরতি ; বুঝে উঠতে যেটুকু দেরি, তার পর চটি টানতে টানতে এসে দরজা খুলে দিয়ে একটু বিমূঢ়ভাবে চাইল সরিৎ। দোলুর জামাকাপড় সেই-রকমই, তবে চেহারায় বেশ একটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। পাশ কাটিয়ে একটা কুশন চেয়ারে এসে বসতে সরিৎও দরজা বন্ধ করে একটা সোফায় এসে বসল। কয়েকটা বিলাতী কাগজ একধারে ছড়ান রয়েছে, দেখলে মনে হয় অলসভাবে নাড়াচাড়া করছিল। গায়ে একটা কট্‌স্‌উলের পাঞ্জাবি।

কথা অনেকক্ষণ নেই। সরিৎ আড়চোখে আর একবার চেয়ে নিল ওর দিকে, তবে কিছু মন্তব্য না করে হাতের কাছের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার পাতা ওলটাতে লাগল। দোলু কাঁধ থেকে গাউনটা নামিয়ে চেয়ারের হাতলে রেখে দিল, পকেট থেকে সিগারেটের কেস্‌টা বের করে ডালা খুলে বাড়িয়ে ধরল সরিতের দিকে, প্রশ্ন করল, "চলবে ?"

সরিৎ একটা টেনে নিতে দেশলাইটাও ধরল বাড়িয়ে। ও ধরিয়ে ফেরত দিলে নিজেও একটা ধরিয়ে চেয়ারের পিঠে গা উল্টে দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে যেতে লাগল।

আরও বেশ খানিকটা কাটিল, থেকে থেকে শুধু পাতা ওলটানোর একটা খসখসে শব্দ।

এক সময় দোলু বলে উঠল, "উঃ! ভাবছি আর শিউরে শিউরে উঠছি!"

ঘাড় না তুলেই। সরিৎ মুখটা অল্প একটু তুলে দেখে নিল। তখনই নামিয়ে নিল আবার, তার পর আর একটু সময় যেতে দিয়ে বলল, "আমিও।"

"তোর আর শিউরে ওঠবারও ক্ষমতা নেই, ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখবারও ক্ষমতা নেই। মিস্ আইচই প্রায় শেষ করে দিয়েছিল, ছিটেফোঁটা যা একটু ছিল 'চৌকোশ' মুছে দিয়ে প্রস্থান করেছে।"

"দুজন লেগেছে তবু। তোর একজনের হাতেই সবটুকু নিঃশেষ। মিস্ আইচের হাতে গিয়ে কি দশা হবে ভেবে পাচ্ছি না।"

বেশ সোজা দৃষ্টি মুখের ওপর ফেলেই বলে নিল সরিৎ। দোলুর মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। টিপয়ের অ্যাশ-ট্রের মধ্যে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটাকে মনের

সমস্ত উষ্মা দিয়ে টিপে টিপে নিভিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে বলে উঠল—"কেন শিউরে শিউরে উঠেছিস ? বল, বলতে হবে।"

একটু থতমত খেয়ে গেল সরিৎ, বলল, "সকালে যে অতগুলো কথা হলো—বাড়িতে ডেকে অপ..."

"অপমান! সেই পুরনো গৎ আওড়াচ্ছে এখনও! তবে আমারটা শোন। দেখ যদি বোঝবার ক্ষমতা থাকে বাকি একরত্তিও।"

চেয়ে রইল মুখের দিকে। সরিৎ বলল, "শুনিই না হয়।"

"পাকা শিকারী। এক তাগে তুই পাখী বলি কেন, তিনই—দোলু, সরিৎ, কেতকী আইচ। বন্ধু-বিচ্ছেদ—লক্ষ্ণৌ পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ফিনিশ্‌ড্‌। বাকি প্রেমিক আর প্রেমিকার মধ্যে। তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল।...কিরকম মনে হচ্ছে ? ঢুকল কিছু মাথায় ?"

আবার অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ, কাগজের খসখসানিটুকু পর্যন্ত নেই। এক সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে সরিৎ বলল, "ভালই তো ; বেশ হালকা বোধ হচ্ছে।"

"সে না হয় দোলু হতভাগা বিদেয় হয়েছে বলে। মিস্ আইচ ?"

"মিস্ আইচের কথাই হচ্ছে। দোলু জ্বালাবেই, উপায় নেই। অব্যেসও আছে, ঘাটা পড়ে গেছে। বরং মিস্ আইচ থেকে যদি পারে অব্যাহতি দিতে—যেভাবেই হোক, ভাবব একটা উপকার..."

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে পড়ল। গলাটা ধরে এসেছে। বারান্দায় বেরিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে নীচের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল, "শীলা, দোলু এসেছে, চা আর কিছু থাকে তো পাঠিয়ে দে। তুই নিজেই নিয়ে আয় বরং!"

দরকার ছিল না অত চেঁচাবার। শীলা ওপরেই তুটো ঘর বাদ দিয়ে পড়ার ঘরে ছিল, বলল, "পাঠিয়েই দিচ্ছি। গালাগাল খাওয়ার শখ নেই আমার ; কাল হ্যাংলা বদনাম পেয়েছি।"

ঘরে ফিরে এসে সরিৎ সহজ গলাতেই বলল, "ওটাকেও চটিয়েছিস!"

"থাক চটে, কেয়ার করি না। এদিকে একজনের রাগ ভাঙাবার ব্যবস্থা করে এসেছি।...এই তোর কার্ড, দেখ নামটা চিনিস কি না।"

একটা আইভরি-ফিনিশ্‌ দামী কার্ড। সরিৎ একবার ওপর নীচে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়ে যেতে লাগল—

The undersigned present their compliments to Sri Sarit

Kumar Roy and request the pleasure of his company at a gardenparty to be held to celebrate the happy return of their daughter Miss Ketaki Aich after finishing her education in the University of Leeds in England.

R. S. V. P to
Miss Ketaki Aich.
Place—"Park view", Park circus. Snehamoy Aich
Time—Sunday, November 24, 1962, 5 P.M. Aruna Aich

(নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা শ্রীসরিৎকুমার রায়কে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে এবং তাদের কন্যা কুমারী কেতকী আইচের বিলাতের লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করে ফিরে আসবার শুভ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্যান সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে)

স্থান—"পার্ক ভিউ", পার্কসার্কাস্ স্নেহময় আইচ
সময়—রবিবার ২৪ নভেম্বর, ১৯৬৩, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা। অরুণা আইচ
অপারগ-পক্ষে কুমারী কেতকী আইচের
সঙ্গে পত্রাচার করুন।

ও পড়ছে, একটু সময় দিয়ে এদিকে আরম্ভ করে দিল দোলু—

"সিনেমার নায়কের মতন রোয়াব দেখিয়ে গাউন-সিগার পরিত্যাগের ঘটা দেখে আর তো সন্দেহ রইল না ও-ছোঁড়ার মাথায় আর কিছুই নেই, নিতান্তই ক্ষমার্হ, অনুকম্পার পাত্র, নৈলে আমায় অত বড় কথাটা বলতে পারে ? মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খুব বেগ পেতে হলো না বের করে নিতে। বেশ বড় হালফ্যাশনের বাড়ি, দেয়ালের ওপর ফ্যান্সি রেলিং দিয়ে ঘেরা বড় কম্পাউণ্ড, লন, ফুলের বেড, দুটো গ্যারাজ। এর ওপর আবার লনে বড় শামিয়ানা খাটিয়ে ডেকোরেশনের ব্যাপার চলছে। থতমত খেয়ে গেলাম একটু। বেরুবার সময় একবার মনে হয়েছিল, না হয় কামিয়ে-কুমিয়ে একটু কেতাদুরস্ত হয়েই যাই, তার পর ভাবলাম—থাক, কি জানি যদি চেহারাখানা পালিশ করে নিয়ে গেলে আবার মিস্ আইচের···"

সরিৎ একটু তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে ছেড়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করল, "গেটে না ঢুকে খানিকটা এগিয়েই গেলাম। ডেকোরেশনের তোড়জোড়, ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়েছে তো, এদিকে মাথাটাও পরিষ্কার নেই, একটু ভাববার সময় পাওয়ার জন্যে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়েই গেলাম খানিকটা। যাত্রাটা ছিল ভাল। সামনের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরেছি, বাড়িই চলে আসব, গেটের সামনাসামনি আসতে হর্নের শব্দ শুনে দেখি 'জুবিলী ডেকোরেটার্স-এর (Jubilee Decorators) প্রোপ্রাইটার রাজেন বোসের ছেলে মাখন জীপ হাঁকিয়ে বেরিয়ে আসছে। নিশ্চয় ওরাই সাজানো-গোজানোর কনট্রাক্টটা পেয়েছে, মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জীপ দাঁড় করিয়ে নেমে গিয়ে বললাম, 'তোকেই খুঁজছিলাম। বাড়িতে বললে হয়তো এইখানে দেখা পাব, কনট্রাক্ট পেয়েছিস। ভাবলাম তবে তো খুবই শুভ যোগাযোগ। একটু কাজ করতে হবে ভাই, একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে।—' বললে, 'শুভযোগ বৈকি। তা ব্যাপারটা কি ?' বললাম, 'এই বাড়ির একটু পরিচয় দরকার—কারুর সঙ্গে, নিদেন চাকরবাকরও, তার পর আমি নিজের রাস্তা করে নোব। বলবি, আমি তোদের একজন পার্টনার, চেহারায় না মানায়, না হয় কর্মচারীই বলবি। তবে শেভ্রোলে মোটরটা রয়েছে, একটা বড় জায়গা দিলেই বোধ হয় ভাল।'...ভাবছিল, বলল, 'রাস্তা কেটে এগুবি কতদূর ? ফাঁসাবি না তো শেষকালে ?'

"মাখনাদের বাড়ি আমাদের ওদিকেই। হেঁজিপেঁজি ন্যাকড়া জড়ানো ডেকোরেটার নয়, বাইরে পর্যন্ত কাজ হয়—কংগ্রেস, কনফারেন্স। মাখনা বেশ আড্ডাবাজ ছেলে ছিল, সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। এখন একটু কাজের মানুষ হয়ে পড়েছে—বিয়ে করার পর থেকে—নিজের দুর্বুদ্ধি নয়, বাপ-মা ঝুলিয়ে দিয়েছে জোর করে "

চোখ তুলে চাইল সরিৎ কার্ড থেকে।

"বললে, 'পারা যায়, বেয়ারা-চাকর কেন, ভাল লোকের সঙ্গেই, কিন্তু...'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তুটা কিসের ?'

"বলল, 'মিস্টার আইচের মেয়েই সব দেখাশোনা করছে, আলাপ হয়েছে, কিন্তু ভয়...'

"মেঘ না চাইতেই জল, একটু হকচকিয়ে গেছি বৈকি। সামলে নিয়ে বললাম, 'ভয় তোর না তার ?'

"আমার তো মা-কালীর অভয় রয়েছে?" বলে হাসল মাখন। বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, আর দুশমন কালো। হাসল একটু আমার মুখের দিকে চেয়ে।

আমিও মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বললাম, 'তা আমিই বা কোন্ কন্দর্প? শুনেছি নাকি চোখ দুটো একটু টানা, তা তার মধ্যে কখনও দুষ্টুবুদ্ধি দেখেছিস?'

"মাখন হেসে বলল, 'মোটেই নয়। এই তো কি এক মতলব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিস, তা চোখ দেখে কিছু ধরবার জো আছে?·· রোস, একটু খেয়ে নিই। সোজা সেইখান থেকেই আসছি তো, ক্ষিদে পেয়েছে।'

॥ এগারো ॥

শীলাই খাবারের প্লেটটা নিয়ে এল। খুব বড় একটা প্লেট—সন্দেশ রাজভোগ সিঙাড়া কচুরিতে ছাপাছাপি। অনুযোগ করতে করতেই এল ছোঁড়া চাকরটার নামে, "হতভাগা লখাটা কোথায় গিয়ে বসে আছে, নিজেই বয়ে নিয়ে আসতে হলো।"

অবাক হয়ে চেয়েছিল দোলু, মন্তব্য করল, "বয়ে নিয়ে আসাই বটে! হ্যাঁরে শোন তো, এত একটা মানুষে খেতে পারে?"

"আমি যেন মানুষের জন্যে এনেছি!"

চেয়ারের ওপর রেখে চলে যাচ্ছিল, দোলু বলল, "দাঁড়া শীলা, রাক্কস বানিয়ে যাচ্ছিস!"

"কম দিলে কেপ্পন, দাঁড়ালে হ্যাংলা। আমি পারব না।"—হনহন করে বেরিয়েই গেল। অর্ধেক বারান্দা না পার হতেই লখা জল নিয়ে এল। অর্থাৎ সমস্তটাই সাজানো। দোলু সরিতের দিকে চেয়ে বলল, "দিন দিন কী হয়ে উঠছে বল্ দিকিন্, লঘু-গুরু ভেদ রাখতে চায় না!"

চাকরটাকে একটা খালি প্লেট আনতে বলল। সরিৎ একটু চিবিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কেন, সনাতন লক্ষ্মীপাঠশালার মেয়ে তো।"

এও বোনের মতোই পরশুকার কথার জন্যে খোঁচা। ভাই-বোন দুজনেই সমান। একটু হাসি পেল দোলুর, তবে খোঁচাটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিতেও ছাড়ল না। প্লেটটাও পাশের ঘরেই ছিল, লখা সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসতে

কিছু তাতে তুলে রাখতে রাখতে বলল, "নিয়ে আসি লীডসে-পড়া মেয়ে আগে, লক্ষ্মীপাঠশালার দোষটা যদি কাটিয়ে দিতে পারে।"

একটু ভয়ে ভয়েই বলল; ছোট্ট বীচিভঙ্গ সকালের মতো আবার উত্তাল তরঙ্গে না দাঁড়ায়।

"খা"—বলে প্লেটটা এগিয়ে দিতে সরিৎ বলল, "পোড়ারমুখী তা হলে আমায় রাক্কস, হ্যাংলা তুই-ই বলবে।"

একটু যে হাসি উঠল তার মধ্যে দিয়ে সম্ভাবিত বিপদটুকু কেটে গেল। তুলেই নিল প্লেটটা সরিৎ। দোলু একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে শুরু করল—

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বললাম না, যাত্রাটা ছিল খুব ভাল। মাখন বলল, 'হয়েছে রে! তোকে জুবিলী ডেকরেটার্সের পার্টনার করেও নিতে হবে না। ওরা ফুলের জন্যে বেশ একটু দুশ্চিন্তায় পড়ছে। যাদের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট ছিল তাদের হঠাৎ কি একটা বিপদের জন্যে তারা সাপ্লাই দিতে পারবে না, মিস্ আইচ আমায়ই ধরেছে। ফ্লোরাল ডেকোরেশানের সাইডটা তো আমাদের নেই, কি করতে পারা যায় তাই দেখতে বেরিয়েছি। তা তুই কন্‌ট্রাক্টটা নে-না। পরিচয়ের সবচেয়ে ভাল চান্স একটা, দিব্যি সরসও।'...আমি দোব ফুলের সাপ্লাই!...মাখন বললে, "তোকে সাপ্লাই দিতে কে বলছে মুখ্যু? আমাদেরই তো ঠিক করতে হবে, তোকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি—খুব বড় ফ্লোরিস্ট, ইণ্ডিয়ার বাইরে পর্যন্ত প্লেনে ফুল সাপ্লাইয়ের কারবার, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিলেত থেকে মেয়ে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে। তারই পার্টি দিচ্ছে আজ—গালভরা নাম, গালভরা কথা খুব পছন্দ মেয়ের, দু কথাতেই জমে বসবি। কিন্তু এরকম করে হবে না। এ যেন পাঁচ দিন আগে নিমতলার ঘাটে দিদিমার ল্যাঠা চুকিয়ে বেলাল্লা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।'

"ওরই পরামর্শে দুজনে চৌরঙ্গীতে গিয়ে (এই যা দেখছিস) একটা ভাল সেলুনে চুল ছাঁটিয়ে গোঁফজোড়াটাকে এই ভদ্র রূপ দিয়ে, সেভিং শ্যাম্পু করে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে একটা দামী তোড়া আর বেতের ব্যাস্কেট করে কিছু ফুল-ফার্ন-অর্কিড কিনে নিলাম। তার পর বাড়ি গিয়ে পার্টিতে যাওয়ার একটা স্যুট চড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে, ওরই জীপে। আমার গাড়িটা গ্যারাজেই তুলে দিলাম।

"যা ভয় করেছিলাম আমরা—অথবা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, পরাশর

কাকা যা আশা করেছিল—একেবারে লভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। (Love at first sight !)"

এমন ভাষার প্যাঁচ দিয়ে বলা—সরিৎকে চটাবার জন্যই—তা ভিন্ন অনভ্যস্ত বলে ঘাড়ের রগের চামড়া ঘেঁষে চুল ছেঁটে, গোঁফ মিহি করে ওকে দেখাচ্ছেও এমন অদ্ভুত যে সরিৎ হাসি সংবরণ করতে পারল না। ওর লক্ষ্য এড়িয়ে গিয়ে বলল—"তবে আর কি, কেল্লা ফতে; আমার ভাগ্যে অতটা হয় নি।"

"শামিয়ানার মধ্যে, কম্পাউণ্ডের আরও অন্য সব জায়গায় ইলেক্‌ট্রিক্ ফিটিং হচ্ছে, তদারক করে বেড়াচ্ছিল, মাখন আমায় নিয়ে হাজির করতে, যেমন সিনেমায় দেখেছি, ডান হাঁটুটা অল্প একটু মুড়ে তোড়া আর ব্যাস্কেটটা এগিয়ে ধরলাম। নিয়ে মাখনের দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য চমৎকার! কিন্তু এঁকে তো চিনছি না, আপনার বন্ধু ?'

"মাখন একটু হাসল, বলল, 'অতটা দাবি করতে পারি না; এঁরা কোথায় আমরা কোথায়! এঁরা হচ্ছেন কন্টিনেণ্টাল ফ্লোরিস্টস্ (Continental Florists)। আমাদের শুধু ইণ্ডিয়াতেই কারবার, এঁদের কারবার ইউরোপের সঙ্গে—প্যারিস, লণ্ডন, জেনেভা—এরোপ্লেনে রেগুলার সার্ভিস, আজকাল ওদিকে ফুলের ভারতীয় স্টাইলের গয়নার খুব ডিম্যাণ্ড যে! সেরকম বিশেষ কোন অকেজন (occasion) হলো—কোন বড় শো (show); কিম্বা বড় পার্টি তো ফ্লাই করে নিজেদেরও যেতে হয়—সেইরকম বড় সোসাইটিতে মেলামেশা—আমাদের মতন হেঁজিপেঁজি…'

"টুকে দিতে হলো বিনয়ের হাসি হেসে। বললাম, 'এরোপ্লেনটাকে আর কত ওপরে তুলবেন মিস্টার বোস!'

"মাখন বলল—'না, পরিচয়টা দিতে হবে বৈকি। আজকাল ইণ্ডিয়ায় এঁরা কাজ প্রায় উঠিয়েই দিয়েছেন, বাইরেই সামাল দেওয়া দুষ্কর। জানা ছিল, আগে একসঙ্গে অনেক জায়গায় কাজ করেছি, গিয়ে ধরলাম। কোন মতেই রাজি হবেন না, শেষে এক শর্তে ধরে এনেছি। আসবেন আমার সঙ্গে, তার পর বলে কয়ে এখান থেকে যদি পরিত্রাণ পান তো আমার কিছু বলবার থাকবে না।"

"আমি বললাম—'কিন্তু এরকম মতলব আপনার তা তো বুঝতে দেন নি মিস্টার বোস; তা জানতে পারলে…'

" 'কি মতলব ?'—আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল মিস্ আইচ।

"বললাম, 'কথা ছিল মিস্টার আইচের কাছেই নিয়ে যাবেন।'

" 'তাতে ডিফারেন্সটা কি হতো ?'—জিজ্ঞেস করলে মিস্ আইচ।

"বললাম, 'তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত হতো না। কিন্তু…'

" 'কিন্তুটা কি ?' প্রশ্ন করল, মেয়েরা যেমন জেনেশুনেও প্রশ্ন করে পরের মুখে শোনবার জন্যে। মাখন একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'উনি বলতে চান, একজন লেডির অনুরোধ…'

"তা বেশ স্টাইল আদায় করে এনেছে বিলেত থেকে একথা বলতেই হবে। মেমেদের মতন রাজহংস-ভঙ্গিতে গলাটা দুলিয়ে এনে বলল, 'ইফ্ হ্যাট ইজ সো (If that is so), আমি ওঁকে কী বলে যে ধন্যবাদ দোব সত্যি বুঝে উঠতে পারছি না। না, আপনাকে এ দায়িত্বটুকু নিতেই হবে মিঃ…'

"মাখন বলে দিলে, 'মিস্টার পুলকেশ মিটার।'

" 'নিতেই হবে দায়িত্ব মিস্টার মিটার। আমি যে কী সমস্যায় পড়েছি! আপনি ছাড়ান্ পাবেন কোত্থেকে দেখি ; বাবার সঙ্গে দেখাই করতে দোব না আপনাকে। বাঃ, ঘরে একজন দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছে—এ পার্টি অ্যাণ্ড নো ফ্লাওয়ার ! (A party and no flower !) আর উনি লণ্ডন-প্যারিসের কথা ভেবে হয়রান হচ্ছেন ! দেখুন না মিস্টার বোস্, অবিচার নয় ?'

"সে আবদার-অভিমানের ঝাপটা জাহাজে তোর ওপর দিয়েও তো গেছে। মাখনা হতভাগা ঘাগি ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে তো, দাঁও বুঝে প্যাঁচ কষে দিল, বলল, 'কিন্তু রেট ওঁদের অনেক বেশি, তা ভিন্ন বাইরের অর্ডার ক্যান্সেল্ (cancel) করে তবে তো এঁরা এটা দিতে পারবেন।'

"মিস্ আইচ আবার গলাটা দুলিয়ে দিয়ে, মুখটা একটু কুঁচকে বলল, 'অ্যাজ ইফ্ রেট ইজ এভরিথিং ! (As if rate is everything !), আপনার যেরকম পড়তা বিল করবেন মিস্টার মিটার। নো ওয়ারি (No worry)'।

"ভয়ানক রাগ হলো হতভাগার ওপরে। একবার মনে হলো—দিই স্পেশ্যাল কেস (speical case) বলে দরটা ভালো করেই নামিয়ে, বেশ খাতিরও জমে যাবে মিস্ আইচের কাছে। কিন্তু সবটাই ভুয়ো, ও রাস্কেল্‌কে চটাতে সাহস করলাম না।…কি রকম মনে হচ্ছে ?"

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে শীলা চাকরের হাতে দিয়ে নিয়ে আসতে একটু বিরতি এসে পড়ল। প্রস্তুতি-পর্বটা একরকম চুপচাপই কাটল। যদিও অবশ্য একেবারেই নয়। চিনি দেওয়ার সময় শীলা বলল, "চিনি তোমরা নিজেরাই

নাও, যার যেমন দরকার। বেশি হলে শরবত, কম হলে কথাই নেই ; ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।"

দোলু বলল, "তাতে ভয় তো বরং আমাদেরই ; বেশি করে বিঁধিস।"

চটিয়ে বের করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, "সব চামড়ায় বেঁধা যায় না"—বলে হনহন করে বেরিয়ে গেল শীলা। দরজা পেরিয়ে বলল, "যাওয়ার আগে মা-র সঙ্গে দেখা করে যাবে। বলে দিয়েছেন।"

॥ বারো ॥

চা-পানও একরকম নীরবেই কাটল। দুজনে নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে রয়েছে। একবার সরিৎ বলল, "একটা ক্ষমতা দেখেছিস জাতটার ? শেষ কথাটা ওরাই বলে যায়।"

ঠোঁটে অল্প একটু হাসি।

"নতুন কথা আর কি ?" বেশ সহজ ভাবেই বলল দোলু, "কথাই তো আছে—ম্যান প্রোপোজেস উওম্যান ডিসপোজেস (man proposes woman disposes), শেষ নিষ্পত্তি তো ওদেরই হাতে।"

সরিৎ-কেতকীর সম্বন্ধ ধরেই বলা—যে প্রসঙ্গটা চলছিল। সরিৎ বলল, "এগজ্যাক্টলি—খুবই খাঁটি কথা।" হাসিটা আরও একটু স্পষ্ট করল।

ওর টিপ্পনীটা গায়ে মাখল না দেখে দোলু একটু যেন ধাঁধায় পড়ে চোখ তুলে সেকেণ্ড দু-চার ভাবল, তার পর ওদিকটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "মাখন পরিচয়টা করিয়ে দিয়ে চলে গেল, বলল, 'এবার আপনারা ঠিক করে নিন কিরকম কি দরকার, আমার একটু বাইরে কাজ আছে।...জীপটা পাঠিয়ে দোব মিস্টার মিটার ?'

"মিস আইচ বলল, 'কিছু দরকার নেই, আমার গাড়িতেই পাঠিয়ে দোব ওঁকে।'

"ঘুরে ঘুরে প্ল্যান করে বেড়াতে লাগলাম আমরা—মালা, তোড়া, কোথায় কি লাগবে, কিরকম ফার্ন বা পাতা। তা ভিন্ন কত নোজগে (Nosegay), কি ধরনের। এর ফাঁকে অন্য গল্পও হতে লাগল—কতদিনের ব্যবসা আমাদের—আমি নিজে কখনও ফ্লাই করে গেছি কিনা...যেতে হয়েছে বৈকি—খুব সাবধানে,

ও যে-যে জায়গায় গেছে সেগুলো বাদ দিয়ে বা সেগুলোর সঙ্গে পরিচয়ের সংক্ষিপ্ততার কথা তুলে চালিয়ে গেলাম একরকম করে।...না, লীড্‌সে কখনও যাওয়ার চান্স হয় নি—লণ্ডন হয়েছে, প্যারিসও, দুবার। একবার একস্‌-পোজিসিয় কলোনিয়াল উপলক্ষে, দ্বিতীয়বার এক বড় ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর ডায়মণ্ড জুবিলীর ব্যাপারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য। দুবারই নিজের কন্‌ট্রাক্ট সামলাতে এমন ব্যস্ত থাকতে হলো যে, একবার ঘুরে যে দেখে আসব শহরটা তা আর হয়ে উঠল না। আবার একটা চান্স আসছে, মতলব করছি একজন ভাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিয়ে গিয়ে তারই ঘাড়ে সব ঝুঁকি চাপিয়ে স্রেফ ঘুরে বেড়াব এবার। তখন কারবারও নতুন, এখন গুড-উইল (Goodwill) দাঁড়িয়ে গেছে, আর ভয় নেই অতটা।'

"গল্প চালিয়ে যাচ্ছি, একতরফাই নয়, ওর অভিজ্ঞতাও আছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে কি করে তোর কথা এনে ফেলা যায়, সেই দিকে। কাল বাদ দিয়ে পরশু পার্টি—তোর নামটা লিস্টে উঠেছে কিনা—আজ পর্যন্ত তো পাস নি কার্ড—প্রথমবারে ভুলও হয়ে যেতে পারে—এসেই পার্টির খেয়াল নিয়ে পড়েছে তো—না উঠে থাকলে কি করে মনে করিয়ে দেওয়া যায়—এই সব ভাবনাও রয়েছে ওদিকে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি।

"শেষকালে এই অন্যমনস্ক হয়ে পড়াই কাজ দিল। প্ল্যান-পরামর্শের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি গল্প করতে করতে, তারই মধ্যে মিস্ আইচ একবার হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু মিস্টার মিটার, আপনাকে ডিটেন্ করছি না তো ?'

"বলতে যাচ্ছিলাম—মোটেই নয়।—সত্যি কথাও তো সেইটেই—যার বিশ্ব-সংসারে কোন কাজ নেই তাকে আবার আটকে রাখার কথা কি ? কিন্তু হঠাৎ মাথায় আমার একটা বুদ্ধি খেলে গেল! একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'না, ডিটেন্ আর কি—আপনার মতন একজন কালচার্ড (cultured) লেডির সঙ্গ—আমরা ফুল নিয়ে কারবার করছি, মেয়েরাই এতে বেশী ইণ্টারেস্টেড্ (interested), কিন্তু এমন সূক্ষ্ম রুচি আজ পর্যন্ত কোথাও তো চোখে পড়ল না। কত যে শিখলাম এর মধ্যে! মনে হচ্ছে, যতক্ষণ থাকা যায়, আমারই লাভ, কিন্তু...'

"'কিন্তু কি ? না মিস্টার মিটার কাজে ক্ষতি করাতে চাই না আমি ; একে তো একটা অর্ডার ক্যান্‌সেল্ করে এ দায়িত্বটা যে নিলেন আপনি তার জন্যে যে আমি কত কৃতজ্ঞ...'

"বললাম, 'একটা এন্‌গেজমেণ্ট ছিল রয়-গুপ্টা অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্‌টারের ছেলের সঙ্গে।'

"হাত উলটে ঘড়িটা দেখে বললাম, 'তা—এর পরে গেলেও চলবে।'

"অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বলল—'দাঁড়ান তো একটু মিস্টার মিটার।···'রয়-গুপ্টা, রয়-গুপ্টা' বলে মনে করবার ভঙ্গিতে কয়েকবার কথাটা নিয়ে জিভে নাড়া-চাড়া করল, তার পর প্রশ্ন করল, 'কি নাম বলুন তো ম্যানেজিং ডিরেক্‌টারের ছেলের ?'

"বললাম, 'সরিৎ রায়। তিনিও সম্প্রতি ইউরোপ থেকে এসেছেন, কোন্ বোটে বলতে পারি না—তাঁদেরও নাকি আপনাদের মতন এইরকম একটা পার্টি দেওয়ার কথা হচ্ছে। অবশ্য কন্‌ট্রাক্টটা নিতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে ডেকেছেন, একবার দেখা করাটা দরকার।'

"খুব অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে মিস্টার সরিৎ রায়ের জানাশোনা আছে ?'

একটু হেসে বললাম, 'জানাশোনা—এই কাজ নিয়ে আর কি। মস্তবড় কোম্পানী, বছরে দু-চারটে তো লেগেই আছে ছোট বড় ফাংশন। পুরনো সম্বন্ধ, ছাড়তে চায় না।'

"লক্ষ্য করে যাচ্ছি মুখের ভাবটা। অন্যমনস্কই, তবে তার সঙ্গে একটু লজ্জা, একটু অনুতাপ, আবার খানিকটা আনন্দও যেন। বলল, 'মিস্টার মিটার, আপনি আমার মস্ত একটা উপকার করতে পারেন। মিস্টার রায় আর আমি এক বোটেই এসেছি। কিছু কিছু পরিচয়ও হয়েছে—বাঙালী আমরা মাত্র দুজনই তো ছিলাম। কিন্তু এমন আন্‌ফরচুনেট ব্যাপার, ওঁর ঠিকানাটাই নেওয়া হয় নি আমার। আর ঐ রয়-গুপ্টা—একবার শুনেছিলাম মিস্টার রায়ের মুখে—ভাবলাম টেলিফোন ডিরেক্‌টারি দেখে বের করে নিই ঠিকানাটা, তা—হাউ ফানি (How funny) দেখুন, রায়-দত্ত মনে পড়েছে, দত্ত-রায় মনে পড়েছে, রয়-গুপ্টা আর মনে পড়ল না! ভাবতে পারেন এরকম অদ্ভুত ব্যাপার ?'

"বললাম, 'মাথার মধ্যে একটা কথা ঢুকে গেলে অনেক সময় হয় এরকম, বাজেটা আসলটাকে রাখে ঠেলে।'

"বলল, 'অবশ্য মনের দোষও দেওয়া যায় না। এসেই এই কাজটা হাতে নিয়ে যে কি ভীষণ জড়িয়ে পড়েছি! যাক, সে দুঃখের কথা। আপনি আমার

ডেলিভারার (Deliverer) হয়ে এসেছেন, এদিকটা দিলেন সামলে, কার্ডটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। পাঠানো যায় ডাকে, কিন্তু একটা দিনও পুরো পাচ্ছি না, পৌঁছবে কিনা বলা যায় না। তা ভিন্ন…'

"একটু থামল, যেন আরও একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। বললাম, 'বলুন।'

" 'একটু বুঝিয়ে বলা যে আমি কত দুঃখিত, কী অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে এই ভুলটা হয়ে গিয়েছিল। একটু না জানিয়ে দিলে মিস্টার রায় ঐ আর. এস. ভি. পি'র (R. S. V. P.) সুযোগই নেবেন, আসবেন না। আর, তা হলে আর আমি কোনমতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না মিস্টার মিটার। আপনাকে এ উপকারটুকু করতেই হবে।'

"বললাম, 'আপনার এটুকু কাজে আসা, এ তো মস্তবড় একটা সৌভাগ্য আমার মিস্ আইচ। আর, উপকারের কথা যদি বললেন—এই প্রেজেন্ট দায়িত্বটুকু দিয়ে আপনিই তো আমার একটা মস্তবড় উপকার করছেন। অত বড একটা পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার যত সুযোগ পাওয়া যায় ততই আমাদের বিজ্‌নেসের পক্ষে ভালো। এখন, যেমন মিস্টার বোস বললেন, দুদিক সামলাতে সত্যিই একটু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ইণ্ডিয়ার কারবার তুলে দিলেও তো চলবে না আমাদের।'

"ভেতরে গিয়ে দুখানি কার্ড ভরে নিয়ে এল, একখানি আমার, আর একখানি ঐ তোর।…কিরকম মনে হচ্ছে?"

সরিৎ কার্ডটার দিকে চেয়ে ছিল, বলল, "আর লেখার ছাঁদটাও কি সুন্দর দেখেছিস!"

এমন কিছু নয়, তবু দোলু ওর স্বপক্ষেই বলল, "কার নাম, কত প্রাণ ঢেলে লেখা, সেটা দেখতে হবে তো? কিন্তু কি ঠিক করলি—যাবি?"

চকিত বিস্ময়ে চোখ তুলে চাইল সরিৎ—ভাবটা, এ নিয়েও কোন প্রশ্ন হতে পারে নাকি! দোলু নিজের মনেই বলল, হ্যাংলা ভাত খাবি? না, পাত পাতব কোথায়?

সরিৎকে বলল, "আমি তো বলি এ চান্সটা আর. এস. ভি. পি'ই থাক—ধন্যবাদ কিন্তু বিশেষ দুঃখিত, অমুক কারণে এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হলো।"

"কিন্তু কারণটা কি?"

"দেখ না ভেবে, কিছু একটা যাবেই পাওয়া। একটা কারণ—সিগারটা রপ্ত

হয় নি এখনও, কেশো রুগীর মতন একটা নুইসেন্সই (Nuisance) হয়ে পড়বি তো পার্টির মধ্যে।"

ওর হেদিয়ে পড়ার ভাব দেখে হঠাৎ কিরকম রাগ এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, একটু ভেবে দেখ না। ভালবাসার আবার একটা রীতি আছে তো। ডাকলে, আর ছুটে গেলাম—পার্টির ভিড়ে বোধ হয় অ্যাটেন্‌শনও (attention) দিতে পারল না—তার চেয়ে গোড়াতেই এক অভাব—একটা বিরহের ভাব—ক্ষিদেটা পাকিয়ে নিলে যেমন দু-মুঠো বেশি খাওয়া যায় বড় গ্রাস তুলে…"

"এর সঙ্গে দু-মুঠো ভাতের গ্রাসের তুলনা করলি ?" ব্যাথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সরিৎ। হঠাৎ ওর এ ভাবপরিবর্তনে যেন কিছু ভেবে উঠতে পারছে না।

"তা না হয় নাই করলাম। মনে হলো এইটে বেশ লাগসই উদাহরণ হবে তাই বললাম।"—সান্ত্বনার স্বরেই নিজেকে সুধরে নিল দোলু, বলল, "কিন্তু ভেবে দেখ, কথাটা ঠিকই বলছি। এর পর বরং তুইও একটা পার্টি দে, সে আমি জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমাকে বলে তার ব্যবস্থা করে দোব, তাইতে ওকে ইন্‌ভাইট কর…"

"যদি ও-ও আর. এস. ভি. পি করে—না আসে ?"

"গুঁতোর চোটে আসবে। তুই হতভাগা পলিসি বুঝিস না ; এই যে বিরহটা চাপিয়ে দিচ্ছি ঘাড়ে, অমনি ? টুঁটি টিপে যদি নিয়ে না আসে তো আমার নামে একটা…"

"থাম।"—বিরক্তভাবেই থামিয়ে দিল সরিৎ। মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, "তুই যেন আর ভাষা খুঁজে পেলি নি—দু-মুঠো ভাতের গ্রাস…ঘাড়ে চড়ে টুঁটি টিপে ধরা…এত বড একটা সিরিয়াস্ জিনিস, ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে ! করে দে সব পণ্ড তার চেয়ে, কাজ নেই।"

"তুই নিশ্চিন্দি থাক না, ওদিকের দূতালিও তো আমারই হাতে। দেখলি তো কার্ডটা কি করে বাগালাম। যদি প্রাণের দায়ে ছুটে না আসে তো…"

"থাক, হয়েছে। কার্ড বাগিয়ে তো ভারি উপকার হলো !

॥ তেরো ॥

কার্ড সংগ্রহের ব্যাপারটাতেই প্রথম ধোঁকা খেয়েছিল দোলু।

ওর উদ্দেশ্যই ছিল খুব সমঝে-বুঝে অগ্রসর হওয়া। যদি বোঝে সেরকম তো চেষ্টাই করবে; এগিয়ে দেবে সরিৎকে, সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে; এদিকে আস্তে আস্তে জ্যাঠাইমার মনটা প্রস্তুত করতে থাকবে। বন্ধুর অবস্থা যে খারাপ তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই, কিন্তু এগুবার আগে সবচেয়ে প্রয়োজন ওদিককার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। বড় মানুষের স্বৈরিণী কন্যা, মুক্তপক্ষে উড়ে বেড়াচ্ছে, ও যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবে—একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয় বৈকি।

কার্ডের ব্যাপারটা বেশ মনঃপূত হলো না দোলুর, অন্তত বেশ বুঝতে পারল না। হতে পারে ভুলই, জ্ঞানতঃ ঔদাসীন্য নয়, তবু, দুদিন আগে যা ওর কাছে এত বড় একটা জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে চোখের জলে তার পরিসমাপ্তি ঘটল, সেটার দাগ দুদিন পরেই মিটে যাবে এই বা কেমন কথা?

ঠিকানা বের করতে না পারার কথাটা আরও যেন হালকা মনে হয়; ধোপে টঁ্যাকে না। সবটাই যেন দোলুর সঙ্গে সরিৎদের জানাশোনা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে কেতকীর তাড়াতাড়ি গোঁজামিল দিয়ে সামলে নেওয়া।

হয়তো দোলুর ভুল। অতি আধুনিকাদের সম্বন্ধে তার যা ধারণা সেটা মিস্ আইচের ওপর গিয়ে পড়ে একটা ভ্রান্ত অভিমতের সৃষ্টি করেছে। তবু ওর মনে হলো, বন্ধুকে আর এগুতে দেওয়ার আগে নিজেই ভালো করে পরখ করে নিলেই যেন ঠিক হয়। বিশেষ করে হাতের কাছেই যখন এমন একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে ভাগবত পড়ছিলেন, সরিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোলু গিয়ে দাঁড়াতে মোটা চশমা-সুদ্ধ চোখ দুটো ওপরে তুলে একটু চেয়ে রইলেন, তার পর প্রশ্ন করলেন—"কে?"

"আমি জ্যাঠাইমা, আপনার দোলগোবিন্দ"—উত্তর করল দোলু। মাঝে মাঝে এইভাবে নিজের নামটার ওপর আক্রোশ মেটায় ওঁর কাছে। অবশ্য, লঘু-চিত্ততাই, ওঁকে একটু রাগানো। একটু হাসেনই উনি, বললেন, "আয়

বাবা, বোস্, নতুন চশমাটা দিলে, বইয়ের অক্ষর ছাড়া একটু তফাতে আর নজর যায় না।"

"এ যে মহা বিপদ জ্যাঠাইমা তা হলে।"—বসতে বসতে বলল দোলু, "এমন এক চশমা কিনলেন যাতে ভাগবতই শুধু রইল, আমরা সবাই ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলাম!"

"কথা শোন ছেলের!"—চশমাটা খুলে খোলের মধ্যে রেখে দিলেন, বললেন, "আয়, কাছে সরে আয়, এইখানটায় দিব্যি রোদ রয়েছে এখনও।"

দোলু সরে পাশে বসতে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আমার আবার ভাগবত পড়া, অক্ষর গুনেগুনে এগুনো। তা কেমন আছিস বল্ তো।"

মুখের ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এমনভাবে চেয়ে রইলেন, একটু নূতনই ঠেকল যেন দোলুর, বলল, "পরশুর থেকে আর কত অন্যরকম হয়ে যাব জ্যাঠাইমা—ভাল বা মন্দ?"

তার পর হেসে বলল, "আপনি আপনার ভাগবতের গোবিন্দ বলে ভুল করছেন না তো?"

বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে গিয়েই উনি বললেন, "তা নয়ই বা কিসে? যে গোবিন্দ যশোদার কোলে, সেই গোবিন্দই তো আর সব মায়ের কোলে বাবা, ভুলটা আর কি করেছি এমন?···খাবার খেয়েছিস?"

"ননী মাখন নয় কিন্তু।"

আবার জোরে হেসে উঠল। দুটো হাসির দমক, শীলা—"এত হাসি কিসের?" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, দোলু জুড়ে দিল, "তবু, বলতে রসগোল্লা-সন্দেশই ছিল। কিন্তু শীলার বচনের চোটে···"

"বল,—'আর দাঁত ফোটানোর' · "

"তোর কথাতেই বলি, 'রাক্কোস না হলে আর দাঁত ফোটানোর উপায় ছিল না'—" ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করে দিল দোলু। আজ কি হয়েছে, জ্যাঠাইমা স্থূল শরীরটা দুলিয়ে বেশ ভাল করেই হেসে উঠলেন, যে টিপ্পনী শুনে শীলাকে ধমক দেওয়ারই কথা ওঁর। হাসতে হাসতেই বললেন, "কী জ্বালা বাবা! দুটোতে এক জায়গায় হয়েছে কি পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতন কথা কাটাকাটি—কদ্দিনে যে সুদরোবে! · তুই একটু যা শীলা, নিজের কাজ করগে, একটু দরকারি কথা আছে দোলুর সঙ্গে।"

"যাচ্ছি ; আমার সম্বন্ধে না হলেই হলো। পেছন ফিরলেই নিন্দে তো ?"

"ঐ নিন্। সামনে কখনও সুখ্যেতি করতে শুনেছেন জ্যাঠাইমা, যে তার লোভে ছুটে আসে ?"

"ইস্! ছুটে আসে!"

ও চলে যেতে জ্যাঠাইমা "কোথায় যাব মা!" বলে হাসির জেরটা মিটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটু চুপ করে রইলেনও গম্ভীর হয়ে, যেন নূতন প্রসঙ্গটার অবতারণাটা কি করে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না, তার পর বললেন, "হ্যাঁরে দোলু, আজকাল মেয়েরাও নাকি ন্যাকাপড়া করতে বিলেতে যাচ্ছে ? লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুরপোর মুখে শুনলাম। কালে কালে কি হলো বাবা ?"

কথাটা পৌঁছে গেছে তা হলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পরাশর কাকা যে দিলেন পৌঁছে তা একেবারে বিরূপ মন্তব্যের সঙ্গে, না দুদিক বজায় রেখে, যেমন দোলুর সঙ্গে হয়েছিল কথা ? একটু চুপ করেই রইল দোলু মাথাটা হেঁট করে, তার পর ঘাড় তুলে একটু হেসে বলল, "আপনি যে সেকালটাকে আপনার পুজোর ঘরে আটকে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে রয়েছেন জ্যাঠাইমা, বাইরের এ কালটা তো লম্বা পা ফেলেই এগিয়ে চলেছে। অত দূরে যাওয়ার দরকারই বা কি ? শীলা শুনলে বলবে পেছন থেকে আমার নিন্দে করছে, কিন্তু ওকে সামনে ক্ষ্যাপাই বলে পেছনে ক্ষ্যাপানোর কথা বলে লাভ তো নেই, আপনি বুঝবেন বলেই বলছি। এই দেখুন না, আপনার মেয়ে, আপনি অক্ষর জুড়ে জুড়ে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত পার করে দিচ্ছেন, ওর সে অসুবিধে নেই, লেখাপড়া জানা মেয়ে, আসছে বছর দুটো পাস দেবে, দিয়েছেনও লক্ষ্মী-পাঠশালায়, কিন্তু এসব দিকে মন আছে ?"

"কৈ আর আছে বাবা ? তোরা যদি একটু মাঝে মাঝে বলিস…"

"রাগ করবেন না জ্যাঠাইমা। যদি বলিই তো শুনবে না। তার চেয়েও বিপদের কথা, যদি শোনেই—ভাগবত-রামায়ণ নিয়েই থাকে তো বোধ হয় বর খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে—যা আপনার যুগ পড়েছে…"

"তবে থাক, বলে কাজ নেই বাবা!"—চোখ বড় বড় করে শুনতে শুনতে হঠাৎ হাত তুলে এমন ভীতভাবে বলে উঠলেন যে, দোলু হাসি রুখতে পারল না। সামলে নিয়ে আবার গম্ভীর হয়েই বলল, "না, ঠিক সেভাবে বলছি না। পড়ুক, উচিত পড়া, তবে পড়বে কি ? আমি বলছিলাম যুগ কতটা এগিয়েছে সেই কথা।

আবার আপনার বাড়ির কথাই ধরি জ্যাঠাইমা। একটা সময় ছিল—খুব বেশি দিনের কথাও নয়, আপনারা নিজের জীবনেই দেখেছেন—ছেলেকে বিলেত পাঠালে সমস্ত বাড়িটাই একরকম একঘরে হয়ে থাকত, নয় কড়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে জাতে তোল ছেলেকে! সরিৎ দু বছর কাটিয়ে এল, একবারও ভাবতে হয়েছে সে কথা?"

"তা তো ওঠে নি কোন কথা বাবা। কী ভয় যে করছিল! মা মঙ্গলচণ্ডীই রক্ষে করেছেন।"

"তার মানে, কালের ধর্মে মা মঙ্গলচণ্ডীও বদলেছেন অনেকখানি।"—একটু হাসল দোলু। প্রশ্ন করল, "অস্বীকার করতে পারবেন?"

"ওঁদের কথা বাদ দে বাবা।"—এমন কাতরভাবে বললেন, এবারেও একটু না হেসে থাকতে পারল না দোলু। বলল, "সে না হয় দিলাম, কিন্তু কথাটা তো সত্যি, আর ওঁরা চানও সত্যি কথাটাই..."

"আচ্ছা চান, না-চান সে ভাবনা তোমার নেই।"—একটু রাগেরই ভান করলেন উনি, বললেন, "তুমি যা বলছিলে বল।"

দোলু চুপ করে গিয়ে একটু চোখ তুলে ভেবে নিল, তার পর আবার হেসেই বলল, "না জ্যাঠাইমা, দেখছি সত্যিই মা মঙ্গলচণ্ডী আপনার চটেছেন, কি বলতে যাচ্ছিলাম একেবারে দিলেন ভুলিয়ে।"

ওদিকটা এইভাবে ছেড়ে দিয়ে ওর নিজের যা নিয়ে কৌতূহল সেই কথাতেই এসে পড়ল, বলল, "থাক তা হলে ওসব বাজে কথা। পরাশর কাকা আপনাকে আর কিছু বলেছেন জ্যাঠাইমা?"

জ্যাঠাইমা হঠাৎ যেন নিঝুম মেরে গেলেন একটু, তার পর ব্যাথিত দৃষ্টি তুলেই বললেন, "হ্যাঁ বলেছেন। কী হবে বাবা দোলু!"

। চৌদ্দ ।

এবার যে নীরবতাটুকু এসে পড়ল সেটাকে হাল্কা, প্রগল্ভ করে তোলার কোন উপায়ই খুঁজে পেল না দোলু। অনেকখানি সময়ই মন্থর গতিতে গেল বেরিয়ে। এক সময় কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল, মুখ তুলতেই ওঁর চোখে জলের আভাস দেখে মৌনই রইল। তার পর আরও খানিকটা সময় একভাবে কেটে যাওয়ার

পর কণ্ঠস্বর একটু দৃঢ় করে নিয়েই বলে উঠল, "আপনি যা চাইবেন তাই হবে জ্যাঠাইমা, বলুন।"

"আমি কি চাই তাই যে বুঝে উঠতে পারছি না বাবা। শুধু এখন এইটুকুই পারছি বুঝতে, ওকে সেদেশে পাঠাতে রাজী হয়ে গোড়াতেই যে-ভুলটা করে বসেছি তার যেন আর চারা নেই দোলু।"

চোখের জল ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ল, আঁচল চেপে ধরলেন।

ওঁর চোখে জল বড় একটা দেখে না, মনটা হঠাৎ বড় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল দোলুর, মনে মনে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল ভালমন্দ যাই হোক, এ-সূত্র দেবেই ছিন্ন করে। ওঁর কথাগুলোয় একটা নূতন আলো দেখতে পেয়ে আবার নিজেকে সম্বৃত করে নিল।

মনে হয় পরাশরকাকা তা হলে দোলুর সঙ্গে যেরকম কথাবার্তা হয়েছিল সেই-ভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন এঁকেও, যাতে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা নূতন করে দেখেন উনি। আগেও একসময় দেখেছিলেন বৈকি, ছেলেকে যেদিন বিলেত পাঠাতে রাজী হন। সুতরাং হয়তো খুব বেগ পেতেও হয় নি পরাশরকাকাকে।

বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করল। নিজেও অনুরূপ যুক্তি তুলে ওঁর মনটা আরও প্রস্তুত করে রাখবারই চেষ্টা করল, যাতে ভবিষ্যৎ যা হাত তুলে দেয় সেটাকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করতে পারেন।

ওঁকে একটু শান্ত হয়ে নেওয়ার সময় দিল। চোখ মুছে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন জ্যাঠাইমা? ভুল তো নয়ই, বরং রাজী হয়ে সেদিন আপনি খুব একটা বিবেচনার কাজই করেছিলেন।"

"তার এই ফল? এরকম হবে জানলে…"

"আমি তো বলব জ্যাঠাইমা, ফলটা যে এইরকম দাঁড়াবে এটা জানতে পারাই ভাল হয়েছে। কারবারের ধারা বদলেছে, জ্যাঠামশাইয়ের বাইরে গিয়ে হাতে-কলমে সে ধারার সঙ্গে পরিচয় করবার অবসর নেই; সরিতের দরকার ছিল যাওয়া। কিন্তু ফল এমন হবে জানলে আপনি তো দিতেন না যেতে। দ্বিতীয় কথা, ফলটা খারাপই যে হয়ে গেছে এটা ধরে নিয়ে আপনি বৃথা মনকষ্ট পাচ্ছেন কেন?"

"বাকি কি আছে বাবা আর? ছেলেটার দিকে চাইতে পারা যায় না।"

"আমরা তো রয়েছি, পরাশর কাকাও রয়েছেন।...হ্যাঁ, তাঁর কথায় এসে মনে পড়ে গেল—হঠাৎ চলে গেলেন কেন উনি?"

একটা বড় প্রশ্ন চাপা পড়ে যাচ্ছিল, বেশ কৌতূহলের সঙ্গে মুখের পানে চেয়ে রইল দোলু।

যে প্রসঙ্গটা চলছিল তার মাঝখানে হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসে গেল। বরদাসুন্দরী এমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন, মনে হলো এ ধরনের প্রশ্নর জন্য যেন তোয়ের ছিলেন না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থেকেই বললেন, "গেলেন—কাজের মানুষ তো, ক্ষেতি হচ্ছিল। আমায় বললেন, দোলুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, বুদ্ধিমান ছেলে, সব ঠিক করে দেবে, তোমার কোন ভাবনা নেই।"

কোথায় যেন কী একটা থেকেই গেল। একটু চুপ করেই রইল দোলু, তার পর সমস্তটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটু হেসেই বলল, "মস্তবড় বুদ্ধিমান এক বের করেছেন আপনার চৌকোশ দেওর! যাক, মাঝখান থেকে আমার মস্তবড এক সার্টিফিকেট লাভ হলো, এ তো কম কথা নয়।.. যা বলছিলাম, যদি মনে করেন যেটা এসে পড়েছে সেটা খারাপই, তা হলে আমরা তো রয়েছি। এই গেল ওদিককার কথা। তার পরে যেটা হয়ে পড়ল সেটা যে খারাপই এরকম ধরে নিচ্ছেন কেন জ্যাঠাইমা?"

"নয় কিসে বাবা? বিলেত ঘুরে এল যে-মেয়ে..."

"ভালর দিকটাও ভাবা যায় না? গোড়ায় দেখছি, সদ্‌বংশের একটি শিক্ষিতা মেয়ে। বিলেত গিয়েছিল, এখন আমাদের বাড়ি আসবার একটা যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। ধরে নেওয়া যায়—ছুটো দিন থেকে বিলেতের একটা ছাপ পড়ে থাকতেই পারে তো, এটাই বা ধরে নোব না কেন যে, চিরদিনের জন্যে এ বাড়ির প্রভাবে এসে সে-ছাপ মিটে যাবে না? আপনার হাতে এসে..."

"আসতে চাইবে আমার হাতে বাবা দোলু?"

যুক্তি সব ওঁর পক্ষেই, এদিকে তো কৃত্রিমতার গুণ টেনে এগুনো; একটু চুপ করে থাকতে হলো দোলুকে। তার পর শেষ কথাটাই এনে ফেলতে হলো।

আরও একটু সময় লাগল, কেননা অনেকখানি কুণ্ঠা, অনেকখানি জড়তা কাটিয়ে উঠতে হলো ওকে।

একটু ভূমিকাও করতে হলো, বলল, "একটা কথা তা হলে জ্যাঠাইমা...

একটু বেহায়াপনা হবে আপনার এই ছেলের, কিন্তু না বলে তো উপায়ও দেখছি না।"

"বল্ না বাবা, তুই আর কত বেহায়াপনা করতে পারবি আমার সামনে? দরকারি কথা হলে বলতে হবে বৈকি।"

একটু ভাবল দোলু। তার পর গুরুগম্ভীর কথাটাকে যতটা সম্ভব তরল করে নিয়ে বলল, "একটা কথা চলে আসছে সেই মান্ধাতার আমল থেকে। আমি তো সাপ কি ব্যাঙ কিছুই বুঝতে পারি না—তবে চলে আসছে—এই ভালবাসা। শুনেছি কবিরা বলেন, সত্যি, কি, তাঁদের আর সব কবি-কল্পনার মতন ন্যাকামি তাও জানি না—তবে শুনেছি বলেন—এটা হলে নাকি মানুষকে সোনা করে দেয়। যদি তাই হয় জ্যাঠাইমা, তো একটু ধৈর্য ধরে দেখতে দোষ কি?"

"সেই 'যদি'র ভরসায় একটা কাজ করে ফেলা বাবা, তার পর চিরটা কাল..."

"সেই কথাতেই আসছি, সেই কথাই হয়েছে আমার লক্ষ্ণৌয়ের পরাশর কাকার সঙ্গে। কথা হচ্ছে, কাজটা তো আজই করে ফেলা হচ্ছে না। অর্থাৎ আজই তো বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে না। উনি যেমন আমায় পরামর্শ দিয়ে গেলেন (ওর নিজেরই প্ল্যানের ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য বলল দোলু), আমি সরিৎকে আপাতত আড়ালে রেখে নিজে খোঁজখবর নোব—কিভাবে, তারও আঁৎঘাঁৎ উনিই বাতলে গেছেন, বিচক্ষণ লোক তো—যদি বুঝি হ্যাঁ, মেয়ে খাঁটি, কি যে বলে, সরিতের ওপর টানও খাঁটি তো এগুতে দোষ কি?"

"তা...ঠাকুরপোও কতকটা সেইরকমই বলছিলেন। কিন্তু বাবা..."

"আর 'কিন্তু' কোথায় জ্যাঠাইমা? খাঁটি সোনা হয়, ঘরে তুলতে দোষ কি? হয়তো সে-মেয়ে আপনার মনসা-পুজোয় আলপনা দিতে বসবে না..."

"নিজের মেয়েই বড় দিচ্ছে!"

"তা হলেই বুঝুন। তা ছাড়া দেবেই না যে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি এই ঘরের মতনটি হয়ে উঠবে না, তাই বা জোর করে বলি কি করে? আপনার নিজের মেয়ে হচ্ছে না, সে তো পরের ঘরের স্বপ্ন দেখছে—এমন ঘর আর পাচ্ছেই বা কোথায় বাইরে? পরের মেয়ে যে আসবে তার তো এ-ই ঘর, সে তো দেখবে..."

হঠাৎ চোখ দুটি আবার ছলছল করে উঠল ওঁর। পাশেই রয়েছে, পিঠে হাতটা চেপে বললেন, "তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা, তাই যেন হয়।"

একটু থেমে গিয়ে বললেন, "শুধু নিজের কথাই ভাবব কেন দোলু? মা মঙ্গলচণ্ডী করুন—যে ঘরেই যাক, অবিশ্যি ভাল ঘরেই—সেই ঘরের মতনটি হয়ে উঠুক ও মেয়ে বাবা—আহা, কত আশা করে বাপ-মা পাঠিয়েছিল বিদেশে—ভাল হয়ে আসবার জন্যেই তো বাবা।"

॥ পনেরো ॥

পরদিনের কথা। সন্ধ্যা নামতে কিছু বাকি আছে।

দোলু স্যুট পরে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধতে বাঁধতে নানাপ্রকারে নিজের মুখটাকে বিকৃত করে যাচ্ছে—জিভ বের করে, চোখ কুঁচকে, নাক সিঁটকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে; মুখটা কখনও কখনও বাঁয়ে ঘুরিয়ে, কখনও বা ডাইনে। সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ করে একটা কমিক গানের কলি।

পার্টিতে যাবে। পরাশরকাকা নেই, কাল জ্যাঠাইমার সঙ্গে কথাবার্তাও যা হলো, খুব সাফল্যপূর্ণ ই, যেমনটি এঁচে রেখেছিল; মনটা খুবই প্রফুল্ল। সেই জন্য রগ ঘেঁষে চুল ছাঁটিয়ে, গোঁফজোড়াকে অতি আধুনিক রূপ দিয়ে নিজের যে একটা নূতন রূপ বেরিয়েছে তার প্রতিচ্ছায়াটাকে যতটা পারছে মূক বিদ্রূপে জর্জরিত করে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে সমস্ত লঘুতা এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে দৃষ্টি স্থির হয়ে উঠল, ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল, টাই-বাঁধার হাত গেল থেমে। নিশ্চল হয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে রইল চেয়ে। সারা দেহটা ঝিম্ ঝিম্ করে আসছে।

জ্যাঠাইমার সঙ্গেই কালকের কথাবার্তা, তার সঙ্গে ওর প্রতি জ্যাঠাইমার ব্যবহারে যে একটা অভিনবত্ব ছিল। কাল আলোচনার নৌকাটা চড়া ঘূর্ণি বাঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকেই মন ছিল, খেয়াল হয় নি, আজ হঠাৎ সব যেন নূতন অর্থ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করেই।

জ্যাঠাইমা অত্যন্ত স্নেহময়ী, তায় সেকেলে মানুষ, তাঁর স্নেহের মধ্যে একটা যেমন সরল আন্তরিকতা আছে, তেমনি তার প্রকাশের মধ্যেও রয়েছে একটা বৈশিষ্ট্য। প্রণাম করলে মুখে হাত বুলিয়ে নিজের আঙুল ক'টায় চুম্বন দেওয়া; কিছু খেতে দেওয়া হলো তো গায়ে হাত বুলিয়ে আহারে প্রবৃত্ত করা; কোন

একটা কুশল প্রশ্ন করলেও গায়ে হাত বুলিয়ে উত্তর চাওয়া—সব কিছুতেই সে-যুগের অন্তরঙ্গতার ছাপ।

অভ্যস্ত দোলু; অভ্যস্ত বলেই অতটা খেয়াল হয় নি যে কালকের আদর-আপ্যায়নে যেন অন্যদিনের তুলনায় একটু মাত্রাধিক্য ছিল। পিঠে হাতটা যে একরকম বরাবরই ছিল সেটা নিশ্চয় পাশে বসে থাকবার জন্যই, তবে কথা বলবার সময় কয়েকবারই নিজের পঞ্জরে চেপে চেপে ধরলেন। নিতান্তই যখন ছেলেমানুষ, সলিলের মত, তখন এটা করতেন, এদিকে এসে বড় হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই আর ছিল না, আজ বহুদিন পরে আবার এসে পড়েছে। হয়তো পাশে থাকার জন্যই সেই পুরাতন অভ্যাস, কিন্তু ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই পাশটিতে ডেকেও নিলেন উনি; পড়ন্ত রোদ একটা অজুহাত মাত্র।

সমস্তটুকু ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জাঁকিয়ে আসতে লাগল আচম্বিতে, জ্যাঠাইমার কালকের শেষ কথাটা মনে পড়ে গিয়ে। হঠাৎ ওকথা বলতে গেলেন কেন যে, কেতকী যে ঘরেই যাক যেন সেই ঘরের মতটিই হয়ে ওঠে, যখন তার ওঁর নিজের ঘরে আসারই কথা হচ্ছে!

একটা কুটিল সন্দেহ আস্তে আস্তে ফণা বিস্তার করে তুলতে লাগল দোলুর মনের মাঝখানে। কথাটা বেরিয়েছিল আগে সরিতের মুখ দিয়ে, তবে লক্ষণ মিলিয়ে সত্য বলেই বিশ্বাস হয়েছে দোলুর, আছেও এখনও সে বিশ্বাসটা। দোলুকে মিস্ আইচের দিকে ভিড়িয়ে দেওয়ার, ভিড়ে যেতে উৎসাহিত করবার মধ্যে পরাশর কাকার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব, দোলু যদি ওদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তো বিপদটা বাইরে বাইরেই কেটে যাওয়ার একটা মস্ত বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরাশর কাকার সঙ্গে জ্যাঠাইমার পরামর্শ হয়েছে। ধূর্ত লোক, এই বিষই যে ঢেলে দিয়ে যান নি জ্যাঠাইমার মনে, কী নিশ্চয়তা আছে তার?

জ্যাঠাইমাকে আশৈশব দেখে আসছে, জানে কত উঁচু মন ওঁর। জানে বলে মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করছে দোলু, কিন্তু অসম্ভব কেন হবে? একটা ভীষণ চোট খেয়েছেন। ছেলে নিয়ে মায়ের মন এমনই দুর্বল, তায় ওঁর মত মা। পরাশর কাকা পথ দেখিয়ে সরে গেলেন, এই পথেই যদি থাকে ছেলের মঙ্গল তো উনি চাইবেন বৈকি।

এই স্বার্থচিন্তাটুকু বাদ দিলে জ্যাঠইমা আবার সেই জ্যাঠাইমা। একটা

অনুতাপও নিশ্চয় আছে তাঁর মনের কোণে কোথাও। তাই ঐ শুভেচ্ছা, সেটা ঘুরিয়ে দোলুকেই আশীর্বাদ—কেতকী যে ঘরেই যাক যেন সেই ঘরের অনুরূপই হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দোলুর ঘরের।

যতই ভাবছে, সন্দেহটা পুষ্ট হয়ে আসছে। যত যুক্তি গিয়ে জড়ো হচ্ছে ঐদিকে। কালকের সকালে সরিতের কথা—যেটাকে দোলুর প্রতি ওর অবিশ্বাস মনে হয়ে অতখানি গোলযোগ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত দোলুর নিজের ভ্রান্তি বলেই মনে হলো, সেটাও আবার পূর্বের রূপ নিয়ে মনটাকে বিদ্বিষ্ট করে দিচ্ছে। না, সরিৎও তাকে করে অবিশ্বাস। হ্যাঁ, করেই তো। ঈর্ষা যে ভালোবাসার অনুষঙ্গী একথা তো আজকের নয়, সৃষ্টির আদি থেকে প্রমাণিত হয়ে আসছে। সে ঈর্ষা বন্ধুকেও রেহাই দেয় না।

পরাশরকাকা, জ্যাঠাইমা, দোলু—পরাশরকাকারই শেষ পর্যন্ত জয়জয়কার। তা হলে থাক, আর কেন এ বিড়ম্বনার মধ্যে ?···অনেকক্ষণ টাইট দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল দোলু, তার পর আস্তে আস্তে খুলতে লাগল গ্রন্থি। আক্রোশ, কি অভিমান ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে এটা ঠিক যে সরিৎ-কেতকী নিয়ে সরিতের জীবনের এ-অংশটা নিজের থেকে বাদ দিয়ে দিল আজ থেকে। যাবে না পার্টিতে।

টাই খুলতেই যা দেরি হলো, তার পর ঝট্‌পট্ করে সব খুলে ফেলে আণ্ডার-ওয়্যারের ওপর কাপড়টা জড়িয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। টাই, জামা, প্যাণ্ট মোজা সব সামনের বিছানার ওপর ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। চেয়ে আছে দোলু, এক ধরনের উপভোগই করছে বলা চলে।

তাই বা কেন ? যেমন উপকারের দিকে যাবে না তেমনি অপকারের দিকে যাওয়ারই বা দরকার কি ? উঠল। সরিৎকে ফোন করে দেবে—অসহ্য মাথা-ব্যথা ঘণ্টাখানেক থেকে, ও আর যেতে পারল না, সরিতের যাওয়া দরকার, ভাবগতিক লক্ষ্য করার এমন একটা সুযোগ বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। আপাততঃ এই বলে কোন সন্দেহ উদ্রেক না করে সরে দাঁড়ানো, তার পর কোন-না-কোন ছুতো করে একেবারেই কেটে পড়বে। ও নিজের অদৃষ্ট নিয়ে নিজেই পরীক্ষা করুক।

ফোন ধরল শীলা। বলল, সরিৎ সলিলকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেছে, ফিরতে দেরি হবে, কিম্বা নাও ফিরতে পারে আজ। একেবারেই না ফিরতে পারে ভেবে মা সলিলকে সঙ্গে দিয়েছেন। দোলু বিস্ময় প্রকাশ করতে বলল, ওর

নিজের বিশ্বাসের কথা বলছে, যেমন দেখছে। এমনি তো মনে হয় ইংরাজী সিনেমা দেখতেও গিয়ে থাকতে পারে, যেমন যাচ্ছে আজকাল মাঝে মাঝে।

ওর সেই ফষ্টিনষ্টি। আজ যেমন মনের অবস্থা, বেশ একটা ধমকই দিতে যাচ্ছিল দোলু, নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্তস্বরে বলল, যখনই আসুক, এলে যেন বলে দেয়, যেখানে ওর যাওয়ার কথা ছিল, ভয়ানক মাথাধরায় যেতে পারল না দোলু। আজ ফোন করতেও যেন মানা করে দেয়, একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে।

রিসিভারটা হ্যাণ্ডারে চেপে দিয়ে চাকরটাকেও ডেকে বলে দিল, কোনও ফোন এলে যেন না ধরে, তার পর আবার সোফায় গা এলিয়ে পড়ে রইল।

কেমন একট অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, সরিৎ গেলেও যাহোক একটা কিছু হত। একটা ব্যবস্থা করল, সে নিশ্চিন্ত, অথচ একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিছুই করল না দোলু, নিজের বিবেকের সঙ্গে যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে অনেকক্ষণ কিসব ভাবল এলোমেলো, তার পর উঠে মাখনের বাড়ির নম্বর ধরে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে উত্তর হলো, মাখন বাড়ি নেই। একটা নম্বর দিয়ে গেছে, সেই নম্বরেই ফোন করে পাওয়া যাবে রাত ন'টা পর্যন্ত।

আবার নূতন নম্বরে ডায়াল করতে একজন বেয়ারা-গোছের কেউ ধরল। ডেকে দিল মাখনকে। কথাবার্তা হলো—

"হ্যালো, মাখন? আমি দোলু।

"তুই তো কার্ড পেয়েছিস; আসবি নি?"

উত্তর দিতে সেকেণ্ড দু-চার দেরি হলো দোলুর, তার পর বলল, "কার্ড পেয়েছি কে বললে তোকে?"

"ওই বলছিল, মিস্ আইচ। কাল খুব ইম্‌প্রেস (impress) করে গেছিস।"

"তাই নাকি!" অনুৎসুক কণ্ঠে বলল দোলু, প্রশ্ন করল, "কিছু বলছিল?"

"ফ্লোর‍্যাল ডেকোরেশনে হাইলি প্লীজড (highly pleased)। বলছিল, কিন্তু তাঁকে তো আর দেখলাম না একবারও। আজ বিকেলের কথা। তখনই শুনলাম কার্ড দিয়েছে। বললে একটু কাজও আছে তোর সঙ্গে। পার্টিতে আসবিই, ও ব্যস্ত থাকবে, এলেই ওকে আমি যেন জানিয়ে দিই। আসছিস তো?"

বেশ ভেবে নিয়ে এসে ফোন ধরেনি, এবার উত্তর দিতে আরও একটু দেরি হলো। মাখন তাগাদা দিল, "হ্যালো—দোলু?"

দোলু ছড়ানো টাই-স্যুটের দিকে চেয়ে ছিল, বলল, "উপায় নেই ভাই, সব পরে শুনবি। আমি 'আর-এস-ভি-পি'তে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুই দিয়ে দিবি। এই এক কথা। তার পর আরও একটা আছে, যার জন্যে বিশেষ করে ফোন করা তোকে।"

"কথাটা কি?"

"কথাটা হচ্ছে, কার্ডের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসছি না বটে, তবে পার্টিতে উপস্থিত থাকতে হবে আমায়। কেন, সেসব জিজ্ঞেস করবি না আপাতত, পরে নিজে হতেই সব বলব।"

"'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতন শোনাচ্ছে যেন?"

"কতকটা তাই।"

"মাছটা কে? থাক, যখন খুলতেই চাস না আপাতত। কিন্তু ফল হচ্ছে, সেটা সম্ভব কি করে? তুই না বললেও মিস্ আইচ যেন এর মধ্যে কিছুটা রয়েছেই মনে হচ্ছে। কালই যে লোককে দেখেছে, অত কাছাকাছি, অত কথা হয়েছে..."

"সেই পরামর্শই করতে চাই তোর সঙ্গে। কাল সে ছিল কন্টিনেণ্টাল ফ্লোরিস্ট; লণ্ডন, প্যারিস, জেনেভায় ভারতীয় ফুল, ভারতীয় ফুলের নানান রকম গয়না যোগাচ্ছে। আজ আসবে জুবিলী ডেকোরেটরের কর্মচারী, সব ঠিক আছে কিনা দেখেশুনে বেড়াচ্ছে নিজের মনে। তুই গোলাম সাদিককে ডেকে মাঝে মাঝে এক-আধটা ডিরেক্শনও দিচ্ছিস—অমুক জায়গাটা দেখে আসতে, অমুক জায়গাটা ঠিক করে দিতে।...রাজী?"

"একটু ভাবিয়ে তুলছিস; তোর নকুলেপনা যায় নি এখনও দেখছি। জানি না কি উদ্দেশ্য, তবে..."

একটু বিরতি। দোলু এগিয়ে দিল, "তবে?"

"আমার আন্দাজই, তুই তো আর কিছু বলছিস না ভেঙে। তবে, আগুন নিয়ে খেলায় না মাতিস।"

এবার একটু বেশি বিরতি। মাখন বোধ হয় ভাবছে, আরও খানিকটা বেরিয়ে আসবে এবার। দোলু, কতটুকু আর না বের করলেই নয় সেই কথা ভাবছিল, মাখনের মুখে 'আগুন' কথাটা ওর মনে একটা নূতন চিন্তার প্রবাহ বহিয়েছে। চুপ করেই রইল একটু, তার পর বলল, "একটা পতঙ্গ—আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে পাখা চুলকুচ্ছে তার—দেখি যদি বাঁচানো যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-স্বর-সুর সবই বদলে ফেলে বলল, "তা হলে গোলাম সাদিকের আর্জিটুকু খেয়াল রাখবেন হুজুর। খোদাতাল্লা আপনার খয়ের মঞ্জুর করবেন।"

একটু হাসির সঙ্গে ওদিক থেকে ভেসে এল, "হতভাগা!"

॥ ষোল ॥

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় সরিতের ঘরের বাইরের দিকের দরজায় খট্‌খট্‌ করে বারকয়েক দ্রুত ধাক্কা পড়ল। সরিৎ প্রশ্ন করল—"কে?"

উত্তর হলো—"আমি দোলু, দরজা খোল্‌।"

চটি টানতে টানতে এসে দরজার পাল্লা দুটো খুলেই এক পা পেছিয়ে গেল সরিৎ। "কে? গেট্‌ আউট!!"—বলে আতঙ্কের চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, শেষ করবার আগেই দোলু চাপা গলায় "হয়েছে"—বলে থামিয়ে দিল। মাথার জালিদার সাদা মুসলমানী টুপিটা নামিয়ে, চিবুক থেকে তিনকোণা দাড়ির "নূর"-টা খসিয়ে নিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, বলল—"বন্ধ করে দে দরজাটা।" পরে ভেতরের দিকের দরজাটা খোলা দেখে নিজে বন্ধ করে এসে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে বলল—"সিগারেটগুলো সব বিদেয় করে দিয়েছিস তো?"

'নূর'টা টুপির মধ্যে রেখে সেটা পাশের টিপয়ের ওপর রেখে দিল।

সরিৎ একটা র‍্যাকের ওপর থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই এনে টুপিটার পাশে রেখে দিল, সামনে একটা চেয়ারে বসে প্রশ্ন করল—"কী কাণ্ড!"

ধাঁধায় পড়ে গেছে, এইটুকুই যেন কোনরকমে বের করতে পারল মুখ দিয়ে। দোলুর পরনেও একটা রঙীন চেক লুঙ্গি, গায়ে রঙীন ফ্লানেলের কুর্তা, গলায় নীল রঙের রুমালটা বাঁধাই রয়েছে তখনও।

দোলু ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—"মাখনাদের জুবিলী ডেকোরেটারের ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি গোলাম সাদিক। ...খাওয়া হয়েছে তোর?"

"এই খেয়ে এলাম"—এখনও কিছু যেন আন্দাজ করতে পারছে না সরিৎ। প্রশ্ন করল—"তুই কিছু খাবি?"

"না, সে পার্ট ভালোরকমই চুকিয়ে এসেছি। অনেক কথা, রাত হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে তো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"সেখান থেকে সোজা চলে এসেছিস ?"

"বাড়িতে ঢুকতে দিত ?"

"এ বিড়ম্বনাই বা কেন ? তুই তো বেশ ফ্লোরিস্ট হয়ে ঢুকেছিলি—ওরিয়েণ্টাল না, কি বললি যেন ?"

"কন্টিনেণ্টাল্।"

"বেশ তো ছিল, কার্ডও পেয়েছিলি।"

"দেখলাম দূতালি করব কি, দূতের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে অর্ধেক। আজ মাখনও বললে—নাকি খুব ইম্প্রেস্ করে দিয়েছি কালকে। গোলাম সাদিক তো সেটা পারবে না।"

চেয়ে রইল সরিতের দিকে। সরিৎ প্রথমে মুখটা নীচু করেই নিল, পরে বার দুই আড়ে চাইল চোখ তুলে, তার পর তৃতীয়বার চোখ তুলতে গিয়ে হেসেই ফেলল, বলল—"রাস্কেল !"

"শোন সরিৎ"—কথার মোড় হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল দোলু, বলল—"মিস্ আইচ দুরাশা, আর এক পা না এগুনোই মঙ্গল।"

হাসির মুখেই হঠাৎ চোট্‌টা খেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সরিৎ, তার পর দৃষ্টির কৌতূহল চেপে ঔদাসীন্য ফোটাবার চেষ্টা করে, সোজাসুজি কেতকীর কথা না তুলে প্রশ্ন করল—"হলো কেমন পার্টিটা ?"

দোলু বলল—"বেশ বড় পার্টি। তেমনি ব্যবস্থাও; লাইট, ফারনিশিং, ডেকোরেশন, সার্ভিস, মিউজিক—কোনদিক দিয়েই এতটুকু খুঁত নেই; কিন্তু কাশির চোটে কান পাতে কার সাধ্যি !"

"কাশি !"—বিস্মিত প্রশ্ন করল সরিৎ।

"পার্টি নিখুঁত। সমস্ত পার্টির প্রাণকেন্দ্র—মধুকেন্দ্রই বলি—মিস আইচ একেবারে অনবদ্য—শী ওয়াজ অ্যাট্ হার বেস্ট (She was at her best), মেক-আপ-এ, স্টাইলে তো বটেই, তা ভিন্ন হোস্টেসের (Hostess) কর্তব্য-সাধনেও। ঘুরেফিরে, মিলেমিশে, প্রশ্নে-হাসিতে সবাইকে আপ্যায়িত করে ও যেন সমস্ত পার্টিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সবই ঠিক, কিন্তু অন্তত পঁচিশজন গেস্ট্‌কে—প্রায় সবাই তোর আমার বয়সের—কাশিতে আধমরা করে দিচ্ছে, সে এক বিট্‌কেল কাণ্ড !"

—ওর দৃষ্টির প্রশ্নের উত্তরে টীকা করল—“তোর মতন সিগার ধরিয়েছে, এখনও রপ্ত হয় নি বেচারাদের। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তুই যদি যেতিসই—মানে, আর একটা কেশো খদ্দের যদি বাড়তই তো এমন কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কথা হচ্ছে, পারবি কি এই ঝামেলার মধ্যে দাঁড়াতে?”

“গেলাম না তো।”—সোজা বুঝেই উত্তরটা দিল সরিৎ; মাথাটা এমন গুলিয়ে গেছে, যেন বেশ পরিষ্কার ক’রে ধরতে পারছে না কথাগুলো।

দোলু বলল—“সেকথা হচ্ছে না। বলছি—এতগুলোকে যে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে—ওর মনোরঞ্জন করবার জন্যেই তো এই নিগ্রহ…”

“এই ব্র্যাণ্ড্, যেটা ওর সবচেয়ে পছন্দ সেটাই সে ওদেরও রেকমেণ্ড করেছে তা জানলি কি করে?”

“ও, তাও তো বটে!”—ওর যেন একটু রুখে উঠেই প্রশ্নটা করার ভঙ্গিতে একটু ওর দিকে চেয়ে রইল দোলু, তার পর একটু চিবিয়ে চিবিয়েই বলল—“তা যদি মনে করিস, তোকে সবচেয়ে নিজের পেয়ারের ব্র্যাণ্ড্‌টি ধরিয়েছে, তোকেই সবচেয়ে নিজের মনের গোপন কথাটি বলেছে, তুই ধ্যান তুই জ্ঞান হয়ে বসেছিস ওর মনের মাঝখানটিতে তো ছ্যাখ চেষ্টা ক’রে। একটা পার্টিতে যাস নি বলে তো নাম কাটা গেল না।”

“অমনি রেগে গেলি!”—একটু নরম হয়েই বলল সরিৎ।

“শোন তবে, যদি নেহাত না বলিয়ে ছাড়বি নি। ভেবেছিলাম একটু মোলায়েম করেই বলি না হয়, যাই হোক, ক’টা দিন একসঙ্গে কাটাল তো। তা ঐ যে বলেছি একটু তারিফ ক’রে—আবার জিভে জল এসে গেছে তোর! …এক নম্বরের ফ্লার্ট! (Flirt)। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি সেজে যে গেছি, সে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই! কোথায় কি খুঁত হলো, কোন সন্দেহ না জাগিয়ে ঘুরে-ফিরে তদারক করে বেড়াতে পারব। কয়েকটা পয়েণ্টে ইচ্ছে করেই একটু করেও দিয়েছিলাম এদিক ওদিক। সেইগুলো অ্যাটেণ্ড্ করে, অন্য কোথাও কিছু আছে কিনা তদারক ক’রে বেড়াবার সুবিধেও ছিল। তার ওপর একটু ঝুঁকি নিয়ে, মিস্ আইচ যেখানেই একটু জমে বসেছে তারই কাছাকাছি গিয়ে, এটা টিপে, ওটা কষে দিয়ে ডিউটি সেরে বেড়াতে লাগলাম।—কান সম্পূর্ণ ওদিকে, নজরও মাঝে মাঝে; অবশ্য সোজাসুজি নয়।…এক নম্বর ফ্লার্ট! যে টেবিলেই গিয়ে বসুক—কোথাও দুজন, কোথাও তিনজন—এমন কায়দার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকেরই মনে হতে হবে নেকনজরটা তারই

ওপর সবচেয়ে বেশি। দেখে যাচ্ছি, কখনও কাছ থেকে, কখনও বা খানিকটা দূর থেকেও। অবশ্য খালি ওদের নিয়েই যে আছে তাও নয়, আরও সবার খোঁজ নিচ্ছে, বসছে, গল্পগুজব করছে, তারই মধ্যে এদের কারুর টেবিল হয়েও বোধ হয় ঘুরে গেল। দেখে যাচ্ছি। এদিকে কাশির আওয়াজ চাপা দিতে গিয়ে মুখগুলো হয়ে উঠেছে রাঙা; কে একটা দরের কথা বলে, কি আঙুলে সিগারেট চেপে—ডি. এল. রায়ের ভাষায় বলতে গেলে—বিলাতী ধরনে হেসে, কি ফরাসী ধরনে কেশে একটু ইম্প্রেস্ করবে তাই নিয়ে রেষারেষি পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার রকমারি আছে, জিল্টিং (Jilting)। একবার জন-চারেকের একটা বড় টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শরীর দুলিয়ে এ-টেবিল ও-টেবিল করতে করতে। চেয়ার নেই, সবাই নিজেরটা অফার (offer) করে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি তক্কেতক্কে ছিলাম, তাড়াতাড়ি একটা অন্য টেবিল থেকে এনে দিতে বসে পড়ল। তার পর হাসিতে কাশিতে গল্প বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ উঠে পড়ল—"ও, মিস্টার পাকডাশি! একটা বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে। আই ক্লীন ফরগট! (I clean forgot) একবার উঠবেন কি দয়া করে? তু মিনিট।"

পাকড়াশি লোকটা বেঁটে, মোটা, ক্লামজি (clumsy), সিগারেট ভালো করে ধরতে শেখেনি, ফোল্ডিং চেয়ার ঠেলে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে প্রায় পিপের মতন গড়িয়ে পড়েছিল—তাকে সঙ্গে করে শরীরে-শাড়িতে ঢেউ তুলে একটা প্যারিসিয়ান সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে…"

"উফ্!"—করে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শরীরটা এলিয়ে দিল সরিৎ।

এতই আচমকা, অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে চাইল দোলু, প্রশ্ন করল, "কি হলো!"

"নাঃ—বল্—একটা চান্স্!"

একটু বিমূঢ়ভাবে চেয়েই রইল দোলু, ছাড়াছাড়া কথার মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যটুকু বের করে নিতে যা দেরি হলো, তার পর মুখটা আগের চেয়েও বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল, বলল—"চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আমি কোথায় ভাবছি, একটু হুঁশ হলো, দেখুক কিরকম খেলোয়াড় মেয়ে, অযথা ছোঁড়াগুলোর মধ্যে রেষারেষি জাগিয়ে কিরকম তামাশা দেখছে;—ও ভেবে সারা ওর চান্স্ গেল—যখন সেই কদাকার তেলের কুপোকে অতটা নাই দিচ্ছে, তখন ও থাকলে নিশ্চয়…"

"কখনও ভালোবেসেছিস্ দোলু?"—করুণ দৃষ্টি তুলে ওর মুখের দিকে চাইল সরিৎ।

"না, বাসি নি,"—সেইভাবেই উত্তর করল দোলু, মনটা মোটেই ভেজে নি। বলল—"তবে যদি বলিস তো ভালোবাসা কাকে বলে একবার ভালো করে দেখিয়ে দিই। ও-স্মার্ট আমায় দেখাবে কি!"

কথাটা বলে দাঁতে দাঁত চেপে ডানহাতের ঘুষিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—"অ্যায়সা এক ভালোবাসার প্যাঁচ কষে দোব যে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে বাছাধনকে—কতকগুলো গোবেচারাদের কালেজা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বের করে দোব। বলি নি এতক্ষণ, আমায়ও ঠুকরে দেখতে ছেড়েছে নাকি? বলে একটা বড় শো'র কনট্রাক্ট্ পেলে বলবেন, আপনার সঙ্গে ফ্লাই করে ঘুরে আসব—প্যারিস, জেনেভা, যেখানে হয়। এবার গোলাম সাদিক সেজে তবে গিয়ে অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছি।"

এমন একটা নূতন কথাতেও কোন দাগই বসল না সরিতের মনে; উদাস দৃষ্টি যেন হারানো চান্সের দিকে চেয়েই রইল। খানিকক্ষণ আর কোন কথাই হলো না। এক সময় ওর একটা কাপড় চেয়ে নিয়ে লুঙ্গিটা ছেড়ে বাইরের দিকের দরজা দিয়েই নেমে বাড়ি চলে গেল দোলু।

॥ সতের ॥

বাড়ি এসে বিরক্তির ভাবটা কেটে গিয়ে মনটা আস্তে আস্তে অন্যভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। একদিকে বন্ধুর ঐ অবস্থা, অন্যদিকে অন্তঃসারশূন্য এক অতি-আধুনিকার প্রণয়-অভিনয়। দুশ্চিন্তার সঙ্গে খানিকটা অনুশোচনাও এসে পড়ে। মনের বিরক্তিতে খানিকটা শুনিয়েই এল, কিন্তু সেটা তো প্রতিষেধকের কাজ করবে না। শেষে দোলুর নিজের কথাটা শুনেও যেভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সরিৎ, এতটুকু সাড় হলো না, তাতে অন্তত এটা বোঝা যায় যে ওর নিজের অনুভূতিটা কত গভীর। কাছ থেকে সরে এসে ওর ঐ আতুর ভাবটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল তার করুণ আবেদন নিয়ে। মনটা টন্‌টন্ করতে লাগল দোলুর।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে একটা রাস্তা

বের করে খানিকটা স্বস্তি এল মনে। আর একটা চান্স্ দেখবে দোলু। যতই হোক, দোলুর কথাগুলো পরোক্ষ; এতে যখন মনের দুর্গে কোন ফাটল ধরাতে পারল না তখন একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়ে দেখা দরকার। চাই কি, এই যে কানভাঙানিটুকু দেওয়া রইল এটাও সেদিন কাজ দিতে পারে।

কথাটা একবার তোলাও আছে সরিতের কাছে, কেতকী সম্বন্ধে ওদের ক্রমিক প্রোগ্রাম নিয়ে উঠেছিল একদিন; কিসের পর কি করতে হবে।

ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে গেল। উঠেই আগে ফোন করল সরিৎকে। চাকরটা ধরল, জানাল ঘুমুচ্ছে এখনও।

মনটা আরও নরমই হয়ে গেল দোলুর। আহা, ওরও তা হলে এই অবস্থাই গেছে! হবেই তো, নিশ্চয় আরও নিদারুণ; দোলু তো মাত্র দর্শক, সমালোচক, ও-বেচারা তো ভুক্তভোগীই; একটা মর্মন্তুদ বিষাদনাট্যের ভাগ্যনিপীড়িত নায়ক।

মুখ হাত ধুয়ে, চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক পরে আবার করল ফোন। সবে উঠেছে, একটু জড়িতকণ্ঠেই প্রশ্ন করল সরিৎ—"কে?"

"আমি দোলু। একবার আসতে পারবি? একটা দরকারী কথা আছে।"

উত্তর আসতে দেরি হওয়ায় প্রশ্ন করল—"কিরে, সেদিনকার প্রতিজ্ঞা নাকি?"

"বাজে কথা রাখ, সক্কালবেলা আরম্ভ করল আবার!"—একটু ধমক দিয়ে বলল সরিৎ, তার পর আবার আরম্ভ করে অসম্পূর্ণ ই ছেড়ে দিল—"তবে…"

"তবে?"—প্রশ্ন করল দোলু।

"ঐসব নিয়ে কোন কথা নয় তো? মানে, খামোকা আর তোকে এ নিয়ে…"

"কষ্ট দিতে চাই না—এই তো? তা হলে এর উত্তরে বলতে হয়, এ ধর্মবুদ্ধিটুকু গোড়াতেই আসা উচিত ছিল।" গম্ভীরভাবে উত্তর করল দোলু। দু-চার সেকেণ্ড থেমে জুড়ে দিল—"বেশি বলতে চাই না, কাল আমারও সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। আর কিছু নয়, রাতজাগাটা সয় না আমার, তাই…"

"আরম্ভ করল, সক্কালবেলা!"—ওর রাগের টোনটা চড়ায় উঠছে দেখে আবার বলে উঠল সরিৎ। একটু সময় গেলই আবার, তার পর কতকটা *সুর নামিয়ে দোলু বলল, "কথাটা শোন তা হলে, সমস্ত রাত ভেবে যা ঠিক*

করলাম, তার পর আসিস না আসিস তোর ইচ্ছে। আমি আর একটা চান্স নিতে চাই ; এবার এদিক থেকে।"

"বুঝলাম না।"

"বুঝেছিস। একবার কথা হয়ে গিয়েছিল আমাদের এ নিয়ে। এবার এদিক থেকে একটা পার্টি।"

"সবাই কেতকী আইচের বাবা-মা নয়—ছেলে তো বিলেত থেকে ফিরে এসে মস্ত এক উপকার করেছে!"—অভিমানটা চাপবার চেষ্টা করেও খানিকটা এলই বেরিয়ে।

দোলু বলল—"সে দায়িত্ব তো তোর নয়। আপাতত এইটুকুই বলতে পারি যে ও-পার্টির চেয়ে যাঁহাতক হয় এগিয়েই ব্যবস্থা করব। আর, এও বলে দিচ্ছি, যদি মনে করিস সরিতের বাবা-মা কোনরকমে হেলাফেলা করে দায় সারছেন তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সরে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে তোর। আমি কথা দিচ্ছি।…শোন সরিৎ, আমি অনেকটা আমার দিক থেকেই ভাবছি। হতে পারে নাকি যে আমি হয়তো বায়াস্‌ড্ (Biased) মন নিয়েই গিয়েছিলাম, গোড়া থেকেই খারাপ দিকটা ধরে নিয়ে। তা হলে ভেবে ছাখ, ও-বেচারির প্রতি একটা অন্যায়ও তো করা হয়েছে। সে হিসাবে একটা অনেস্ট চান্স্ (Honest chance) প্রাপ্যও নয় কি ওর? না দিলে অবিচার করা হবে নাকি ওর ওপর?'

"বলছিলাম—আবার কেন—মিছিমিছি…" নিমরাজির স্বরে টেনে টেনে বলল সরিৎ।

"তুই চলে আয় বলছি বাজে কথা না বাড়িয়ে"—এবার টোনটা হুকুমেরই দোলুর। বলল—"পার্টি আগেও হয়েছে, এমন কিছু নতুন কথা নয়, কিন্তু ঝুঁকিটা এবার তো জ্যাঠামশাইকে নিতে দিচ্ছি না, আমাদের নিজেদের ওপর। আমাদের মানে অবশ্য আমার, তুই তো নেপথ্যেই থাকবি। তা হলে আর দেরি করা তো চলে না, প্ল্যান সব ঠিকঠাক করতে হবে, একেবারে রেডি করে কর্তার সামনে ধরব ভাবছি। আসছিস তো?"

"যখন ঢুকেছে একটা কথা তোর মাথায়! কিন্তু তাদের নকল করছি মনে হবে না?"

"খুঁতখুঁতুনি ছাড় বলছি সরিৎ!"—বাধা পেয়ে চটে উঠল দোলু, বলল—"পঞ্চায় কাকা মরল, লোকে বলবে ধনঞ্জয়ের পিসির নকল করেছে? জালাস নি

বলছি! ওদের পার্টি কাদের নিয়ে, আমাদের পার্টি কাদের নিয়ে! তবু, দু-চারজন যারা দুদিকেই কমন্ (common) থাকবে তাদের কাছে—কি যে বলে, বেশ ইয়ে মনে হবে না? আইচের মেয়ে এল বিলেত থেকে, পার্টি। রায়ের ছেলে এল বিলেত থেকে; পার্টি। কেন রে বাপু! আবার এসেছেও দুজনে একসঙ্গে।"

"ইয়ারকি রাখ। ঘণ্টাখানেক দেরি হবে কিন্তু; এই উঠলাম বিছানা থেকে।"

"চলে আয়। চা-টা এখানেই খাবি। আমার মাথায় প্ল্যান গজগজ করছে, খাতা পেন্সিল নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না।"

বাইরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছে, ফোন ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। রিসিভারটা তুলে কানে দিতে ডাকল দোলু —"হ্যাল্লো!"

"আমি সরিৎ রে।"—একটু চাপা গলায় উত্তর দিল সরিৎ। "বাবা ডেকে-ছিলেন—জিজ্ঞেস করলেন, 'কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তোমার? দোলুর সঙ্গে?' 'হ্যাঁ' বলতে বললেন—'তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার, যদি ফ্রী থাকে যত শীগ্‌গির পারে চলে আসতে বলো তো। বলবে আমি তার জন্যে ওয়েট্ করছি!'…কী ব্যাপার বল্ তো, কিছু আন্দাজ করতে পারছিস?"

"দরকার কি আন্দাজের দিকে যাওয়ার? তুই আগে গিয়ে বল্, সে এক্ষুনি আসছে।…এই শোন, নিজে গিয়ে বলছিস তো?"

॥ আঠার ॥

মিনিট কুড়ির মধ্যেই দোলু এসে উপস্থিত হলো। দেখল গাড়ি-বারান্দায় ওঁর মোটর প্রস্তুত রয়েছে। ওঁর সবই পুরোপুরি সায়েবী কায়দা; ঝক্‌ঝকে পেতলের বোতাম বসানো নিজের নিজের পোশাক পরে আর্দালি আর শোফার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছে, প্রশ্ন করে জানল উনি তোয়ের হয়ে নেমে এসেছেন নীচে, অফিসঘরে অপেক্ষা করছেন।

এমনি দেখা কতবার হয়েছে, ছোটখাট প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তবে কাছে ডেকে পাঠানো এই প্রথম। দোলু ভেতরে ভেতরে একটু চঞ্চলই হয়ে

পড়েছে, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল—"আমায় ডেকেছেন ?"

একটা ফাইল ওল্টাচ্ছিলেন দোরের দিকেই মুখ করে, চোখ তুলে চাইতে নমস্কার করে আবার প্রশ্নটা করল।

একটু ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল ওঁর, যেন মনে করবার ভঙ্গিতে, পরক্ষণেই বললেন —"ও, আমাদের দোলু ? তুমি এসে গেছ তা হলে ? ছাট্‌স্ গুড ; বসো।"

হয়তো ফাইলের দিকে মনটা ছিল বলেই এইটুকু স্মৃতিভ্রম, দোলুর কিন্তু নিজের নরুণ-ছাঁটের গোঁফ আর চামড়া-বের-করা রগের কথা ভেবে কান দুটো গরম হয়ে উঠল। সামনের বেতের চেয়ারটায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মনটাকে যেন ওদিক থেকে টেনে নামাতে পারছে না। উনিই বললেন— "তোমায় এদিকে দেখি নি অনেকদিন ; আজকাল করছ কি ?"

"আজ্ঞে, তেমন কিছু তো···"

"কেন ?"

পরাশরকাকা নয়, রীতিমতো কাজের লোক, মিথ্যা হলেও কাজের মতো করেই উত্তর দিতে হলো দোলুকে, বলল—"আজ্ঞে, কাজের বাজার আজকাল যা হয়েছে···"

উনি পাইপ ব্যবহার করেন, তার আগাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনছিলেন, বললেন—"শুনলাম তোমার বাবা নাকি কিছু হাউস প্রপারটি (House property) রেখে গেছেন, সেইগুলো দেখা-শোনা কর।"

"আজ্ঞে, তাতে কি হয় ?" বেশ সহজভাবে হেসেই বিজ্ঞের মত বলল দোলু, মনটা রগ আর গোঁফজোড়া থেকে নেমেও এসেছে। বলল—"খানকতক বাড়ি, আজকাল আবার টেনাণ্ট্‌-ল (Tenant law) যা হয়েছে গবর্নমেণ্টের —তার ওপর নির্ভর করে তো থাকা যায় না।"

"তা তো বটেই। তা হলে কাজ-টাজ কিছু করবে মনে করেছ ?"

"করতেই হবে। বাবা যেটুকু রেখে গিয়েছেন তার ওপর নির্ভর করে থাকলে—সে আর কতদিন বলুন ? শুনতেই হাউস প্রপারটি।"

এমন একজন কৃতকর্মা পুরুষ, তায় সরিতের পিতাই, বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথাগুলো বলতে পেরে আত্মপ্রসাদই অনুভব করল দোলু। ওঁকে দেখে মনে হয় বেশ খুশী করতে পেরেছেও।

প্রশ্ন করলেন—"করছ চেষ্টা তা হলে ?" কথাগুলো সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয় ওঁর।

"চেষ্টা কি বলছেন। ঘুরে ঘুরে ক'জোড়া জুতো ছিঁড়েছে বলা যায় না। যেখানেই যাই, নো ভেকেন্‌সির (No Vacancy) কার্ড ঝোলানো। তার পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যদি পাওয়া গেল একটা ইণ্টারভিউয়ের চান্স্ তো সেই পুরনো কথা—'বেশ, চিঠি দেওয়া হবে।' সে-চিঠি আজও পাচ্ছি, কালও পাচ্ছি।"

—ছেঁদো কথাগুলো বেশ সহজ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বলে জুড়েও দিল—"সরিৎ জানে সব।"

"কই, আমায় কখনও বলে নি তো!"

"আজ্ঞে, এই সামান্য কথা নিয়ে আপনাকে—আপনার কাজের মধ্যে…"

"সেকথা বলছি না। কাজ করতে চাও তো আমার অফিসেই তো আসতে পার। তুমি বা সরিৎ বল নি, আমিও ভেবে দেখি নি কখনও।…কি ?"

মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল দোলু, জিভে যেন সাড় নেই। বিজ্ঞ সাজতে গিয়ে এ কী এক উৎকট ভুল করে বসে আছে! পরাশর-কাকাকে যা যা বলেছিল সেদিন ঠিক তার উল্টো! স্রেফ একটু বুদ্ধিমান মনে হওয়ার লোভে!

উনি প্রশ্ন করলেন—"কি যেন ভাবছ।"

সামলে নিল একটু। অনেক চেষ্টা করে দৃষ্টিতে একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল—"তাই তো, আশ্চর্য হচ্ছি, কেন যে আপনার কানে তোলা হয় নি…এই যে মনে পড়েছে এতক্ষণে—হ্যাঁ, ভেবেছিলাম বৈকি, তার পর দেখলাম—'রয়-গুপ্টা' হলো ইঞ্জিনীয়ারিং ফারম্, আমি একটা সাদামাটা বি-এসসি…"

"আমার ফার্মে তো সবাই ইঞ্জিনীয়ার নয়। কত ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে,—ঐ যে সরিৎ কাজ করছিল…"

"তাও তো বটে!—ঘেমে উঠেছে দোলু, তবে একেবারে চরম অবস্থার মধ্যেও তাল রেখে যাওয়ার একটা ক্ষমতা আছে, আবার একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেই বলল—"কেন যে এমন সহজ কথাটা মনে পড়ে নি! অথচ এদিকে ঘুরে ঘুরে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে!"

পরিত্রাণের আপ্রাণ চেষ্টাও করে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে, বলল—"তা হলে ভেবে দেখি।"

"আর ভেবে দেখবার কি আছে? যখন চাওই কাজ, রয়েছেও হাতের কাছে..."

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি। তা হলে দেখি মাকে বলে একবার।"

"আপত্তি আছে কিছু তাঁর?"

"আজ্ঞে না, আপত্তি কি থাকবে? তবে যদি বলেন বাড়িগুলোর দিকে কে দেখবে তা হলে—"

"আদায়-পত্র তো? তার জন্যে নিশ্চয় কর্মচারী আছে সব?"

"আজ্ঞে, তা আছে বৈকি! তবে—আপনার গিয়ে—ফাঁকিবাজের দল তো।"

গলা শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলে একটু হাসল।

"সেটা বোধ হয় তুমি নিজে ঢিলে বলে। কাজ করবার অব্যেস হলে ওটা থাকবে না। নিজে খাটছি, যারা মাইনে খাচ্ছে তারা ফাঁকি দিচ্ছে এটা তো সহ্য করতে পারে না মানুষে। ছ্যাখো না আমায় কতদিক সামলাতে হয়।"

"আপনি আর আমি!"—খোশামোদ করবার সুযোগ পেয়ে যেন বাঁচল। একটু সময়োচিত হাসিও এনে ফেলল। বলল—"আপনার হলো তপস্যা।"

"তার সময় তো এই, তোমাদের বয়েস থেকেই তো আরম্ভ করতে হয়েছে। না, তুমি এসো আমার আফিসে, কাল থেকেই। আমার চেম্বারে বসেই আপাতত কাজ শিখবে। দরকার হয়, তোমার মাকে নিজেই বুঝিয়ে বলব আমি—'দোলুর ভয়, আপনার আপত্তি থাকতে পারে'..."

"সে কি! আপনি কেন কষ্ট করে—?"...চেষ্টা সত্ত্বেও একটু শিউরেই উঠল।

"থাক, যখন দরকার নেই বলছ। তা হলে জয়েন করেই নাও। আমার ধারণা ছিল চাও না কাজ করতে। চাও, খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছ, দরকার কি তার। সরিৎও আসছেই দুদিন পরে, দুই বন্ধুতে আরম্ভ করে দাও।"

"বেশ, তা হলে ওর সঙ্গেই আসব।"

—একটা যেন মস্ত বড় অবলম্বন পেয়ে মুঠিয়ে ধরল দোলু। সময় পাওয়া যাবে তো একটু।

উনি বললেন, "ও ধীরে সুস্থে আসুক না, দিনকতক যদি চায়ই রেস্ট্ নিতে। তুমি এসে গেলে বরং একটু চাড়ও হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুমি।"

এবারের যে শুভদৃষ্টি তা যেন হাজার চেষ্টা করেও ভরে তুলতে পারছে না

দোলু। রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছল, ভালোমন্দ কিছুই যেন যোগাচ্ছে না। মিস্টার রায় হাত উল্টে ঘড়িটা দেখলেন, বললেন—"তা হলে আমি উঠি ; কিছু বলবে আর ?"

বোধ হয় সে-ক্ষমতা হারিয়েছে জেনেই বললেন—"ঠিক আছে, তুমি কাল থেকেই আসবে।"

॥ উনিশ ॥

মোটরটা যতক্ষণ না একেবারে চোখের আড়াল হয়ে গেল, ঠায় চেয়ে রইল দোলু, তার পর খট্ খট্ করে নেমে এসে সোজা স্পাইর‍্যাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ডাকল, "এই দোর খোল ! শুনছিস !"

সরিৎ দরজা খুলে দিতেই ফেটে পড়ল, অবশ্য গলাটা সাধ্য মত চেপে, "রইল তোর কেতকী আইচ, রইল তোর পার্টি—আমার দ্বারা কিছু হবে না ! চললাম আমি কলকাতা ছেড়ে, আখেরের মতন।...ওঃ, চাকরি করবে এস !... করলাম চাকরি !"

চৌকাঠ না পেরিয়েই।

"কি হয়েছে ?" নিতান্ত শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সরিৎ।

চোখে মনে হয় একটু যেন কৌতুকের হাসি মাখানো।

"কিছু হয় নি, তবে চাকরি আমায় দ্বারা হবে না—কারুর চাকরি নয়, কোনখানে নয়। কালই কলকাতা ছেড়ে..."

"কিন্তু কাল তো অফিসেই যাচ্ছিস।"—হাসিটা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"কোন মতে নয়। আমায় জোর করে রাজী করিয়ে নিয়ে..."

"বাঃ, চাকরি খুঁজে খুঁজে পায়ের জুতো ছিঁড়ে ফেলেছিলি !"

"কে বললে ? দেখেছিস কখনো আমায় চাকরির জন্যে কারুর দোরে..."

"তুই তো নিজেই বলেছিস বাবাকে।"

"কে বললে তোকে !"—একটু হকচকিয়ে গেল।

"শীলা।"

"শীলা !! আড়ি পাতছিল তো ?—আবার একচোট জ্বলে উঠল দোলু। একটু স্থিরভাবে চেয়েই রইল সরিতের দিকে, কি যে করবে, কি বলবে যেন বুঝে

উঠতে পারছে না, তার পর হন্ হন্ করে ভেতরে চলে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "শোন, সত্যিই এবার তোদের বাড়ি ছাড়তে হলো আমায়। চৌকোশ, তার ওপর জ্যাঠামশাই, আবার এই শীলা বাঁদরীটা—বেড়ে উঠছিল দিনদিন, এখন আবার মেয়েছেলেদের মতন আড়ি পাততে আরম্ভ করেছে।"

"শীলা মেয়েছেলেই।"—এগিয়ে গিয়ে ওর ডান হাতটা ধরল সরিৎ, একটু টান দিয়ে বলল, "বোস। বিপদের মধ্যে কোথায় মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, আরও ক্ষেপে উঠেছে!"

সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল সামনাসামনি হয়ে, বলল, "শীলাটার আর যাই দোষ থাক—বাবার আদরে-আদরে বিগড়ে যাচ্ছে তো—কিন্তু আড়িপাতা, কানভাঙানি—মেয়েদের যা আসল দোষ সেগুলো নেই ওর মধ্যে। ব্যাপার হয়েছে, বাবার মাথায় তোর কথাই ঘুরছিল—কেন তা জানি না—অন্যমনস্ক হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছেন, মাদুলি-ধোওয়া জল খেয়ে আসেন নি, মা শীলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। শীলা নিয়ে আসছিল, তার পর তোদের কথা শুনে বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথমটা একটু ধোঁকায় পড়ে যাবে তো, কার সঙ্গে কথা কইছেন।···ফুর্তি করে আমায় বলতে এসে ধমক খেয়ে সব বললে। তোর সঙ্গে আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ, নাকাল হচ্ছিস, খানিকটা ইণ্টারেস্টেড হয়ে পড়েছিল ঠিকই, তবে আড়িপাতা উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া নয়। শোনেও নি তো সবটা, তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে আমায় বলবার জন্যে···"

বলতে বলতেই উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে সিগারেট-দেশলাই নিয়ে এল, একটা ওর হাতে দিয়ে, একটা নিজে নিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সর ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলল, "আমার কি মনে হয় জানিস?"

"শুনিই না।"—মুখটা ভার করে বলল দোলু। চিন্তার দুটো স্রোত মিশে গিয়ে ক্রোধের উত্তাপটাকে ইচ্ছামত ধরে রাখতে পারছে না।

সরিৎ সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, বলল, "এখানেও ঐ চৌকোশ—পরাশর কাকা।"

দোলুও তারটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করল, "উদ্দেশ্য? বলে তো দিলি পরাশর কাকা।"—আরও নরম হয়ে এসেছে তবে টোন্‌টা এখনও ব্যঙ্গেরই।

"সরিৎ কোন্ ছার, সরিতের চোদ্দপুরুষ একজোট হয়ে মাথা ঘামালেও ও চালবাজের চাল ধরতে পারবে না।"—ক্ষুব্ধ আক্রোশের সঙ্গে বলল সরিৎ। "তবে নির্ঘাত ওর চাল, লিখিয়ে নে আমার কাছে। হয়তো ভেবেছে—কান

টানলে মাথা আসবে ; তুই গেলে আমিও আপ্‌সে গিয়ে জুটব।...উফ্‌! ক'টা দিনের জন্যে এসে যেন দিগ্বিজয় করে চলে গেল।"

দুজনে নিঃশব্দে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। একটু পরে সরিৎ প্রশ্ন করল, "তা হলে?—বেরুচ্ছিস তো কাল থেকে?"

চুপ করে সিগারেট টেনে যেতে লাগল দোলু। বেশ খানিকটা সময় গেল। সরিৎ প্রশ্ন করল, "বোধ হয় খেয়েও আসিস নি বাড়ি থেকে?"

"মস্ত বড় চালবাজ, না?"—আবার একটু উষ্ণ হয়ে উঠেই প্রশ্ন করল দোলু, একটা চোখ একটু কুঁচকে বলল, "একটা চালেও মাৎ করতে পেরেছে এখন পর্যন্ত? আমিও যার নাম..."

"বেরুচ্ছিস না আফিসে তা হলে? তা চললি কোন্ চুলোয়?"

"যেদিকে দু-চক্ষু নিয়ে যায়।"—সরিতের দিকে চেয়ে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "মনটা উল্‌সে উঠছে, না? ভাবছিস আপদ বিদায় হোক, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধর্না দিয়ে পড়ি আইচ-বাড়িতে, দেখি চৌকোশই বা কেমন করে রুখতে পারে, বাবাই বা কেমন করে রুখতে পারে। তা যা গিয়ে, পড় গে হামড়ে, আর কেয়ার করি না।"

"ব্যস্ যে যাই করুক, ঘুরেফিরে সেই হতচ্ছাড়া সরিৎ! এতই উইক (weak) ভাবিস, এতই একেবারে হোপলেস (Hopeless), তা হলে চল, এগো, ত্থাখ পারি কিনা। আমিও বেরিয়ে পড়ি তোর সঙ্গে, ল্যাঠা চুকে যাক।—সরিৎ হয়েছে একটা মস্তবড় প্রবলেম্ (Problem), একটা ঝঞ্ঝাট—বাড়ির, আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধুর..."

"হয়েছে।"—বাঁ হাতের তর্জনী তুলে থামিয়ে দিল দোলু। বলল, "ক'টা দিন ঘেঁষাঘেঁষি কাটিয়ে তোর মেয়েদের গায়ের হাওয়া লেগেছে, আগে নাকে-কান্না রোগ ছিল না। শোন!"

থামিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতেই লাগল। সরিৎ টুকল না, হয়তো খোঁচা খাওয়ার ভয়েই। সিগারেটটা গোটাকতক বড় বড় টানে শেষই করে ফেলল দোলু, যেন পাকাপাকি কিছু একটা ঠিক করে ফেলেছে। অ্যাশট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিয়ে বলল, "যা বলছিলাম তখন—ওর কোন্ চালটায় পেরেছে মাত করতে আমায়? বন্ধু-বিচ্ছেদ—ধরে ফেলেছি। ভিড়িয়ে দেবে ওদিকে?—সে-চালও গোলাম সাদিক দেছে ভেস্তে। বাকি থাকে তোদের দুজনের ব্যাপার। চাসই তুই মিস্ আইচকে? বল, তা হলে ঘটিয়ে দিই। রাখি সে

ক্ষমতা, যত বড়ই স্মার্ট হোক না কেন সে! চৌকোশেরও সব কেরামতি বেরিয়ে যায়, জ্যাঠামশাইয়েরও—কি যে বলে…"

মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে। একটু সোজাও হয়ে উঠেছিল ঝোঁকের মাথায়, আস্তে আস্তে সোফার গায়ে এলিয়ে পড়ে একেবারে নরম হয়ে গেল, বলল, "কিন্তু কি জানিস সরিৎ?—জ্যাঠাইমার জন্যে কষ্ট হয়। কাদের পুজো করেন অতশত বুঝি না, তবে আমার মনে হয়, পুজো করবার মতন যদি কোথাও কেউ থাকে, স্বর্গে বা মর্ত্যে তো সে জ্যাঠাইমা। একটা যে ভুল করে বসেছেন চৌকোশকে ডেকে তাব পরিণামটা শেষ পর্যন্ত যেন ওঁর ওপরেই পড়ছে উল্টে। এ যেন সহ্য করা যায় সরিৎ!"

নিজের ডান হাতটার দিকে চাইল। সিগারেটটা সে শেষ করে ফেলেছে, মনে নেই। বলল, "দে তোরটা একটু।"

বড় বড় টানে ওটাকেও শেষ করে অ্যাশট্রেতে টিপে দিয়ে বলল, "তাই ভাবছি, ওঁকে যে কথাটা দিয়েছি সেটা অন্তত রেখে যাই। ওঁকে বলেছি, মেয়ে যদি ঘরে আনবার মতন হয় তো আনবই। উনিও রাজী। তা হলে ভেবে দেখছি, জ্যাঠামশাইকে না চটিয়ে কাল থেকে বেরুই-ই, উনি যেমন বলেছেন। এতে আপাতত পার্টিটার কথা তোলার সুবিধে হবে—ওঁর চেম্বারেই এখন জায়গা হচ্ছে আমার, তক্কেতক্কে থাকব। কি বলিস?"

"গোড়াতেই একেবারে মা-র মনের মতন হয়ে আসতে পারবে কি?"

আতুর দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল সরিৎ। দোলু উঠে পড়ল, বলল, "তুই মর, মর, মর হতভাগা! মরতে আর বাকি কি আছে তাও তো বুঝি নে। একেবারে জ্যাঠাইমার মনের মতন হয়ে আসা মানে তো ওঁর ঠাকুরঘরে ঢোকা, তা দিচ্ছে কে ঢুকতে ওকে? সাতজন্ম ধরে তপস্যা করুক আগে। এই ঠিক রইল, একরত্তিও নড়চড় হবে না। এতে চৌকোশের নতুন চাল ধরে ফেলবার সুবিধেও হবে। উঃ, কোথায় কি কল টিপে গেল, সেই ধরালেই চাকরি আমায়!…আচ্ছা!…"

কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "না, খেলাম না খাবার। শীলাকে বলবি ওর আড়িপাতার জন্যে চটেছি।…পেতেছে আড়ি, ওর অকরণীয় কিছু নেই। শুধু জ্যাঠাইমাকে দোষ দিলে চলবে কেন, তোরও আস্কারা পাচ্ছে, এক মেয়ে, এক বোন কারুর আর হয় না!"

। কুড়ি ।

পরদিন যথাসময়ে অাঁপিসের গেটে গিয়ে গেটকীপারকে নিজের কার্ড দিতে সে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, "নাম?" নামটা বলতে সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা মিলিটারি সেলাম ঠুকে বলল, "আইয়ে।"

একটু আঁকাবাঁকা পথে অন্য কয়েকটা কোম্পানীর অফিস ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হল নিয়ে "রয়-গুপ্টার" অফিস। অনেকগুলি ডিপার্টমেণ্ট। সব খোলা হলেই, শুধু এক লাইনে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি কাঠের চেম্বার। তার মধ্যে একটি একেবারেই আলাদা এবং অন্যগুলির চেয়ে আকারে প্রায় দ্বিগুণ। লোকটা সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছিল, দূর থেকে বড় চেম্বারটির পাশে একটা টুলে চাপরাশ-আঁটা মিস্টার রায়ের খাস আর্দালীকে দেখতে পেয়ে একে ফিরিয়ে দিল দোলু। এগিয়ে গিয়ে কার্ডই বের করতে যাচ্ছিল আবার, লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে জানাল লাগবে না; সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারের স্প্রিংয়ের কপাটের একটা পাল্লা ঠেলে ধরল। মিস্টার রায় নিজের রিভল্‌ভিং চেয়ারে একটু এলিয়ে বসে পাইপ সেবন করছিলেন, সামনে অনেকগুলি ফাইল, দোলু নমস্কার করে ভেতরে পা বাড়াতেই বললেন, "এই যে এসে গেছ, এস।"

কিছু যেন সন্দেহ ছিল। দশটা-পাঁচটার অভ্যাস নেই, দোলু একটু লজ্জিত-ভাবে বলল—"একটু দেরি করে ফেললাম।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ঐ চেয়ার, বসো গিয়ে। তোমার বন্ধুরও ওখানেই হাতেখড়ি হয়েছিল।"

বাঁদিকে, ওঁর প্রকাণ্ড সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সঙ্গে লাগানো সবুজ-বনাত-মোড়া আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিল, তার ওদিকে একটি গদি-আঁটা গোল আফিস-চেয়ার, দোলু ঘুরে গিয়ে বসল। টেবিলটা খালি, শুধু হোয়াট-নটের মধ্যে কয়েক সাইজের কিছু চিঠির কাগজ, খাম আর সামনে দোয়াতদানি, পিনকুশন, পেপার-ওয়েট, ব্লটার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। খাতাপত্র বা ফাইল এসব কিছুই নেই।

তা হলে কাজ শুরু করা হবে কি ভাবে, কি দিয়ে?

দোলু প্রশ্ন করার আগেই মিস্টার রায় পাশের রিভল্‌ভিং বইয়ের র‍্যাক

ঘুরিয়ে একটা ইংরাজী বই টেনে নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, বললেন, "এই বইখানার ওপর চোখ বুলিয়ে যাও, দিন-তিনচার লাগবে। এর পর আরও খান দুই পড়ে ফেল, তার পর আরম্ভ করবে কাজ।"

আফিস-পরিচালনা নিয়ে মোটা-মোটা কথাগুলার আলোচনা রয়েছে বইটাতে, অধ্যায়গুলো উল্টে উল্টে একবার দেখে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিল দোলু। মিস্টার রায়ও ডানদিকের স্তূপীকৃত ফাইলের ওপর অর্ডার দিয়ে যেতে লাগলেন ; কোনটার ওপরের নোট দেখেই, কোনটা বা প্রয়োজনমত ভেতরের কিছু কিছু পড়ে নিয়ে। পুরোদমে কাজ চলতে লাগল, আর্দালীকে কলিং বেলের সংকেতে ডেকে ফাইল পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া, নূতন ফাইল এসে পড়া ; মাঝে মাঝে ডিপার্টমেণ্টের যাঁরা মুখ্য তাঁদের ডেকে কোন পরামর্শ করা বা নির্দেশ দেওয়া। এর মধ্যে কার্ডের ওপর সাক্ষাৎকার হলো কয়েকজনের সঙ্গে। বিভিন্ন পার্টি ; বাঙালী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দুজন সাহেবও। একখানা কার্ড দেখে আর্দালীকে হুকুম করলেন, "কন্‌ফিডেন্সিয়াল চেম্বারমে বৈঠাও।" একটু পরে নিজে উঠে গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এলেন।···এসব ছাড়া টেলিফোন তো রয়েছেই।

আড়াই ঘণ্টা একটানা কাজ, দরকারী কথার বাইরে একটি কথা নেই, তার পর এল আফিসের টিফিনের বিরতি। আর্দালী দুটো টেবিলে চা, একটা বড় প্লেটে টোস্ট, কেক্ আর দুটো করে রাজভোগ আর দু গেলাস জল এনে রেখে দিল। দোলু ওকেই বলল, "একটা খালি প্লেট আন, আমার অত লাগবে না।"

"কেন, ক্লান্ত আছ তো!"—মিস্টার রায় মন্তব্য করলেন। এদিকে এই প্রথম কথাও দোলুর সঙ্গে।

দোলু একটু হাসল, বলল, "আজ্ঞে, আমার তো শুধু টেবিলটা আপনার টেবিলের সঙ্গে ঠেকে আছে।"

একটু মুখের দিকে চেয়ে রইলেন উনি, কথাটা বুঝতে যেটুকু দেরি হলো, তার পর আস্তে আস্তে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর্দালীকে বললেন, "লে আও একঠো প্লেট।"

আহারপর্ব শেষ হলে উঠে গিয়ে পাশের আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগলেন। একটু অন্যমনস্কও। টিফিনের সময়টা শেষ হলে একটা টানা ঘণ্টি বাজে আফিসে, টেলিফোনের মত, তবে আরও জোরে ;

তার মিনিট পাঁচ-ছয় পরে উনি উঠে এলেন। কলিং বেল টিপে আর্দালীকে ডেকে বললেন, "নরহরিবাবু।"

একটু পরে একজন বেশ প্রবীন কর্মচারী এসে দাঁড়ালেন। বয়স ষাট বৎসরের কিছু উর্ধ্বেই, স্থূল শরীর, মোটা গোঁফ, প্রায় সবই পাকা, চোখের চশমাও মোটা, গায়ে কালো চীনা কোট, পরনে থান ধুতি। ঢিলেঢালা সেকেলে মানুষ। মিস্টার রায় যখন তিনটি কেরানি নিয়ে 'রয়-গুপ্টা' কোম্পানী ফাঁদেন, নরহরিবাবু সেই সময়ের বড়বাবু, এখন আফিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হয়ে রয়েছেন। লোকটি একটু স্পষ্টবক্তা তাই নূতন কোনও ব্যবস্থা বা নিতান্ত তেমন কোন প্রয়োজন না হলে ডাকেন না মিস্টার রায়। একেবারেই সেই গোড়া থেকে রয়েছেন, একটু খাতির করতে হয়।

বললেন, "আপনাকে ডেকেছি, একে একবার আফিসটা ঘুরিয়ে আনবেন। সরিতের বন্ধু, আজ থেকে আমার টেবিলে বসল।"

"আমাদের সরিতের বন্ধু?"—চশমার ওপর দিয়ে ওর দিকে ঘাড় নীচু করে চাইলেন নরহরিবাবু, বললেন, "এস।"

দোলু উঠে এগুতে মিস্টার রায় একটু যেন কি ভেবে নিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, চল আমিই নিয়ে যাচ্ছি।...আপনি যান, একবার নতুন চেম্বারটা কত দূর হলো দেখব।"

ঘুরে ঘুরে ডিপার্টমেণ্টগুলার একটু করে পরিচয় করিয়ে, কয়েকজন বর্ষীয়ান কর্মচারীর কাছে ওর পরিচয়টাও দিয়ে এগিয়ে চললেন; হাতে পাইপ, সমস্ত অফিসটা থমথম করছে। হলের অন্য প্রান্তে দুজন ছুতার মিস্ত্রি কাজ করছিল, কিছু প্রশ্ন করে আবার এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "তোমার বন্ধুর নতুন চেম্বার এটা।...কবে জয়েন্ করবে কিছু বলেছে তোমায়?"

"আজ্ঞে, তা তো..."

হঠাৎ প্রশ্ন, ঠিক করে উত্তর দেওয়ার আগেই উনি বললেন, "বিশেষ তাড়া নেই, চেম্বারটা হোক।"

ফিরে এসে আফিস-চেয়ারটাতেই বসলেন, একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "কেমন মনে হচ্ছে?"

"আফিসটা?"—প্রশ্ন করল দোলু।

"না, আফিস যা তা তো আছেই। কাজটা তো দেখলে খানিকটা...কাজের নেচার (nature) আর কি।"

একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়েই রইল দোলু, একটু হাসির ভাবও যেন ফুটে বেরুচ্ছে সে-দৃষ্টিতে। উনি বললেন, "বল, কুণ্ঠা কিসের ?"

"আজ্ঞে, আমাকেও যদি কখনও এইভাবে কাজ করতে হয়—সেই কথা ভেবে…"

বেশ জোরেই হেসে উঠতে গিয়ে বোধ হয় আফিস-ডিসিপ্লিনের জন্য সামলে নিলেন মিস্টার রায়, বললেন, "শুনেছি বটে—বড় ফাঁকি দিয়ে এসেছ তুমি।"

ফাইলের ওপর নজর দিয়েও বার-দুই চাপা হাসিতে দুলে দুলে উঠলেন। তার পর এক সময় ঘাড় তুলে বললেন, "হ্যাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম—আজ তুমি যাও ; প্রথম দিন। আসবার টাইম্‌টা ঠিক রেখ।"

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে স্প্রিং দরজাটায় হাত দিয়েছে, বললেন, "শোন, রাস্তাটা জানা আছে তো ?…না হয় আর্দালী সঙ্গে…"

"আজ্ঞে পাল্‌…। হ্যাঁ, রাস্তা ঠিক জেনে যাব। না, আর্দালী সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই।"

সেদিন সন্ধ্যার খানিক পরে সরিতের ঘরের ব্যালকনিতে উঠে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারল দোলু, বলল, "ওদিককার দরজাটা খোলা থাকে তো বন্ধ করে দে আগে।"

সরিৎ বলল, "না, বাড়ি খালি, মা সবাইকে নিয়ে 'যুগাবতার' সিনেমা দেখতে গেছেন। আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে, দুবার ফোন্ করেছিলাম।"

দোলু ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড় সোফাটায় একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। এবার বেশ জোরেই গলা ছেড়ে দিয়ে বলল, "আগে আমার কথা শোন্—এবার বেশ জোরেই গলা ছেড়ে দিয়ে বলল, "আগে আমার কথা শোন্—পেতিস কোথায় ?—হন্যে হয়ে মোটর নিয়ে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—আফিস থেকে বেরিয়েই।"

"কেন ? অথচ…"

"আমার দ্বারা হবে না—হবে না—হবে না সরিৎ—তোরা না পারিস, আমি জ্যাঠাইমার পা জড়িয়ে ধরব—আসুন ফিরে উনি—আমার নাম খারিজ করিয়ে দিন—আমার দ্বারা অফিস করা হবে না।"

"কেন রে! অথচ বাবা তোকে অতবড় একটা কম্‌প্লিমেণ্ট্ দিলেন! অমন প্রশংসা!"

"দরকার নেই আমার কম্‌প্লিমেণ্টে, আমায় রেহাই দিতে বল। ভাবতে পারিস, কী কেলেঙ্কারি করেছি!"

ওর বিস্ময়াবিষ্ট চোখের সঙ্গে একটু চোখ মিলিয়ে চেয়ে রইল, তার পর বলল, "আলগা মুখ—দুবার জিভ ফসকে গেলই বেরিয়ে—আমারও না হয় কম্‌প্লিমেণ্টই, ওঁর কাজ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে—কিন্তু···"

"কিন্তু কি ?···বাবা এসেই কি বলছেন জানিস—শীলাকে ডেকে ? বললেন সরিতের বন্ধুর সেন্স্ অব্ হিউমারটা বেশ জোর তো। ও পোড়ারমুখী মুখ তোলাপানা করে এসে আমায় বলছে—'দাদা, দেখেছ ? দোলুদা বোধ হয় বাবার সঙ্গে আফিসে মস্করা করেছেন, একটু বলে দিও!'···ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে ঐকথা বললে—এসেই বলেছেন ওকে। তার পর, আজ কি কাজ ছিল, নরহরিবাবু বাবার সঙ্গে ওঁর মোটরেই এসেছিলেন আফিস থেকে। আমি পথে পায়চারি করছিলাম, আফিসঘরে বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা কয়ে ফিরে যাওয়ার সময় আমার কাছে এসে মোটা চশমার ওপর দিয়ে বড় বড় চোখ তুলে বললেন, 'কে হে তোমার বন্ধুটি ? আজ কর্তাকেও হাসিয়ে ছেড়েছে! তাজ্জব ব্যাপার! আফিসের সবাই অবাক!'···তুই বায়রণের (Byron) মতন একদিনেই সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিস।"

"কাজ নেই ভাই, ঐ হাসতে পারাই হয়েছে কাল। না, আমি পারব না সরিৎ, বিশ্বাস করি না নিজেকে। পরাশর কাকা পর্যন্ত চলে। জ্যাঠামশাই ?—ওরে বাবা! ঐ একটু হাসির আস্কারা পেয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিলাম জানিস ?"

মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে সরিৎ।

"কয়েকটা আফিসের ভেতর দিয়ে পথটা একটু গোলমেলে তো ? জিজ্ঞেস করলেন—'জানা আছে তো, না আর্দালী সঙ্গে দোব ?'···প্রায় বলে ফেলে-ছিলাম—'আজ্ঞে পালাবার পথ ঠিক জানা আছে।'···ভাবতে পারিস্ ? বলিস যেতে আর ? বসিয়েছেনও একেবারে পাশটিতে, কত লাগাম কষে রাখব মুখে বল্ ?"

॥ একুশ ॥

দোলু অফিসে কাজ আরম্ভ করায় দুই বন্ধুরই দৈনন্দিন জীবনে খানিকটা পরিবর্তন এসে গেল, কর্মধারা চিন্তাধারা দুই দিক দিয়েই। একটা কথা বলে দেওয়া দরকার—দোলু প্রথম এসে সরিৎকে যেমন দেখেছিল—একেবারেই ঘরে আবদ্ধ, বাইরের সঙ্গে একেবারেই কোন সম্পর্ক নেই, ও আসার পর সেটা অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল। ওদের দুজনেরই চিন্তার মূলসূত্র ছিল কেতকী, তবে ধীরে ধীরে আরও পাঁচটি বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল—সরিতের, প্রবাস-কাহিনী আছে, তা ভিন্ন ওর অবর্তমানে এখানকার নানা কথা, যা হচ্ছে, যা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। নিতান্ত কোন কাজে আটকে না থাকলে দোলু দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে দিনের ভাগটা সরিতের সঙ্গেই কাটাচ্ছিল এদিকে। বেরিয়েও গেছে দুজনে মোটরে করে, রাতেরও খানিকটা এখানেই কাটিয়ে গেছে দোলু। আস্তে আস্তে জীবনটা স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে আসছিল। তবে কেন্দ্র ঐ কেতকী। নিঝুম হয়ে পড়ে সরিৎ, আলোচনা কেতকীতেই আসে ফিরে।

কাজে ঢোকার পর থেকে সবচেয়ে যা বড় পরিবর্তন এসে পড়ল, যদিও অনেকটা অজান্তে, তা এই যে কেতকী যেন খানিকটা নেপথ্যে চলে গেল, আর তার জায়গাটা দখল করল আফিস, দোলুর কাজ।

এটাও হলো নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। দোলু একেবারে কাঁচা, কিছুই জানে না, এদিকে সরিৎ যেন খানিকটা ওয়াকিবহাল—খানিকটা অভিজ্ঞতা নিয়েই বিলেতে গিয়েছিল, সেখান থেকেও ফিরেছে ব্যবসার নব-নবতম পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিক দক্ষতা লাভ করেই; শেখা, শেখানো, আফিসের কথা নিয়ে আলোচনা—এইটেই ওদের দৈনিক জীবনের হয়ে দাঁড়াল প্রধান কাজ। একটা নূতন জগৎ, এতদিন পরিহার করে এসেছে, এখন প্রচুর আনন্দ পায়। সরিৎও। গড়ে তোলবার তো একটা আনন্দ আছে, তার পাত্র দোলুই, অন্তরতম বন্ধু।

কেতকী একটু একটু সরে যেতে লাগল।

অবশ্য দুজনের চিন্তা থেকে সমানভাবে নয়।

সেটা সম্ভবও নয়, তা ভিন্ন দুজনের সুযোগ বা অবসরও নয় সমান। আফিসের সময় ঠিক রাখতে হয়, সকালবেলা সরিৎ ওর বাড়িতেই যায় চলে,

দোলুর শিক্ষানবিশিই হয় বেশির ভাগ। সন্ধ্যার পর দোলুই যায় সরিতের বাড়ি। কাজ ঐ। অবশ্য আরও সব কথা এসে পড়ে, তবে তাও প্রায় আফিস নিয়েই—নূতন কি সব হলো আজ সেখানে; নরহরিবাবু নিয়ে রগড়ের যদি কিছু থাকে। দুপুর-বিকেল দোলু তো আফিসেই।

সরিৎ-কেতকী সমস্যা স্বভাবতই অনেকটা অবান্তর হয়ে পড়েছে দোলুর জীবনে। অবশ্য অবস্থা গতিকেই, আলোচনার অভাবে বা সমবেদনার অভাবে নয়।

সরিতের জীবন থেকে এতটা অপসারিত হওয়া এখনই সম্ভব নয়, তার ওপর দিনের এই নিরালম্ব অবসর রয়েছে, মনটা হু-হু করে। কলকাতায় এসে পর্যন্ত দেখা হয় নি, পার্টিতে দোলুর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিচার করতেও বসে; তবু মনটা অবুঝ হয়ে পড়ে মাঝে। সেটুকু প্রত্যক্ষ, জাহাজের সেই ক'টা দিনে নগদ যা পাওয়া গেল, তাই নিয়ে ভাঙা-গড়া করতে থাকে।

গড়ার চেয়ে ভাঙনের দিকটাই ক্রমে যেন বেশি হয়ে আসছে। একটা প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর খুঁজে পায় না। নিমন্ত্রণ-কার্ডের উত্তরে অসুস্থতার ভান করেই চিঠি দিয়েছিল সরিৎ; জাহাজের দিনগুলো যদি এতই সত্য ওদের দুজনের জীবনে তো একবার খোঁজ নিল না কেন কেতকী? আর তো ঠিকানা না জানার কথা আসে না। মনটা ভাল থাকলে অভিমানই হয়, নয় তো নিজের মনটা নিজেকেই বিদ্রূপ করতে থাকে—ওরা এই রকমই—সোসাইটি লেডী—দোলু ঠিকই বলে—পঁচিশটা মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—কাউকে দৃষ্টিপ্রসাদে ওঠাচ্ছে, কাউকে ভ্রূকুটি দিয়ে নামাচ্ছে। এই ওদের জীবন, দূরে থাকো নিজের শুভ চাও তো।

ক্রমে এই বিরূপতা ভাবই মনটাকে বেশি করে ঘিরে থাকায় একটা ক্লান্তি এসে পড়তে লাগল, দিবসের এই নিঃসঙ্গ সময়টা হয়ে উঠতে লাগল দুর্বহ।

সেই কথাটাই একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল ওর প্রশ্নে।

গল্প করবার তেমন বিশেষ কিছু থাকলে, বিশেষ করে যদি রগড়ের কিছু রইল তো দোলু সোজা সরিৎদের বাড়িই চলে আসে।

সেদিন বিশেষ থেকে আবার সবিশেষ, তার ওপর খানিকটা দেরিও হয়ে গেল, পেট ফুলছিল দোলুর। স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়েই সোজা উঠে কড়া দুটো ঘনঘন নেড়ে দিয়ে বলল, "ওরে দোর খোল্, শীগ্‌গির!"

"কে? দোলু?" চটির শব্দ এগিয়েই আসছে, তবু প্রশ্নের মধ্যে আলস্যের সুরে অধৈর্যই হয়ে উঠল দোলু, আবার কড়ায় একসঙ্গে গোটকতক নাড়া দিয়ে বলল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ দোলু—শীগ্‌গির খোল্—আজ জবর খবর!"

পাল্লা দুটো টেনে দিতে—

"আজ···ওদিকে কেউ নেই তো?···আজ মহা-মহিমান্বিত রায়বাহাদুর পশুপতি রায়—সমস্ত আফিস যাঁর দাপটে থরহরিকম্প—সামান্যা এক নারীর মুখের সামনে একেবারে···"

গম্ভীর স্টেজ-অ্যাকৃটিঙের ভঙ্গিমায় একটানা বলতে বলতে ওর মুখেও ভাব দেখে একেবারে খাদে নেমে এল দোলু, তবে ভঙ্গিমাটা না বদলেই প্রশ্ন করল, "এ কি কুমার, আজ এত হতোদ্যম! এত বড সংবাদেও···"

এর পর বদলেই ফেলতে হলো সুর, ভঙ্গিমা, দুই-ই। চৌকাটের এদিকেই দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল—"ব্যাপারখানা কি রে?"

"আয় বোস্, একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম দোলু—চেম্বারটার আর কত দেরি?"

"চেম্বার! ভূতের মুখে রাম-নাম! তা হলে যাবি আফিসে? বলব জ্যাঠামশাইকে আর একটু তাড়া দিতে?"

"আফিসের জন্যে মাথাব্যথা নেই, তবে এই সময়টা বড় একঘেয়ে বোধ হয়। তুইও নেই আজকাল—এই আর কি, অন্য কিছু নয়···"

প্রসঙ্গটা একেবারে বদলে ফেলে, আজব খবর শোনাবার মত করে মুখে একটা কৌতুক হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করে শুধাল, "কি যেন জবর খবরের কথা বলছিলি?"

একটু বিরতি দিয়ে তাগাদাও দিতে হলো—"হ্যাঁ, রে দোলু, কি যেন···"

"ও! সে তেমন কিছু নয়"—একটা যেন ঘোর থেকে জেগে উঠে মগ্ন স্বরেই উত্তর করল দোলু। বলল, "সে শুনবিখন একদিন। চা দিতে বল্ লখাকে, সোজা অফিস থেকে এসেছি।"

॥ বাইশ ॥

খবরটা জবরই বলতে হয় ; আপিসে আজ তারই গুঞ্জরণ গেছে সমস্ত দিন।

সপ্তাহ দুই কেটে গেছে। বন্ধুর গুরুগিরিতে অনেকখানিই এগিয়ে গেছে দোলু। একটা লেজার পেয়েছে, হালকা দু-একটা ফাইল নিয়েও নাড়াচাড়া করে।

কাজ করছিল মাথা নীচু করে, আর্দালি এসে একটা স্লিপ মিস্টার রায়ের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল, "এক মেমসাহেব মোলাকাৎ চাহতা হুজুর।"

মেয়েরাও সাক্ষাৎকারে আসে, তবে খুব কম।

একটা ফাইলই দেখছিলেন মিস্টার রায়, "সেলাম দেও" বলে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। দোলুর দৃষ্টিটাও লেজার ছেড়ে একটু ওপরে উঠে গেল ; তার পর আর একটু, এবার মিস্টার রায়ের দিকে তির্যকভাবে। তিনি স্লিপটা না দেখেই উত্তর দিয়ে এখন একটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে আছেন সেটার দিকে।

মেমসাহেব নয় সে-অর্থে ; একটি বাঙালী মেয়েই। বোধ হয় আপিসে এর আগে কেউ না আসার জন্যই আর্দালি পরিচিত, উপরন্তু সম্মানিত অভিধাটাই ব্যবহার করেছে। মেয়েটির বয়স আন্দাজ কুড়ি-একুশ। খুব যে সুন্দরী তা নয়, তবে সপ্রতিভতার বেশ একটি দীপ্তি আছে চেহারায়, যদিও নূতন পরিবেশে যেন একটু স্তিমিতই। পরনে একটা সাদা সবুজপেড়ে শাড়ি, পরবার ভঙ্গিটাও খুব আধুনিক নয়। এদিকে পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি ; তবে মুখে-হাতে প্রসাধনের স্পর্শ নেই। মাথায় এলো খোঁপা।

নমস্কার করে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মিস্টার রায় ডান হাতটা একটু কপালের দিকে তুলে প্রশ্ন করলেন, "কি দরকার ?"

দোলু কষে লেজারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"আপনার আপিসে অ্যাকাউন্টস্ সেক্‌শনে একজন কেরানি দরকার বলে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।" মেয়েটি উত্তর করল।

"বেরিয়েছে।"—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন মিস্টার রায়।

"আমি সেই সম্পর্কেই এসেছি।"

"আমি কিন্তু পুরুষ-কেরানি চাই।...দাঁড়িয়ে কেন ? বসো তুমি।"

বসল মেয়েটি পাশের চেয়ারটিতে। অন্য মেয়ে-উমেদার হলে "থ্যাংক্স্" দিত। ও শুধু একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল বসতে বসতে। বলল, "কিন্তু বিজ্ঞাপনে তো তেমন কিছু লেখা ছিল না ; তাই…"

"মেয়ে-কেরানি চাই বলেও তো ছিল না লেখা। দরকার পড়লেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, নয় কি ?

"শিক্ষা যখন আপনারা আমাদেরও দিচ্ছেন…"

"সুতরাং কেরানি হতে হবে ?"

"শখ করে পুরুষেও হয় না। আমাদের যখন বেরুতে হয় তখন আরও দায়ে পড়েই তো ? এটুকু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।"

দোলুর দৃষ্টিটা অবাধ্যভাবেই লেজার থেকে একটু উঠে পড়ল। একটু আবদায়ের সুর টেনে এনে মেয়েটি তর্কের সুরটা নরম করে দিয়েছে।

সেকেণ্ড কয়েক দেরি হলো মিস্টার রায়ের, তার পর বললেন, "এমন কি দায়ে পড়েছ তুমি ? ছেলেমানুষই তো দেখছি।"

"দায়টা সেইজন্যেই আরও বেশি, মানে, দায়িত্বের ভারটা। বাবার পড়াবারই শখ ছিল ; যখন আই-এ পড়ি মারা গেলেন। দাদা বললেন, তুই পড়, আমি তো রয়েছি, বাবার একটা ইচ্ছে। তার পর যখন বি-এর রেজাল্টটা বেরুল, তিনিও…"

"থাক্। চাকরি করতেই হবে ? মানে, কিছু রেখে যান নি তাঁরা ?"

"মাকে। বুড়ো হয়েছেন তিনি। আর একটি ছোট ভাই, এইট্থ্ ক্লাশে পড়ছে।''

দৃষ্টি তুলতে একটু মলিন হাসির অবশেষ চোখে পড়ল দোলুর। দৃষ্টিটা একটু তির্যকভাবে মিস্টার রায়ের মুখেও গিয়ে পড়ল। কি ভাবছেন চোখ তুলে। দৃষ্টি নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "পারবে কাজ করতে ?"

"ঠিক করে তো বলতে পারছি না এখন ; কাজ কি-রকম না বুঝে।"

অদ্ভুত উত্তর, কোনও বেটাছেলে হলে দিত না ; সেরকম মেয়েছেলে হলেও নয়। লেজারে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আটকেই রইল ওঁর মুখের ওপর। অল্প একটু হাসি, উত্তরের অভিনবত্বে, তবে চিন্তার ভাবটাই স্পষ্টতর। বেশ একটু চুপচাপও গেল। তার পর বললেন, "যদি না পার, আমায় আবার হাঙ্গাম পোয়াতে হবে তো ? আবার বিজ্ঞাপন দিতে হবে, আবার ইণ্টার-ভিউয়ের জন্যে চিঠি। খরচ আছে, তার পর দেরি।"

মুখটা নামিয়ে নিয়েছিল মেয়েটি। তুলে, কথাটা যাতে ঔদ্ধত্যের মত না শোনায় সেজন্য একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল, "বিজ্ঞাপনের খরচটা আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।"

মিস্টার রায়ও হেসে বললেন, "মন্দ নয়। এ ফেয়ার প্রোপোজাল (**A fair proposal**), কিন্তু হাঙ্গামা ?"

আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল মেয়েটি, বলল, "মেয়ের মতনই তো, দয়া করে-ছিলেন বলে একটা সান্ত্বনা থাকবে বরাবর।"

কলিং বেলের মাথায় পিন্‌টা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলেন মিস্টার রায়, তার পর টিপে দিলেন, আর্দালি এলে বললেন, "নরহরিবাবু।"

এসে উপস্থিত হলেন নরহরিবাবু। মোটা চশমার ওপর দিয়ে একবার দেখে নিলেন মেয়েটিকে।

মিস্টার রায় বললেন, "অ্যাকাউণ্টস্ সেক্‌শনে একজন অ্যাসিস্‌টেণ্টের জন্যে বিজ্ঞাপন ছিল না ? এই মেয়েটি···হ্যাঁ, তুমি দরখাস্ত দিয়েছ তো ?"

শেষের প্রশ্নটা মেয়েটিকে। সে উত্তর করল, "না হলে কোন্ সাহসে আসব বলুন ?"

"কি নাম ?"

"কুমারী স্বর্ণা চৌধুরী।"

মিস্টার রায় নরহরিবাবুর দিকে চাইলেন। উনি চশমার ওপর দিয়ে আর একবার ওর দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, "এসেছে বটে দরখাস্ত। মেয়েছেলের দরখাস্ত বলে আর ইণ্টারভিউয়ে···"

"সে দয়া ওঁর পেয়ে গেছি।"—সতর্কই ছিল মেয়েটি, নরহরিবাবুর কথার ওপরই বলে দিল ওঁর মুখের দিকে চেয়ে।

"কবে ইণ্টারভিউটা রেখেছেন ?" প্রশ্ন করলেন মিস্টার রায়।

একটু সিধা হয়েই লেজার থেকে মুখ তুলে চাইল দোলু। কানের কাছে এত কথা, এত নতুন ধরনের, আর এতক্ষণ ধরে, এর মধ্যে লেজারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকা কেমন যেন ভণ্ডামিও বলে মনে হচ্ছে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। মেয়েটির মুখটা এতক্ষণে একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, এতদূর সামলে নিয়ে এসে ইণ্টারভিউয়ের ঘূর্ণিতে তরী বুঝি বানচাল হয়ে যায়।

ওঁর প্রশ্নের উত্তরে নরহরিবাবু বললেন, "পরশু।"

"ক'জনকে কল্ দিয়েছেন ?"

"পাঁচ জনকে। ইস্যু করব এঁর নামেও চিঠি ?"

তীব্র উৎকণ্ঠায় পাঁশুটে মুখের ওপর চোখ দুটি চক্‌চক্ করছে মেয়েটির। একবার দোলুর মুখের ওপরও দৃষ্টি এসে পড়ল—ভাবটা, যে-কেউ একবার ওর হয়ে একটু বলুক, আর সামলাতে পারছে না।

কি বলতে যাচ্ছিলেন মিস্টার রায়, মেয়েটি বাধা দিল, "কিন্তু..."

"কিছু বলবে।"

"ইণ্টারভিউয়ে ডাকলে—পাঁচজন বেটাছেলে..."

"কিন্তু তাদের সাথে একসঙ্গে তো নেওয়া হচ্ছে না।"

এবার মরীয়া হয়ে ওঠবার একটা হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে, করুণ, সমস্ত বুদ্ধি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জড়ো করে প্রাণপণে যেন শেষ চেষ্টা করছে। বলল, "এক সঙ্গে করলে বরং দয়াটা বজায় থাকত আপনার—কত অসহায় দেখে।"

কি যেন একটু ভাবলেন মিস্টার রায়। নরহরিবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "তা হলে আর কি করবেন ?...বারণ করে চিঠি ইস্যু করে দিন।"

"একা এ-ই ?"—প্রশ্ন করলেন উনি মোটা চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে।

"এরও তো হয়েই গেল। লেটার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা নিয়ে আসুন টাইপ করিয়ে।...তুমি বসো, নিয়ে যাও, কাল থেকে এস তা হলে।"

মেয়েটি চিঠি নিয়ে চলে গেলে কতকটা দোলুকে, কতকটা যেন নিজের মনেই বললেন, "উপায় ছিল না ; সত্যিই বড় যেন অসহায়।"

আজকাল সংযত থাকবারই চেষ্টা করে দোলু, তবে সহানুভূতিটা মেয়েটির দিকেই ছিল বলে মনটা উৎফুল্ল হয়ে জিভ হঠাৎ একটু আলগা হয়ে উঠল, বলল, "আর ওদের মুখের সঙ্গে এঁটে ওঠবারও তো জো নেই।"

একটু চোখ তুলে ভেবেই বেশ সজোরে হেসে উঠলেন মিস্টার রায়। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটার কৌতুকরস ঐ কথা ক'টার সুড়সুড়িতে হঠাৎ দানা বেঁধে উঠেছে মনে। একটু দুলে দুলেই হাসতে হাসতে বললেন, "তা মন্দ বল নি, ঠিক বটে, তা ঠিক বটে..."

॥ তেইশ ॥

সরিতের কাছে বেশিক্ষণ বসল না দোলু, চা শেষ হয়ে যাওয়ার পরই উঠে পড়ল। মনটা অত চড়া থেকে হঠাৎ এত খাদে নেমে আসায় সরিৎও মানা করল না শুধু যাওয়ার সময় বলল, "কী ব্যাপার শীগ্‌গির জানাবি একটু।"

অতিরিক্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে দোলুর মনটা। ও বিস্মিত হয়ে পড়েছে, এটা সম্ভব হলো কি করে—এই সরিতের কথাটা একেবারে এমন করে ভুলে থাকা। আপিসে যাওয়ার ঠিক আগে ওর জন্য পার্টির ব্যবস্থা করার কথা হয়েছিল, কেতকীকে ডাকাই প্রধান উপলক্ষ—আজ দিন-পনেরো হলো যাচ্ছে আপিসে, বসছে একেবারে মিস্টার রায়ের পাশেই, অথচ আজ পর্যন্ত প্রসঙ্গটা তোলবার কথা মনেই পড়ল না ওর! এদিকেও সরিৎই নিত্যসঙ্গী, শিক্ষানবিশীর জন্য আরও বেশি করেই, কত কথা হয়েছে, কিন্তু এ-প্রসঙ্গটা কোনদিনই উঠেছিল কি? উঠলেও নিশ্চয় এত ভাসা ভাসা ভাবে উঠে থাকবে যে, কোন রেখাপাত করতে পারে নি দোলুর মনে, পরের দিন আপিসের সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে নি। আশ্চর্য! সরিতের জীবনের অতবড একটা কথা, দোলুর জীবনে একেবারে নিরর্থক হয়ে গেছে—দোলুর সামনে যে আজ একটা নূতন দিক্‌চক্র গেছে খুলে! আর সে দোলু আছে?

সবচেয়ে সরিতের ঐ কথা কয়টি—"এই সময়টা বড় একঘেয়ে বোধ হয়··· তুই থাকিস না···আর কিছু নয়।"

এই "আর কিছু নয়"—যেন মর্মে গিয়ে বিঁধছে। দিনের এই সময়টা সরিতের কী চিন্তা নিয়ে কাটে, কী যে অসহনীয় সে-চিন্তা, একটা গোটা বই লিখেও তা এর চেয়ে বেশী করে প্রকাশ করা যেত না। বুকটা যেন মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে দোলুর।

বাড়ি ফিরে গিয়ে নিঝুম হয়ে বারান্দায় একলাটি বসে রইল। সন্ধ্যা উতরে গেল। একটা ফোন এল, সরিতেরই। চাকরটাকে বলাই ছিল, সেই জানিয়ে দিল, বাড়ি নেই। যেন ফোনেও ওর কাছে লজ্জা করছে, বলবেই বা কি?

বেশ খানিকটা রাত করেই উঠল নিষ্প্রদীপ বারান্দা থেকে। কাল আপিসে গিয়েই প্রথম কাজ পার্টির কথাটা তোলা মিস্টার রায়ের কাছে। সংকল্পটায়

একটু যে আশ্বাস পেল সেইটুকু সম্বল করে সকাল সকালই আহার সেরে শয্যা আশ্রয় করল।

সকালে সরিতের ফোনের আওয়াজেই ঘুম ভাঙল।…সেই ব্যাপারটা—রাত্রেও ফোন করেছিল, চিন্তিত রয়েছে। দোলু জানাল, বিকেল পর্যন্ত জানতে পারবে। সকালে আসতে বারণ করে দিল, ব্যস্ত থাকবে।

পরদিন তোলা গেল না পার্টির কথা।

ও সময়েই গিয়েছিল। মিস্টার রায় একটু দেরি করে এলেন। বেশ চিন্তিত। চেয়ারে বসেই বেল টিপে আর্দালিকে বললেন, "নরহরিবাবু।" উনি এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন করলেন, "সেই মেয়েটি আসে নি?"

"কৈ, দেখি নি তো।" উত্তর করলেন উনি।

"তা হলে বোধ হয় মত বদলাল।" খুশী কি দুঃখিত, মুখের ভাবে ঠিক বুঝতে পারল না দোলু।

নরহরিবাবু কিছু মন্তব্য করলেন না।

"একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছিলাম—আজকাল সব আপিসেই কিছু কিছু মেয়ে-কেরানী—অবশ্য যদি আসে মেয়েটি। আপনি কি বলেন?"

এমনভাবে চশমার ওপর দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে রইলেন নরহরিবাবু যে, বেশ বোঝা গেল নূতন পরীক্ষার যৌক্তিকতা এবং সফলতা উভয় সম্বন্ধেই যথেষ্ট সংশয় আছে ওঁর। শেষে অবশ্য দৃষ্টি ওঁর দিকে ফিরিয়ে বললেন, "দেখতে দোষ কি?"

"এখন কথা হচ্ছে—কোন্ ডিপার্টমেণ্টে বসাই; এল তো আকাউণ্টস্ সেকশনের বিজ্ঞাপন অ্যানসার (answer) করে।…হিসেবে মাথা কেমন হয় মেয়েদের? কোনও আইডিয়া আছে আপনার?"

একটু দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তরটা খুঁজলেন নরহরিবাবু, তার পর বললেন, "নিজেরটা তো খুব বোঝে দেখছি।"

গম্ভীর পরিবেশে এমনভাবে পড়ল কথাটা যে আপিস-ডিসিপ্লিনের খাতিরে হাসি চাপতে গিয়ে মুখটা রাঙা হয়ে উঠল মিস্টার রায়ের। এই সময় আর্দালি ঢুকে জানাল, কালকের মিস্ সাহেব আসতে চাইছে।

"আনে দেও।"

হুকুম পেয়ে দরজার পাল্লা ঠেলে ধরতে স্বর্ণা নমস্কার করে ভেতরে

এসে দাঁড়াল। লজ্জিতভাবে বলল, "দেরি হয়ে গেল আমার একটু। প্রথম দিন…"

মিস্টার রায় পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, "বসো তুমি, তোমার কথাই হচ্ছিল।…ওর টাইম্‌টা না হয় আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে দিন নরহরিবাবু। গোছগাছ করে দিয়ে আসতে হয়।"

"কাল থেকে সময়েই আসব।"—আর একটু লজ্জিত হয়ে বলল স্বর্ণা।

"চেষ্টা করো।"—আর ওদিকটায় বেশি জোর দিলেন না মিস্টার রায়। বললেন, "আমরা ভাবছিলাম অন্য কথা; অ্যাকাউন্টস্ সেকশনের জন্যে দরখাস্ত দিয়েছ, বি-এ'তে তো ম্যাথেমেটিক্স ছিল?"

একেবারে নূতন প্রশ্ন, তাও নিয়োগপত্র পাওয়ার পর, লেজার থেকে চোখ তুলে দোলু দেখল, মুখটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে স্বর্ণার; একটা ঢোঁক গিলে বলল, "যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগই তো? ঠিক হয়ে যাবে।"

একটু চুপ করে ভাবলেন মিস্টার রায়, তার পর নবহরিবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি বললেন?"

অল্প একটু হাসলেন উনি, স্বর্ণার দিকেই চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে বললেন, "বাড়িতে ধোবার খাতাটা বোধ হয় ওর হাতেই থাকে।"

তবে জিভে এলে বলে দেন, ঐ পর্যন্তই, বিরোধিতা বা কারুর অনিষ্টের দিকে যান না বড একটা। এবার মিস্টার রায়ের দিকেই চেয়ে বললেন, "তবে বাঘ-ভাল্লুকও তো নয়।"

"আমিও সেই কথাই বলি। তা হলে বসুক অ্যাকাউন্ট্‌সেই গিয়ে, বুঝুক কাজের নেচারটা।"

বেল টিপলেন, আর্দালি এসে বললেন, "জনার্দনবাবু।"

এসে দাঁড়ালেন জনার্দনবাবু। উনিও ঐ সময়েরই কর্মচারী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, এখন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগের চার্জে। মিস্টার রায় বললেন, "এর অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা শুনেছেনই; আপনার ওদিকের সেই যে বিজ্ঞাপনটা ছিল। বসুক আপনার চেম্বারে, শিখুক কাজ, তার ওপর কন্‌ফারমেশন্ বা… সে যেমন হয়।"

স্বর্ণার দিকে চেয়ে বললেন, "এই থাক্? তুমিও তো বলছিলে পারবে কি না-পারবে কি করে বলবে এখন।"

স্বর্ণা মাথা কাত্ করে সম্মতি জানাল। মিস্টার রায় আর্দালিকে ডেকে

জনার্দনবাবুর চেম্বারে একটা বাড়তি চেয়ার রেখে আসতে বললেন। সুবর্ণা নমস্কার করে ওদের দুজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

পাইপ ধরিয়ে চেয়ারেই একটু গা এলিয়ে বসলেন মিস্টার রায়। বেশ একটু চিন্তিতই; চুপ করে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন। একটু পরে দোলুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কিরকম মনে হচ্ছে বল এবার।"

আজকাল জিজ্ঞেস করেন ওর মত কখনও কখনও। দোলু প্রশ্ন করল, "এই নতুন এক্সপেরিমেণ্টের কথা জিজ্ঞেস করছেন, না, ক্যান্‌ডিডেটটির (candidate) কথা?"

মিস্টার রায় একটু চাইলেন ওর দিকে, বোধ হয় বিষয়টিকে এইরকম উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার কথাটা ওঁর ভাল লেগে থাকবে। বললেন, "দু-দিক ধরেই বল না।"

দোলু বলল, "মনে হয় আপিসটা একটু মডার্নাইজ (modernise) করা মন্দ হবে না। তবে সেই বব্ করে চুলছাঁটা, রুজ্-মাথা লেডি-ক্লার্ক—সেও আবার..."

"এগ্‌জ্যাক্টলি, ঠিক বলেছ তুমি।" ওর দিকে একটু চেয়েই রইলেন; তার পর বললেন, "সেদিক দিয়ে মেয়েটিকে ভালই বলে মনে হয়। বেশ সোবার (sober), নয় কি?"

"মনে হয় যেন।" সংযত মন্তব্য করল দোলু, মেয়েছেলে বলেই। উনি পাইপ টেনে যেতে লাগলেন চুপ করে, মাঝখানে শুধু একবার মাথাটা দুলিয়ে নিজের মনেই বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।"

॥ চব্বিশ ॥

চমৎকার সুযোগটি হয়েছিল পার্টির কথা তোলবার, কিন্তু হয়ে উঠল না।

চিন্তিতভাবে চুপ করে পাইপ টেনেই যেতে লাগলেন মিস্টার রায়; বেশ বোঝা যায় এই নূতন পরীক্ষার কথাটাই কাল থেকে ওঁর সমস্ত মনটা অধিকার করে রয়েছে। এর পর হঠাৎই হাতঘড়িটা উল্‌টে দেখে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন; বললেন, "ছাখো, ভুলেই গিয়েছিলাম! কার্‌এ করে আমাদের ক'জনকে একবার বাইরে যেতে হবে? ফিরতে দেরি হতে পারে, তোমার জ্যাঠাইমাকে বলে দিও।"

তা হলে আজও আর হলোই না। এমন সম্ভাবনাটা নষ্ট হয়ে গিয়ে দোলুর মনটা যেন মিইয়ে রইল সমস্ত দিন। আজও গেল না সরিৎদের বাড়ি; ওর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারছে না। আপিস থেকে যাওয়ার মুখে ফোনেই জানিয়ে দিল মিস্টার রায়ের কথাটা।

পরদিন মিস্টার রায় আপিসে ঢুকলেন বেশ প্রফুল্ল। থাকবেনই, আশা করেছিল দোলু। কাল ওঁরা ক'জন ডিরেক্টার মিলে বর্ধমানের কাছে গভর্নমেণ্টের খুব একটা বড় কাজ সম্পর্কে গিয়েছিলেন। খুব জোর রেষারেষি চলছিল কাজটার জন্য, আপিসে এসেই খবর পেল রয়-গুপ্টা কোম্পানীই পেয়ে গেছে।

মুখিয়ে রইল, আজ তুলবেই কথাটা, সামান্য একটু সুযোগ পেলেই।

সুযোগটা ভালভাবেই এল। আপিসে ঢুকেই মিস্টার রায় নরহরিবাবুকে ডাকিয়ে পাঠালেন। এসে দাঁড়ালে বললেন, "এরা যে নতুন চেম্বারটা ফিট্ করে দিতে বড় দেরি করছে নরহরিবাবু। সামান্য তো কাজ।"

একটু যেন অধৈর্যভাবেই বললেন। নরহরিবাবু বললেন, "আপনি যে ক'বার রদবদল করলেন। বার-তিনেক বোধ হয়।"

"তা করেছি বটে।" একটু হেসেই মেনে নিলেন মিস্টার রায়, অনুরোধের স্বরেই বললেন, "এবার কিন্তু একটু তাড়া দিন ডেকে।"

নরহরিবাবু চলে গেলে দোলু আর দেরি করল না, একটা ফাইল দেখছিল, মুখ তুলে প্রশ্ন করল, "ও চেম্বারটা তো আপনি সরিতের জন্যেই করাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ কেন বল তো?"

উত্তর পাওয়ার পূর্বেই আবার নিজেই বললেন, "মনে পড়ে গেল। ক'দিন থেকে ভাবছি তোমায় জিজ্ঞেস করব—সরিতের আইডিয়াটা..."

"সেই কথাই আমিও আপনাকে বলব ভাবছি কাল থেকে; ব্যস্ত রয়েছেন, তার পর কাল সমস্ত দিনই বাইরে রইলেন। পরশু রাত্তিরের কথা—সরিৎ আমায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, চেম্বারটার আর কত দেরি..."

"করলে জিজ্ঞেস তোমায়? নিজে হতে?"

এমন বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে করলেন প্রশ্ন যে বেশ বোঝা গেল, উনি যে বাইরে বাইরে একটা ধারণার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, দীর্ঘ প্রবাসের ক্লান্তি বশেই উনি সরিতের না আসাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না, সেটা একটা আবরণ মাত্র। উনি জানেনই, সত্য কথাটা এই যে সে আসতে চাইছে না অন্য কোন কারণে। তবে সে কারণটা কি তা জানেন কিনা সে

সম্বন্ধে পরাশর কাকা বা জ্যাঠাইমা ওঁকে কিছু বলেছেন কিনা সেটা ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এত বেশি কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, একটা বড় কোম্পানীর পলিসি সংরক্ষণ করতে করতে প্রকৃতিটাও এমন চাপা হয়ে পড়েছে যে বোঝাও শক্ত। আজ নাকি মনটা খুব ভালো, তাই এটুকু পর্দা উঠে গেল তার ওপর থেকে।

দোলু উত্তর করল, "তাই তো বললে।"

"ওর জন্যেই করাচ্ছি। তা নিজে এসে একবার দেখেশুনে··· "একটু রাগের দিকেই যাচ্ছিল কথাগুলো, থেমে গিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, তোমায় বলছি।"

নরহরিবাবুকে ডেকে পাঠালেন, এলে বললেন, "কতটা সময় আর লাগবে কিছু আন্দাজ দিয়েছে আপনাকে?"

"কাল বললে, আরও দিন দশ-বারো। চেম্বারটা তো হয়ে যাবে, তবে ফার্নিচার স্পেশ্যাল সেট্ দিতে বলেছেন, তাইতে একটু সময় লাগবে। বর্মা টীক ছিল না বাজারে, সবে একটা কন্‌সাইন্‌মেণ্ট নেমেছে।"

"একটু দিন তাগাদা। আচ্ছা আসুন আপনি।"

উনি চলে গেলে দোলুকে বললেন, "তাগাদা দিয়েও দুটো সপ্তা ধরে রাখা ভাল।"

পাইপ হাতেই রয়েছে। একটু চুপ করে টেনে নিয়ে বললেন, "আমি বলি কি, যখন আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন আসুক-ই না। আমি দিন-চারেকের মধ্যে করিয়ে দিচ্ছি, তার পর ওর জন্যে স্পেশ্যাল সেট্ ধীরেসুস্থে আসবে'খন।

"বেশ, বলব তা হলে।···আসবে'খনই।"

নিজের দিক থেকেও খানিকটা জোর ছিল। ওঁকে এতটা উৎসাহিত হয়ে কিছু আলোচনা করতে কখনও দেখে নি এর আগে, দোলুকে এতটা অন্তরঙ্গতার মধ্যে নিয়ে আসতেও। সংলাপটা ওর প্রস্তাবের দিকে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

উনি বললেন, হ্যাঁ, দরকার। কি জান? শুনেছ বোধ হয় একটা বড় কাজ ধরেছি গভর্নমেণ্টের, কাজের চাপ এসে পড়বে। একজনকে একেবারে এদিকে রেখে দেওয়া দরকার—তাই···"

"সরিৎই বেস্ট ম্যান (Best man)"—এগিয়ে দিল দোলু।

"এগ্‌জ্যাক্টলি। বাইরে থেকে নিয়েও তো এল একটা ট্রেনিং। তুমি ওকে বুঝিয়ে বল। আসুক শীগ্‌গির।"

বুঝিয়ে বলার কথায় যেমন ওঁর মনের ভেতরটা আরও খানিকটা প্রকাশ

হয়ে পড়ল, তেমনি দোলুরও সুযোগটা গেল বেড়ে। বলল, "বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবুঝ তো মোটেই নয়।"

নিজের দিকটাও একটু ঢাকল, অজ্ঞতার ভান করে, খুশীই হবেন নিশ্চয় মিস্টার রায়। বলল, "অবুঝ নয়, তবে আপনার যেমন আন্দাজ, এতদিন বাইরে থেকে একটা অবসাদ…"

চিন্তার মুখেই সামনের দিকে চেয়ে পাইপ-মুখে শুনে যাচ্ছিলেন, ঘুরে প্রশ্ন করলেন, "আর অবসাদ চলবে? তুমি বল বুঝিয়ে।"

দোলু কিছু না বলে একটু সময় নিল। একেবারে কাছে এনে ফেলেছে কথাবার্তা, বুকটা ধক্‌ধক্ করছে। বার-দুই একটু চোখ তুলে দেখেও নিল, বেশ অনুকূলই যাচ্ছে মুখের ভাবটা। করেই দিল আরম্ভ, "আমার একটা কথা ছিল, যদি ঠিক মনে হয় আপনার…"

"বল।" মুখের দিকে ঘুরে চেয়ে বললেন।

"সরিৎ এল বাইরে থেকে, যদি একটা পার্টির ব্যবস্থা করা হতো—আপিসে আসবার আগে—কিম্বা পরেই, আপনি যেমন ভাল মনে করেন।"

সমস্তটুকু এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়ে একটু উদ্বেগ নিয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"পার্টি?"

কথাটা বলে যেন খুব বেশি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মিস্টার রায়। অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই। উনি সামনের দিকে চেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপ টেনে যাচ্ছেন, দোলু ভেতরে ভেতরে ঘেমেই উঠছে, বোধ হয় এত কথার সমস্ত সরসতাটুকু নষ্ট করে ফেলল একটিমাত্র ভুলে। এক সময় যতটা সম্ভব শুধরে নেওয়ার জন্যই বলল, "কথাটা অবশ্য আমারই, আমিই মনে মনে ভেবেছিলাম কিরকম হয় তা হলে। সরিৎ কিছু জানে না।"

একবার সেইরকম অন্যমনস্ক হয়েই চেয়ে নিয়ে আবার পাইপ টেনে যেতে লাগলেন মিস্টার রায়। দারুণ একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে লেজারে বার-দুই কাটাকাটি করল দোলু। কিছুই মাথায় আসছে না।

"ওর ইচ্ছেটা কি জেনেছ?"

দোলু ঘাড় তুলল। ওর কথাগুলো তা হলে কানে যায় নি। বলল "আজ্ঞে তাকে তো জিজ্ঞেস করি নি এখনও।"

"একবার করে নেওয়া দরকার। কি ভাবছে বোঝা যায় না তো।"

একটু যে অনুযোগের স্বর তাই থেকেই দোলুর মনে হল আশঙ্কাটার কোন ভিত্তি নেই। উনি রাজী। ভেতর থেকেই, কিম্বা, একটা প্রস্তাব করা হলো, একেবারে বাতিল করে দিতে চান না, সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। দোলু কিন্তু সরিৎকে জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত আর তুলে রাখতে চাইল না ব্যাপারটা। রাখবার কিছু নেই তো, তার ওপর আরও একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলল, "আপত্তি ওর হবে না আমি জানি। ইয়ে—সেদিন পার্ক সার্কাসের মিস্টার আইচ এইরকম একটা পার্টি দিলেন তো, ওঁর মেয়ে বিলাত থেকে ফেরার জন্যে—আলোচনা হচ্ছিল, তা ওর মতে খারাপ কিছু হয়েছে বলে তো মনে হলো না,বরং যেন…"

—এবার খানিকটা বেশি উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে রইল দোলু, মস্ত বড় একটা চান্স্ নিয়েছে, কেতকীর দিকটাও জানেন কিনা উনি টের পাওয়া যাবে।

কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না ওঁর মুখে, একটা নিতান্ত সাধারণ খবর শোনবার মত করেই পাইপ টানতে টানতে শুনে গেলেন, তার পর নিজের চিন্তাটার কথাই বললেন, "আপত্তির আমিও তো দেখছি না। আমার তো খুবই ভাল লাগছে আইডিয়াটা। তবু একবার কর জিজ্ঞেস।"

আবার একটু চিন্তা করে এবার বেশ উৎসাহিত হয়েই দোলুর দিকে ঘুরে বললেন, বেশ বোঝা যায় শুনে পর্যন্ত একটা প্ল্যানই আঁটছিলেন মনে মনে উনি এবং সেটা ঠিক করেও ফেলেছেন। বললেন, "না, ভালই হয়। আমাদের ফার্মের পক্ষেও ভাল এই স্টেজে। তা হলে ঐ থাক, এত শীগ্‌গির তো হয়েও উঠবে না ব্যবস্থাটা, একটু ভাল করে করতে হলে। চেম্বারটা হয়ে গেলে পার্টির ব্যাপার সেরেই জয়েন্ করুক আফিস, একটা বেশ ইম্‌পেটাসের (impetus) মুখে। আমি দেখছি এদিকটা যত তাড়াতাড়ি হয়।"

এবার খুশির ঝোঁকেই গোটাকতক ভুল করে বসল দোলু লেজারে।

"আর, আমি বলি কি…"

দোলু মুখ তুলে চাইল।

"ও খুঁতখুঁতুনিটুকু রাখবার দরকারই বা কি? সময় আর কোথায়? তুমি না হয় চলেই যাও বাড়ি, ওর মতটা নিয়ে…"

"এখুনি এসে জানাচ্ছি আপনাকে।"

"আর আসবার দরকার কি? ফোনেই জানিয়ে দিও। টেক্ এ হলিডে (Take a holiday) যাও।"

। পঁচিশ ।

মধ্যাহ্নের আহার সেরে ঘুমোচ্ছিল সরিৎ, কড়া নাড়ায় সাড়া দিতে দোলু ব্যস্তভাবে বলে উঠল, "ওঠ, যার বিয়ে তার চাড় নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

দোর খুলে দিয়ে বিস্মিতভাবে চেয়ে সরিৎ বলল, "তিন দিন দেখা নেই, তার পরে একেবারে ··"

"নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলাম তিন দিন। আয়, বোস, চায়ের কথা বলে দে আগে। শীলাকে—অন্য কাউকে নয়—একচোট পেট ভরে ক্ষ্যাপাব।"

সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসতে যাচ্ছে, সরিৎ বলল, "পাগল হয়ে গেল নাকি ছোঁড়া। শীলা তার স্কুলে।"

"আমায় কিছু একটা করতেই হবে যে! ছুটি! মাস্টারমশাই এত খুশী, নিজের মুখেই বললেন, 'টেক্ এ হলিডে'। কিছু একটা না করতে পারলে··· দাঁড়া, হয়েছে!"

উঠে গিয়ে আল্‌না থেকে সরিতের ড্রেসিং গাউনটা টেনে নিয়ে জড়িয়ে নিল গায়ে, বলল, "পীস্ উইথ্ দ্য ড্রেসিং গাউন্ (Peace with the dressing gown)!—কিছু না তো অন্তত এটার সঙ্গে শান্তিস্থাপন করা যাক, বড্ড গাল-মন্দ খেয়েছে। সিগার আছে?"

"সত্যই পাগল হলি নাকি? ব্যাপারখানা কি আগে বলবি তো?"

"পার্টি! পার্টি! হুকুম বের করে নিয়ে এলাম। রাইট্ রয়েল স্টাইলে (Right royal style)। নকল?—ছোঃ! আইচ-কন্যা বরং দেখে যাক এসে পার্টি কাকে বলে। নে, কাগজ-কলম বের কর, প্ল্যানটা ছকে ফেলি।··· দেখেছ, গোড়ায় গলদ, আগে ফোনটা করে দিতে হবে না ভদ্দরলোককে?"

"ভদ্দরলোকটি কে?", প্রশ্ন করল সরিৎ। বিমূঢ় ভাবটা কাটতে চাইছে না।

"জ্যাঠামশাই, আবার কে? চিরকাল একটা বাঘ কি সিংহি মনে করে পাশ কাটিয়ে এসেছি।···দাঁড়া, আসি।"

বেরিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা এই ঘরেই নিয়ে এসে প্লাগ করে দিল, তার পর আবার দরজার কাছে গিয়ে লখাকে চায়ের কথা বলে দিয়ে আপিসের নম্বর ডায়াল করল। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে, রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে

দিয়েই মাউথপীস্‌টা হাত দিয়ে চেপে সরিতের দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, "ভাখো ভুল আবার! রাজি কিনা বলল না এখনও···"

সরিৎ কিছু বলবার আগেই ওদিক থেকে আওয়াজ এল, "হ্যালো!"

"আমি দোলু জ্যাঠামশাই, বাড়ি থেকে ফোন করছি।"

"বললে সরিৎকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বললাম বৈকি।"

"কি বলে? রাজি আছে?"

"রাজি থাকা কি? কেঁদেই ফেললে।"

(সরিৎ চাপা গলায়—"এই হতভাগা! কাঁদছি?")

"কাঁদছে?"—একটু স্নেহকোমল স্বরে প্রশ্ন হলো। "কাঁদবার কি আছে এতে?"

"ঠিক সেভাবে গলা ছেড়ে কান্না নয়তো। বলতেই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরে পড়ল। এসেই একটা অ্যাটিচ্যুড্ (attitude) নিয়ে চুপচাপ বসে আছে, যে জন্যেই হোক্। কিন্তু আপনাদের মনে তো কম কষ্টটা দেয় নি। বলছিল, কত পুণ্যে পেলাম এমন বাপ-মা···"

("এই, এই—এই রাস্কেল!"—হাত ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে সরিৎ।)

"না, না।" একটু স্নেহের হাসির সঙ্গেই ভেসে এল ওদিক থেকে, "বুঝিয়ে বলো, আমরা কেউই নিই নি সেভাবে। একটা অবসাদ এসেই পড়ে। নেমেই কাজে ঢোকা, তার চেয়ে দিনকতক রেস্ট্ নিলে, ভালই হলো। কি করছে?"

"নিজের ঘরে ঐ অবস্থায় দেখে চলে এসেছি ফোন করতে।"

(সরিৎ সেইরকম নিরুপায়ভাবে হাত আছড়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।)

"তুমি গিয়ে বলো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলছি বুঝিয়ে। এ ভাবটা অবশ্য থাকবে না, একটা অন্যায় করে ফেলেছে, লেগেছে খুব মনে তো? হঠাৎ উথলে উঠেছিল মনটা।"

"যাক, বললে রাজি আছে?"

"আজ্ঞে, স্পষ্ট করে কোন্ লজ্জায় আর বলবে রাজি আছে, তবে দেখলাম কাগজ-কলম এনে রাখল টিপয়টার ওপর। একটা প্ল্যান করে ফেলতে হবে তো এবার।"

"বেশ, করে ফেল দুজনে মিলে। একটু তাড়াতাড়ি।"

"হ্যাঁ, শেষ করেই আপনাকে জানাব।"

পরিত্রাহি হাত ছুঁড়ে যাচ্ছিল সরিৎ, দোলু রিসিভার হ্যাঙ্গারে রেখে দিতেই সোজা হয়ে বসে পড়ে বলল, "ইডিয়ট্! একরাশ মিছে কথা বলে গেল!"

"কোন্‌টে মিছে কথা?"—রুখেই দাঁড়াল দোলু।

"কাঁদছিলাম?"

"উচিত ছিল না শুনেই কেঁদে ফেলা? তার পর পাস্ নি এমন বাপ-মা অনেক তপস্যার ফলে? বরং ওঁদের কী পাপে এমন আকাট ছেলে জন্মাল সেইটে ভাববার কথা। অস্বীকার কর, পারিস তো।"

একটু থতমত খেয়ে গেছে সরিৎ, বলল, "আমি অন্য ঘরে রয়েছি?"

"আমিই অন্য ঘরে রয়েছি বললাম না?"

আবার ভাষার প্যাঁচে একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে সরিৎ। ছেড়ে দিয়ে বলল, "আর ঐ যে বললি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছি, তাহা মিছে কথা নয়?"

"তোকে কাগজ-কলম বের করতে বলে অন্য ঘরে গেছি, তুই যে না করে উদোম পাগলের মতন ঘুষি নেড়ে যাচ্ছিস, কি করে টের পাব? কাচের দেয়াল?"

এগিয়ে সোফায় বসতে বসতে বলল, "মেলা বকাস নি, বের কর কাগজ-কলম।"

চা এসে পড়েছে। একরকম নীরবেই শেষ করল দুজনে। একবার শুধু সরিৎ বলল, "কী যে ভাবলেন বাবা!"

"খারাপ কিছু নয়, যা ভাবা উচিত ছিল তাই ভেবেছেন।" উত্তর দিয়ে মুখ বন্ধ করল দোলু। শেষ করে কাগজ-কলম নিয়ে ওরা প্ল্যান করতে বসে গেল। মাঝে দোলু একবার চকিত হয়ে উঠে বলল, "এই ছ্যাখো, আবার ভুল! দাঁড়া জুবিলী ডেকরেটার্সকে এনগেজ করে ফেলি। দেখি ওরা আবার কি ডেট্ দিতে পারে।"

মাখনের সঙ্গে এক সপ্তাহ পরে একটা তারিখ ঠিক করে আবার বসল দুজনে। যখন এদিককার মোটামুটি ঠিক করে নিমন্ত্রণের তালিকাতে হাত দিয়েছে, টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল।

"ছ্যাখ কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন উনি। তবু বলবে তপস্যা করে পাওয়া নয়।"—বলতে বলতে দোলুই গিয়ে ধরল।

"আজ্ঞে, আমি দোলু।"

"রয়-গুপ্টার মিস্টার রায়ের বাড়ি তো এটা ?"

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল দোলুর। নারীকণ্ঠ, আর যেন একটু চেনা। উত্তর করল, হ্যাঁ, আপনার নাম ? কাকে চান ?"

সরিৎও দৃষ্টির ইশারায় প্রশ্ন করল, "কে ? কি ব্যাপার ?" হাতের ইশারায় থামতে বলল দোলু।

ওদিক থেকে উত্তর হলো, "আমার নাম কেতকী আইচ। মিস্টার সরিৎ রায় বাড়ি আছেন ?"

"হ্যাঁ, আছেন। নীচে। ডেকে দোব, না কিছু বলবেন বলে দেওয়ার জন্যে ?"

"ওঁর সঙ্গেই দরকার—বিশেষ দরকার একটু। দয়া করে একবার ডেকে দেবেন ?"

"এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি, একটু ধরে থাকুন।"

"থ্যাংক্স্।"

ফোনটা চেয়ারে রেখে আর একটু সরেই গেল দোলু। সরিৎকে টেনে নিয়ে, চোখ বড় বড় করে চাপা গলায় বলল, "মিস্ আইচ! ব্যাপার কি বল দিকিন ?"

"কাতু ? দেখি দাঁড়া।"

তাড়াতাড়ি এগিয়েই যাচ্ছিল, ধরে ফেলল দোলু, বলল, "নীচে যাব, তার পর তুই আসবি নীচে থেকে। পরামর্শের জন্যে চালাকি-করে একটু সময় নিলাম, তা..."

"হঠাৎ আগেই এসে গেছি।"—বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফোন ধরল সরিৎ।

"কে, মিস্ আইচ ?"

"হ্যাঁ, কেতকী। নামটা ভুলে গেছেন ?"

"কী যে বলেন! ভুলে যাব ? আছেন কেমন ?"

"তবু ভাল। পার্টিতে তো এলেনই না, চিঠি দিয়ে খালাস। কী যে হচ্ছিল মনে আমার! সব এমন বিস্বাদ ঠেকছিল!"

"সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ি। বিশ্বাস করুন, নৈলে আপনার হুকুম অমান্য করতে পারি কখনও ?"

("চালিয়ে যা !"—হাত আর ভ্রূর ইশারায় জানাল দোলু।)

"ঠিক তো ?" প্রশ্ন হলো ওদিক থেকে, "তা হলে এবার নিশ্চয় করবেন না ? কথা দিচ্ছেন তো ?"

"কি ব্যাপার ?"

"শুনুন। আমার এক বন্ধু বিস্ আইকাতের ভাই জাপান যাচ্ছেন একটা আর্ট ট্রেনিং নিতে ; একটা ফেয়ারওয়েল্ পার্টির ব্যবস্থা করছি। সে ধরনের কিছুই নয়—এই জন দশ-বারো নিয়ে একেবারে একটা সিলেক্ট কোম্পানি আমাদেরই বাড়িতে—পরশুই ; ফ্রী আছেন তো ?"

"পরশু ফ্রী আছি কিনা জিজ্ঞেস করছেন ? পার্টিতে যেতে পারব কিনা ?"

দোলুকে শোনাবার জন্যই সমস্ত প্রশ্নটা করে ইশারায় ওর মতটা জানতে চাইল। দোলু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল।

ওদিক থেকে উত্তর এল, "হ্যাঁ, তাই। নয়তো পেছিয়ে দিই দিনটা। ঝিন্তু হদ্দ আর একটা দিন যায় পেছুনো। মিস্টার আইকাৎ তরশুই সেল্ (sail) করছেন।"

"দরকার নেই। আছি ফ্রী আমি।"

"তা হলে ঠিক তো ? এবারে কিন্তু 'আর্-এস্-ভি-পি' নেই।"

"না, ঠিক আছে। নিশ্চিন্দি থাকুন।"

"কার পাঠাব ?"

"কিছু দরকার নেই।"

"পরশু, সন্ধ্যা ছ'টায়। ঠিকানা তো জানাই আছে।"

"হ্যাঁ।"

"নমস্কার।"

"নমস্কার। আছেন কেমন আপনি ?"

"সে কথা আপনিও জিজ্ঞেস করবেন ? আচ্ছা, এখন আসি ; বিস্তর কাজ।"

একেবারে অপ্রত্যাশিত এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়েই আলোচনা হলো। যাওয়া অবশ্য ঠিক, কিন্তু প্রশ্ন হলো—বাড়িতে, বিশেষ করে মিস্টার রায়কে জানানো হবে কিনা। ছোট একটা পার্টি, না জানালেও কিছু আসে-যায় না। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত তা-ই ঠিক করল দুই বন্ধুতে। অনেকদিন পরে মনটা আশ্বস্ত হয়ে এসেছে ওঁদের, ঠিক এই সময় মিস্ আইচ-ঘটিত কিছু না এনে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত। মিস্টার রায়

জানেন না বলেই মনে হয়, কিন্তু বরদাসুন্দরী জানেন, কথাটা বেরিয়ে যেতে পারে।

পরে অবশ্য মিস্ আইচ নিয়েই এদের পার্টি। কিন্তু তখন অনেকের ভিড়ে হারিয়েই থাকবে; যে দুজনের স্বার্থ—দোলু আর সরিৎ—তারাই জানবে শুধু। ওঁদের অলক্ষিতেই নিমন্ত্রণটুকু সেরে আসা ঠিক হলো।

যাওয়ার সময় সলিল, শীলা, জ্যাঠাইমা আরও সবাইকে নিজেদের পার্টির কথা জানিয়ে একটা সাড়া জাগিয়ে বাড়ি চলে গেল দোলু।

॥ ছাব্বিশ ॥

পার্টির দিন ঘণ্টাখানেক আগে আবার ফোন করল মিস্ আইচ। আসছে তো সরিৎ?

গাড়ি-বারান্দার সামনেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, ওর কার্ পৌঁছালে নেমে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সামনেই মোটা কার্পেট বিছানো হলঘর। এটা পেরিয়ে ভেতরের বারান্দার শেষদিকে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল এরা; বেশ একটা বড় ঘরের সামনে উপস্থিত হলো। বাড়ির এদিকে এইটেই শেষ ঘর। সামনে একটা প্রশস্ত গোল বারান্দা, নানারকম ফার্ন আর পাতাবাহারের টব দিয়ে সাজানো। ঘর আর বারান্দা নিয়ে পার্টির জায়গা হয়েছে। ঘরের পেছনের দিকে একটা মাঝারি আকারের অর্ধবৃত্ত ব্যাল্‌কনি; তাতেও কিছু কুশন চেয়ার পাতা রয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিলের ওপর দেশী বিলাতী নানারকম আহার্য সাজানো। হাতে এক-একখানা প্লেট নিয়ে যে-যার ইচ্ছামত তাই থেকে তুলে তুলে গল্প করতে করতে খেয়ে যাচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে জন পনেরো; কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ বা পায়চারি করতে করতে। দোলুর পরামর্শ মত সরিৎ অল্প একটু বিলম্ব করেই এসেছে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে কেতকী নিজেই, একটা প্লেট একটু সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিল। দেরি করে এলে এমনিই দৃষ্টি একটু আলাদা করে পরেই, তার ওপর বিলাত থেকে ফিরতে জাহাজে কেতকীর সঙ্গী ছিল জেনে অনেকেই একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠল ওর সম্বন্ধে। বেশ বোঝা গেল, যে কারণেই হোক, এ কথাটা এতদিন দলের মধ্যে কাউকেও জানায় নি কেতকী। বিশেষ

করে সরিতের মনে হলো, কয়েকজনকে কথাটা বলবার সময় ওর কণ্ঠে একটু যেন দ্বিধা ঠেলে এল এবং যাদের বলল, তারাও হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অবশ্য, মুখে একটু হাসি নিয়ে, হাতের প্লেট তুলে অভিবাদন ঠিক কেতাদুরস্ত ভাবেই করল। দু-একজন আর একটু বাড়িয়ে এও জানাল যে, তারা সরিতের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে, কিন্তু মাঝখানে কী একটা থেকেই গেল যা এত মুক্ত বা এত স্পষ্ট নয়।

একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল প্রথমটা সরিৎ। দোলু যেভাবে মজলিশী, যেখানেই যাক্, অল্পক্ষণেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এ সে ধরনের নয়। বড বড় পার্টিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এইরকম অল্প বাছাবাছা লোকের পার্টিতে, নিতান্ত পরিচিতদের নিয়ে না হলে, ও একটু বিপন্নই বোধ করে। চেষ্টা করে দোলুকেও কোন রকমে ঢুকিয়ে নিতে, সুবিধা না করতে পারলে পরিহারই করে প্রায় একটা ছুতানাতা করে।

আজকের পার্টিটা নিতান্তই নূতন, নানা দিক দিয়েই। প্রথমতঃ একেবারেই মেয়ে-কেন্দ্রিক, আর এমন একটি মেয়েকে নিয়ে যাকে ও ভালবাসে। অন্ততঃ তাই ধারণা ওর। সরিতের ভালবাসা মানে ঐ একটি জাহাজের মধ্যে একেবারে পাশাপাশি থেকে প্রণয়-কূজন। পাঁচজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে ভালবাসা ওর চিন্তায় আসে না। জাহাজ থেকে এই ধারণাই নিয়ে নেমে এসে ঘরের কোণে এই ধারণাই পুষ্ট করছিল, দোলু এসে দিল প্রথম ধাক্কা। সরিৎ বিশ্বাস করে দোলুকে। দুজনে একই পরিবেশে মানুষ, নিতান্ত তেমন কিছু না হলে সবকিছুর যুগ্ম অভিজ্ঞতা দুজনের, তবু সরিতের এ বিশ্বাসটা আছে যে, দোলুর দৃষ্টি ওর চেয়ে ঢের বাস্তব-সন্ধানী। অসীম বিশ্বাস, অসীম নির্ভর ওর ওপরে।

বন্ধুর বিবরণে বিশ্বাস, তার ওপর নিজেরও সংশয়ের দু-একটা কারণ হলো, চিড় খেয়ে যাচ্ছিলই সরিতের ভালবাসা, দোলু অফিসে যেতে শুরু করায় নিঃসঙ্গতার সুযোগে আবার একটু জোড়াতালি লেগে আসছিল, এই সময় পাটির ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল। দোলু পাঠিয়ে দিল—সরিৎ নিজে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসুক। ওর নিজের মোহ—যেটুকু বা সন্দেহের দোলায় দুলছিল, নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সরিতের এতটা নিঃশেষ হওয়া সম্ভব নয়, তবু অনেকটা যাচাইয়ের মন নিয়েই এসেছিল, এখানে এসে দোটানার মধ্যে পড়ে গেল। নেমেই অভ্যর্থনার

আন্তরিকতায় মনে হলো কেতকী জাহাজে পাশের কেবিনের সেই কেতকীই আছে। তার পরেই পরিচয়-প্রসঙ্গে ওর এই সংকোচ, একটু বিব্রতভাব, অপর দিকে দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম প্রশ্ন, ঈর্ষাই—কেমন যেন সুর কেটে কেটে যেতে লাগল সরিতের মনের। একে এরকম পরিবেশে অভ্যস্ত নয়, তার ওপর নানারকমে এই বিশিষ্ট হয়ে পড়া, ভেতার ভেতরে রীতিমত বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল। কেতকী সামলে নিয়েছে নিজেকে, এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়া নিশ্চয় ওর পক্ষে এমন কিছু নূতনও নয়, ওকে পাশে পাশে রেখে পরিচয় দিয়ে গল্প করে বেড়াচ্ছে। একটু না হলে এতগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির নীচে পড়ে সরিতের অবস্থা আরও শোচনীয়ই হয়ে পড়ত। তবু, অন্যদিক দিয়ে, এই ডানার আড়াল, এই আগলে নিয়ে থাকাটাই আবার একটা অস্বস্তি জাগিয়ে তুলেছে। এরকম অবস্থায় কখনও পড়ে নি সরিৎ।

এর পর, ঐরকম উভয়সঙ্কটে পড়ে অবস্থাটা যখন চরমে এসে পৌছেছে, নিতান্ত দৈবযোগেই পেল খানিকটা অব্যাহতি।

কিছু দেরি করে এলেও সরিৎই যে পার্টিতে সবশেষে এসেছে এমন নয়। ও আসার পর আরও দুজন এল মিনিট পাঁচ-সাত পরে পরে। কেতকী সরিতের সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, গাড়ি এসে দাঁড়াতে ওর অনুমতি চেয়ে নিয়ে নেমে গেল এবং সঙ্গে করে নিয়ে এসে ওর সঙ্গে পরিচয় করে দিল। দুজনেই বেটাছেলে। দ্বিতীয় জনের সঙ্গে আলাপ করছে, এই সময় লম্বা হর্ন্ দিয়ে আর একখানি গাড়ি এসে নীচে দাঁড়াল। একটু চকিত হয়ে কান পেতে শুনল কেতকী, কিন্তু এবার আর নেমে না গিয়ে গল্পই করতে লাগল। দ্বিতীয় যুবক, যার সঙ্গে আলাপ করছিল, সে টুকলও, "বাসবীদের কার মনে হচ্ছে", তবু গেল না কেতকী, "ওদেরই তো"—বলে গল্পই করতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই মাঝসিঁড়িতে আওয়াজ উঠল, "আমরা এসে গেছি! তোমাদের এদিকে সব ফুরিয়ে যায় নি তো?" সঙ্গে সঙ্গে জুতো বাজিয়ে ত্বরিতপদে উঠে আসার ধপ্ ধপ্ শব্দও।

ম্যাটিং-পাতা বারান্দা দিয়ে এইরকম হৈ-হৈ করতে করতে একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে এগিয়ে এল, সঙ্গে স্যুট-পরা সাতাশ-আটাশ বছরের একটি যুবক। কেতকী ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, "পাতাগুলো তো থাকেই পড়ে শেষে, তার জন্যে ফেলবার লোকও চাই।...মাফ করবেন মিস্টার দত্ত, অসংসঙ্গে পড়লে দুটো কথা হয়ই শুনতে।"

শেষের কথাগুলো যুবককে লক্ষ্য করে বলে, সরিতের দিকে চেয়ে বলল, "আসল জিনিস থেকে বঞ্চিত করলে তাকে অসৎসঙ্গ বলব না তো কি বলব মিস্টার রায়? বলুন তো।"

এর পর আবার মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই বাসু, ইনি হচ্ছেন···ওকি, তুমি যেন আগে থাকতেই চেন বলে মনে হচ্ছে।"

সেইভাবেই চেয়ে ছিল বাসবী সরিতের দিকে ভ্রূ কুঁচকে, ওকেই প্রশ্ন করল, "সরিৎদা তো? কবে এলে বিলেত থেকে? তুমি এত ফরসা হয়ে গেছ কি করে বল দিকিন? বিলিতী হাওয়ায়?"

"কিন্তু আমি কালো ছিলাম কবে?"—এতক্ষণ পরে এই একটা কথা সহজভাবে বলতে পারল সরিৎ। মন্তব্য করল, "তুইও তো মোটা-ফরসা দুই-ই হয়ে গেছিস; সেইজন্যে আমারও ধোঁকা লেগে গিয়েছিল···"

"ও ক্রেডিটটুকু মিস্টার দত্তর প্রাপ্য মিস্টার রায়।" বাধা দিয়ে বলল কেতকী, "বিয়ের জল বলে একটা কথা আছে জানেন নিশ্চয়!"

"যাদের না হয়েছে এখনও, তারা এত বেশি আশা করে চেয়ে থাকে এটুকুর জন্যে, ফরসা-মোটা হওয়ার লোভে! জানে না তো যে এ-জল দিল্লিকা লাড্ডু।"

পাঁচজনেই হেসে উঠল, কেতকী হাসতে হাসতেই বলল, "এল ঝগড়া করতে!"

"ওমা! এই ত্যাখো, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! ভুগছি—হাবুডুবু খাচ্ছি গভীর জলে—বন্ধু বলে সাবধান করে দিতে গেলাম, উল্‌টে বলে কিনা ঝগড়া করতে এল!"

অত্যন্ত মুখফোড় মেয়ে, হাসির মধ্যে রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে বেশ একটা হুল্লোড় সৃষ্টি করে তুলল। অচিরেই সমস্ত পার্টিটার মধ্যাকর্ষণ হয়ে উঠল বাসবী। একটা যে আড়ষ্ট ভাব ছিল গতানুগতিক আলাপ-সালাপের মধ্যে, সরিৎ আসার পর যেটা ঈর্ষায়-কুতূহলে বেড়েই যাচ্ছিল খানিকটা অংশ নিয়ে, সেটা কেটে গিয়ে হাওয়াটা এ-ধরনের পার্টির উপযোগী বেশ হাল্‌কা হয়ে উঠল।

এতটা যে, সরিৎ, যে খানিকটা মুখচোরাই, তারও ঠাট্টার মুখ একটু গেল খুলে। কেতকী দুটো প্লেটে অল্প করে খাবার সাজিয়ে নিয়ে আসতে বাসবী কোনমতেই নিতে চাইল না। কতকগুলো সাধারণ আপত্তির পরও কেতকী

পীড়াপীড়ি করতে বলল, "বাঃ, এক্ষুণি নিজের মুখেই বললে মোটা হয়ে যাচ্ছি, আবার জোর করে গছাতেও ছাড়বে না ?"

জবাবটা দিল সরিৎই, বলল, "কিন্তু আসল যে দায়ী এর জন্যে তাকে তো ত্যাগ করতে পারছিস না।"

"হ্যাঁ, অথচ হাবুডুবু খাচ্ছেন বললেন তো ?" একজন প্লেট হাতে এগিয়ে এসে টিপ্পনী করল।

হাসিটা গড়িয়ে চলল। একজন পেছন থেকেই প্লেট হাতে গলা তুলে বলল, "সে সমুদ্রের সামনে এটুকু তো পাদ্য-অর্ঘ্য মাত্র।"

ঘুরে চাইল বাসবী স্বামীর দিকে, বলল, "বেশ তো, তা হলে নাও না গো অর্ঘ্যটুকু তুলে, দাও না রেহাই খুশী হয়ে।"

দত্ত উত্তর করল, "তাতে তো আরও খানিকটা ফেঁপেই উঠব ; এমনিতেই বলছ হাবুডুবু খাচ্ছ।"

আবার একটা হাসির তোড় এসে পড়ল।

। আভাশ ।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই ভাবটা ছেয়ে রইল পার্টিতে। আহার, আলাপ, হাসি-মস্করা। এর পর এল সঙ্গীতের পালা। গোটা তিনেক গান হলো, একটা সেতার, একটা গীটার। সবার চাপাচাপিতে কেতকীও বিলাতে শেখা একটা ইংরাজী টিউন্ বাজাল পিয়ানোতে। এর পর একজন কৌতুকাভিনয়ের অবতারণা করে আবার খানিকটা হাসির হররা তুলল এবং তার পরেই পার্টিটা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসতে লাগল। চলে গেল, বিশেষ করে যারা স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে এসেছে তাদের ক'জন। এক দত্ত আর বাসবী ছাড়া ; দত্তর নাম আলোক।

যারা রইল তাদের অধিকাংশই যে কম-বেশী করে কেতকীর উমেদার এ কথাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। ওর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য একটা রেষারেষি পড়ে গেল সবার মধ্যে। কারুর সূক্ষ্ম, কারুর আবার স্থূল, স্পষ্ট।..."আপনার সি-ভয়েজের এক্সপিরিয়েন্সের কথা শোনা হয় নি মিস্ আইচ।"..."গা গোলায় নি ? আশ্চর্য ! দেখতেই যা ডেলিকেট্, ভেতরে

খুব শক্ত তো আপনি!"..."আপনার ওদিককার ইতিহাস একদিন বসে ভাল করে শুনতে হবে।" কবে ফুরসৎ হবে বলুন তো? এত ব্যস্ত রয়েছেন এসে পর্যন্ত, পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে আপনাকে।"..."হ্যাঁ, এইরকম সিলেক্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করা যাক, শুধু এইজন্যেই—আপনার ওখানকার অ্যাকাউন্ট—এবার আমার ওখানে, একটা ভেট্ দিন।"..."হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওখানে, আমার ওখানে—অন্য যে কোনখানে হোক্। বড্ড স্ট্রেন্ পড়ে আপনার ওপর মিস্ আইচ, দেখছি তো, তা যতই শক্ত মনে করুন না নিজেকে।" কারুর কথায় একটু হেসে, কাউকে দুটো মিষ্টি অনুযোগ-আপত্তির কথায় পুরস্কৃত করে, আর সবার মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল কেতকী, বলল, "আমি তো নিজের থিসিস্ (Thesis) লেখা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, দেখলাম আর কোথায় দেশটাকে? যিনি দেখেছেন ভাল করে—মিস্টার রায়, তাঁকে ধরছেন না আপনারা।"

একটু হাসলও সরিতের দিকে চেয়ে।

বাসবী বলল, "তোমার মুখের দুটো কথা শোনা, তার কাছে সরিৎদার মুখে দুশো কথাও যে লাগে না কারুর কানে।"

"আমি ঝগড়ার কথাও শোনাতে পারি বলে দিচ্ছি কিন্তু বাসু।" কপট রাগে চোখ পাকাল কেতকী, তার পর বোধ হয় উপস্থিত ঝোঁকটা সরিতের দিকে বেশি বলে তাকেই সাক্ষী মানল, "দেখুন তো মিস্টার রায়, এসে পর্যন্ত আরম্ভ করেছে!"

"সরিৎদা বলবেন, 'আমি যদি দুটো ঝগড়ার কথাও শুনতে পাই তো বর্তে যাই!' "

"তা হলে তো বোনই রয়েছে বাড়িতে। বসে বসে..."

হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গেল। ঠাট্টাটা এমন ননদ-সম্বন্ধে ধরে ঠাট্টার মত হয়ে পড়েছে যে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। দু-একজন অতশত বুঝতে না পেরে, আর হয়তো কেতকীর ঠাট্টা বলেই সাধ্যমত হাসল, কিন্তু যারা পারল বুঝতে তাদের হাসিটা যেন দাঁতে মিলিয়ে গেল।

আরও বিব্রত হয়ে উঠল কেতকী, বাসবী যখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে দিয়ে বলল, "বোনের ঝগড়া ঝগড়াই, সে তো আর 'দাম্পত্য-কলহের মতন নয় যে..."

"আঃ, বাসু! বড্ড বেড়েছ তুমি!" কপট ক্রোধটা আবার বেশ ভাল করেই অভিনয় করল কেতকী। হাসিটা ওদিকে চলছেই, খাঁটি, নকল যাই

হোক্। একবার সবার ওপর দিয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, "নাঃ, সবাই যখন ওর দিকেই, ওকেই নিয়ে থাকুন, আমি উঠলাম।"

উঠে পড়েই হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর, বলল, "বাঃ, আমার কাজও তো রয়েছে। এই ছাখো!...আপনাকে আমাদের এই নতুন বাড়িটা দেখান হলো না তো মিস্টার রায়।...আর কার কার হয় নি দেখা? আসুন না তা হলে।"

আবার সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে করল প্রশ্নটা। সবার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যে পেরেছেও একটু হাসি টেনে রাখতে তারও যেন মৃতের হাসি। মনে হলো দু-একজনের চেয়ার তবুও যেন নড়ে উঠল, কিন্তু উঠল না কেউই।

বাসবী ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, "আমারও তো দেখা নেই।" যেন উঠে পড়বে এই ধরনের একটু ভঙ্গিও করল। কেতকী বলল, "হ্যাঁ, তোমায় ঘরদোর দেখিয়ে বিপদ ডেকে আনি আর কি!...আসুন মিস্টার রায়।"

ওর বলবার ঢঙে এবার একটু সত্যিকার হাসি হেসে বাঁচল সবাই। সরিতের পা যেন উঠতে চায় না, তবু এই আসর থেকে খানিকটা নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল।

বিলোল মিত্র নূতন ব্যারিস্টার; একজন বড় ব্যারিস্টারের ছেলেও। ওর মনোযোগ আকর্ষণ করবার পদ্ধতি খানিকটা আলাদা। একটা নির্লিপ্ততার পোজ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একটু হেলে পায়ের ওপর পা তুলে। চেন্ স্মোকার (chain smoker), অর্থাৎ ধূমপানে বিরতি নেই এবং তা সিগারেটই, আর অনেকের মত চুরুট ধরে কেতকীর সাকরেদিটা মেনে নেয় নি। কথা বলে অল্প এবং সাধ্যমত দামী করে তোলবার চেষ্টা করে। বলবার সময়ও ঠোঁট থেকে সিগারেট নামায় না, নামায়ও তো কচিৎ একটু-আধটু।

ওরা দুজনে ফিরে আসবার পর আরও কয়েকজন একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল, বাকি রইল সরিৎ, বিলোল, আলোক আর বাসবী। আজকের পার্টিটা জমেছিল মন্দ নয়, তবে শেষ হয়ে গেল বড় তাড়াতাড়ি। অবশ্য হওয়ার কথাই, যেমন করে আজ ঈর্ষাটা ফেনিয়ে উঠেছিল নূতন করে। তবে কেতকীর তো তাইতেই জয়, সবাই চলে গেলে অনুযোগের স্বরে বলল, "বাঃ আজ জেনে-শুনেই একেবারে সিলেক্ট পার্টির ব্যবস্থা করলাম, কারুর হুড়োহুড়ি থাকবে না, তা আজই সবার পালাবার তাড়া পড়ে গেল!...নাঃ, আপনাদের তা বলে এখন উঠতে দিচ্ছি না—কোনমতেই নয়।...দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করছি তার —পালান কেমন করে পালাবেন।"

উঠে পড়ে গট্‌গট্‌ করে চলল সিঁড়ির দিকে।

সরিৎ কিছু বুঝল না। বিলোল হেলান দিয়ে সিগারেটই টেনে যেতে লাগল। বাসবী ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবছিল, কেতকী যখন নীচের বারান্দায় নেমে গেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে বলল, "আমারটাও পাঠিয়ে দিও না যেন, আমায় এক জায়গায় ঘুরে যেতে হবে।"

বিলোল গোড়া থেকেই বুঝেছে। বাসবী ফিরে এসে সরিৎকে বলল, "তোমাদের গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিতে গেল।"

ততক্ষণে দুখানা গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজও এসে পড়েছে, সরিৎ অল্প একটু হাসির সঙ্গে কতকটা বিমূঢ়ভাবেই বলল, "তার পর?"

"তার পর আর কি?" উত্তর করল বাসবী, "আটকে রাখল, নিজের গাড়িতে পাঠিয়ে দেবে।"

একটু দুষ্টু হাসি মুখে করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল কেতকী। বিলোল গম্ভীরভাবে বলল, "আমি মিস্টার রায়কে কন্‌গ্র্যাচুলেট করি।"

"হঠাৎ!" ওর কথার মধ্যে কিছু থাকে বলেই প্রশ্ন করল কেতকী; না বসে ভ্রূ কুঁচকে মুখের দিকে চেয়েও রইল।

ঘাড় উল্‌টে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা আবার ঠোঁটের কোণে চেপে বিলোল বলল, "একটু ভেবে দেখুন না; বলব, আবার আমাকেই টীকাও করতে হবে?"

একটু চোখ ঘুরিয়ে ভাবল কেতকী, বলল, "না, হার মানলাম।"

"আই ডাব্‌লি কন্‌গ্র্যাচুলেট মিস্টার রায়!" (আমি মিস্টার রায়কে দ্বিগুণ অভিনন্দিত করি)।

ঠিক সরিতের দিকে চেয়ে নয়, ঘাড়টা বিলাতী কায়দায় ওর দিকে একটু ঝুঁকিয়ে বলল, "এইজন্যে যে, উনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন, আজ মেট্রোতে অ্যাডভান্স টিকিট কিনে রাখবার আদেশ হয়েছিল এ অধীনকে।"

মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল কেতকীর। একটু চঞ্চলভাবে চোখ ঘুরিয়ে কি যেন ভাবল, তার পর অভিমানের স্বরে বলল, "না, আমি আপনার উপর রাগ করেছি—ভীষণ রাগ করেছি মিস্টার মিটার। একটু মনে করিয়ে দিতে হয়।"

"দ্যাট্‌ উড বি ইন্‌জাস্‌টিস্‌ টু মিস্টার রায়। (সেটা মিস্টার রায়ের প্রতি অবিচার করা হতো)।"

কেতকী ঘাড় উল্‌টে ঘড়িটা দেখে নিল। বলল, "অবিশ্যি এখনও সময় আছে, নিউজ রীল বাদ দিয়ে প্রায় পঁচিশ মিনিট। কিন্তু—কিন্তু মিস্টার রায়কে বালিগঞ্জে সেই সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কাছে নামিয়ে এসে—ট্রাফিক কন্‌ট্রোল আছে—নাঃ, সত্যিই এত রাগ হচ্ছে আপনার ওপর!—গাড়ি দুটো সরিয়ে দেওয়ার আগেও তো বলে…"

"ডোণ্ট্ বি ক্রস্ উইথ মি (আমার ওপর বিরক্ত হবেন না)। আমি প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি। (আবার ঘাড়টা সরিতের দিকে সেইভাবে একটু ঝুঁকিয়ে) অ্যাণ্ড মিস্টার রয় উইল বি থ্যাঙ্কফুল টু মি (আর তার জন্যে মিস্টার রায় আমার প্রতি কৃতজ্ঞই থাকবেন)। আমার বাড়ি তো রাস্তাতেই পড়ছে। আপনি আমায় নামিয়ে দিয়ে ওঁকে নিয়ে চলে যান—টিকিটটা সারেণ্ডার (surrender) করছি—অ্যাণ্ড্ উইথ্ কম্প্লিমেণ্ট টু মিস্টার রয় (আর মিস্টার রায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েই)।"

। আটাশ ।

বাসবী ঘাড় হেঁট করে শুনছিল, অমন যে হাসি-হাসি ভাব, সেটা গেছে। মাঝে বার দুই আড়ে চোখ তুলে দেখেও নিয়েছে বিলোলকে, বলল, "থ্যাংক্‌সের লোভ আমারও হচ্ছে বাসু, তোমার আর মিস্টার মিটার—একসঙ্গে দুজনের কাছে।"

কেতকী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে, বিলোল গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, "ওয়েল?" (অর্থাৎ?)

"আপনার মতন এত কাণ্ড করেও নয়—" উত্তর করল বাসবী। "আমার গাড়ি তো রয়েছে। ঠিক করেই ছিলাম সরিৎদাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে, বিলেত থেকে ফিরেছেন পর্যন্ত দেখা হয় নি কারুর সঙ্গে, মাঝখান থেকে আপনাদের জোড়টা আর ভাঙতে হলো না। কি, প্রাপ্য নয় আমার দু-দিক থেকে থ্যাংক্‌স্?"

"আমার প্রাপ্যটা কিন্তু নষ্ট করলেন তো?" বিলোল মন্তব্য করল।

"কী বলছেন! কে একটু মুখের কথায় থ্যাংক্‌স্ দিত, তার জায়গায় পুরোপুরি কেতকীকে পেয়ে যাচ্ছেন!"

এর পরেই সরিতের দিকে চেয়ে বলল, "তা হলে চল সরিৎদা, আর দেরি করে কি হবে ?"

একে দোটানার মধ্যে পড়ে গেছে, তার ওপর বাসবীর মিষ্টি মিষ্টি কথা, কেতকীর মুখে কোন উত্তরই জোগাল না। "তা হলে আসা যাক আজকের মতন।"—বলে সরিৎ দুজনকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতে ও-ও দাঁড়িয়ে পড়ল, বিলোলের দিকে চেয়ে বলল, "এক মিনিট মিস্টার মিটার, এঁদের তুলে দিয়ে এক্ষুনি আসছি। গাড়িটাও বের করতে বলে আসি।"

নীচের বারান্দায় এসে একটু অনুযোগের কণ্ঠেই বলল, "একটুও আগে যদি মিস্টার মিটার মনে করিয়ে দেন!"

বাসবী বলল, "তা হলে আরও আগে ছেড়ে দিতে হতো সরিৎদাকে।"

"একেবারেই তা হলে না বলা উচিত ছিল—" কেতকী বলল। "ভেবেছিলাম এতক্ষণে মিস্টার রায়কে একটু পাওয়া গেল।"

"এ বেশ তো দুজনকে খানিক খানিক পেলে!" হেসে বলল বাসবী। সামান্য একটু থেমে বলল, "দু নৌকোয় পা দিলে এর চেয়ে বেশি তো আশাও করা যায় না।"

তার পর আর একটু ভেবে নিয়ে নরমও করে দিয়ে বলল, "ওদিকে সিনেমা, এদিকে পার্টি।"

মোটরটা বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লে আলোক বলল, "বড্ড কড়া করে ফেললে তুমি; বিলোলের প্রতি, আবার এখন মিস্ আইচের প্রতিও।"

"থাম তুমি বাপু!" একটু ধমক দিয়েই উঠল বাসবী, ভাবটা খুব থমথমে। বলল, "বিলোলের অভদ্রতাটা একেবারে ধরছ না! আমার তো ইচ্ছে করছিল তখন—এখনই স্টাইল ঠাণ্ডা করে দিই। জেনেশুনে এতটা পেজোমি! আর কেতকী? প্রবাদটা দু-নৌকোই নিয়ে তাই দু-নৌকো বলতে হলো, নইলে ক'টা নৌকোকে যে ও—কী বলি—হিম্‌সিম্ খাওয়াচ্ছেই বলা যাক্…"

পেছনকার সীটে তিনজনে পাশাপাশি বসে আছে, চুপ করে গিয়ে সরিতের দিকে চেয়ে বলল, "তা সরিৎদা, তুমি ওদের খপ্পরে পড়লে কি করে?"

বাসবী আসতে সরিৎ মাঝে একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল, তার পর আবার টানাটানির মধ্যে পড়ে, আর, সব দেখেশুনেও বেশ খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে পড়েছিল, এখন আবার খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে।

বলল, "মিস্ আইচ তোদের ও-কথাটা বলে নি বটে, এসেই তুই যেমন আরম্ভ করলি। মিস্ আইচের সঙ্গে আমার পরিচয় জাহাজে। একসঙ্গেই এলাম কিনা।"

"তার পর ?" খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করল বাসবী।

"তার পর আর কি ?" বেশ সহজভাবে হাসবার চেষ্টা করে উত্তর করল সরিৎ, "তার পর এই পার্টিতে ইন্‌ভাইট্ করেছিল।"

"ব্যস, আমার কথাটি ফুরুল, নটে শাকটি মুড়ুল—এই তো ?" মুখের ওপর সেই সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে রেখেই মাথা নেড়ে বলল, "নাঃ, অত সোজা বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু। আমায় ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। যাই হোক, সাবধান থেকো বাপু।"

"কি অসাবধানটা দেখলি আমায় ? তুমিও তো ছিলে আলোক, বল না!"

বাসবীই উত্তর করল, "ঐ না দেখতে পাওয়াই তো সর্বনাশের গোড়া। আর উনি ? সুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, টের পেলেও বলবেন নাকি ? ওঁর নিজের কথাই বলুন না আগে।"

আলোক বলল, "এই তো, মাতালকে তুমিও সাক্ষী মানছ।"

"বটে!" ঘুরে চাইল বাসবী, বলল, "তা সে কথা আমি মানছি। মাতাল একদিন মেতে ছিলেন বলেই মানতে হয় সাক্ষী।···সে কথা বোধ হয় জান না সরিৎদা ?"

"জেনে লাভটা কি সরিৎদার ? তুমি যদি এখন একরাশ মিথ্যে কথা বলে বীরাঙ্গনা সাজতে যাও।"—মিটিমিটি হাসতে লাগল আলোক কথাটা বলে।

"লাভ নেই ? আর, মিথ্যে বলছি আমি ?···শোন সরিৎদা···"

একটু বাধা পড়ল। গাড়িটা ভবানীপুর পেরিয়ে হাজরা রোডের মোড় নিয়েছে আলিপুর যাওয়ার জন্য, বাসবী ব্যস্তভাবে ড্রাইভারকে বলে উঠল, "না, না, বাড়ি নয়, বালিগঞ্জ ; ব্যাক্ করে নাও।"

সরিৎকে বলল, "তোমাদের বাড়িই যাই চল সরিৎদা, এসেছি পর্যন্ত দেখা করতে পারি নি কারুর সঙ্গে।"

"সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।"—ভিড়ে ব্যাক্ না করিয়ে সোজা বেরিয়ে গিয়ে বাঁয়ে একটা রাস্তায় ঢুকল ড্রাইভার। বাসবী বলল, "হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম ?"

"নিজের বীরত্বের কাহিনী।" আলোকই দিল যুগিয়ে।

ওর দিক থেকে একটু দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে হাসল বাসবী, সরিৎকে বলল, "শোন সরিৎদা, কত দিন ধরে এঁকেও যে ঝুলিয়ে রেখেছিল···"

"ফাঁসিতে।" তির্যক চেয়ে টিপ্পনী করল আলোক।

"ফাঁসিতে কি নাগরদোলায় তা বোঝবার ক্ষমতা রেখেছিল? আমি এসে উদ্ধার করলাম, তা যশ দেওয়া দূরে থাক, উল্‌টে ঐ তো শুনছ।"

"যশ কার সরিৎদা? যাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছে দুজনের মধ্যে, না, যারা করছে কাড়াকাড়ি?"

"যশস্বীর কথাটা আপাততঃ ছেড়ে তুমি গরীবের কথাটাই আগে শোন সরিৎদা। যেমন এগুতে দিচ্ছেন না, তা থেকেই বুঝতে পারছ গলদটা কোন্ দিকে। কেতুকে আমি আজই দেখছি না। অনেক গুণ, কিন্তু এক দোষেই সব নষ্ট করে দিয়েছে। তুমি বড় ভাই, খুব বেশি বলা চলে না—ওর এখন একটা অ্যাম্‌বিশন এই দাঁড়িয়েছে—আশায় আশায় ওর দিকে মুখ তুলে একটি দল ওকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকুক। বিলেত থেকে ফিরে ওর এই দোষটা যেন আরও গেছে বেড়ে, যে ভাবেই হোক, আকর্ষণটা আরও বেড়েই গেছে তো। এই চলুক, এর পর কি তা ঐ দলটির কেউ জানে না; কখনও একে তুলে ওকে নামাচ্ছে, কখনও আবার ওকে তুলে একে। খানিকটা হয়তো পেরেছও বুঝতে তুমি। আমার ওপর যে খুশী নয় সেটা তুমি অভ্যর্থনা থেকেই টের পেয়ে থাকবে। অনেক দিনের ভাব, না বলেও পারে না, আমিও পারি না, না এসে—সত্যি কথা বলতে কি, খোঁচা দিয়ে আনন্দও পাই, তার নমুনাও দেখলে দু-একটা। ওর প্রতি কেমন একটা দয়াও হয়, খোঁচা খেয়েও যদি চোখ খোলে, কিম্বা ওদের চোখ খুলে গিয়ে যদি একে একে খসে পড়ে আসর হালকা করে···"

"এই পলিসিটায় আমি খুব সায় দিই। এই করে সবাইকে তাড়িয়ে দাদাকে দাও বরাসনে বসিয়ে। ব্যস্!"

এমন কপট উৎসাহের সঙ্গে চোখ বড বড় করে বলে উঠল আলোক যে ওরা দুজনেই উঠল হেসে।

তার পর গম্ভীরই হয়ে উঠল বাসবী আবার। বলল, "তাও না হয় করা যেত চেষ্টা, এমনি দেখতে গেলে মন্দ কি? কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, এ নেশা বিয়ের পরেও কাটে না—কিছুই নয়, শুধু এই স্তাবকমণ্ডলী তাদের স্তব নিয়ে ঘিরে থাকুক।"

"আমি আর করি স্তব?"

এবার একেবারে ডাক ছেড়ে হেসে উঠল দুজনে। বাসবী ঘাড় উল্টে দিয়ে বলল, "কী জ্বালা বাপু! কথা এগুতে দেবে না কোন মতে!" পরে ওর দিকেই চেয়ে বলল, "তুমি করতে পার না তার কারণ…"

"অন্য একজনকে স্তব করতেই ফুরিয়ে যায় সব আজকাল।"

চাপা হাসিতে দুজনে দুলে দুলে উঠল, বাসবী তারই মধ্যে বলল, "ওগো, একটু চুপ করে বসো ; এটা রাস্তা।"

গাড়ি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে প্রবেশ করে এগিয়ে চলেছে। যেন ওর মুখের ভয়েই বাসবী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে সামলে নিয়ে, আবার গম্ভীর হয়েই বলল, "সরিৎদা সেটা পারবেন না বরদাস্ত করতে ; উচিতও নয় তো পারা। তা ভিন্ন আরও একটা কথা আছে। সেটা খুব বড় কথা। একটু শোন দয়া করে, সরিৎদাকেও বলছি। শেষ পর্যন্ত জিতবে ঐ বিলোল। ঐ নির্লিপ্ত ভাব, দেখলে না? স্বচ্ছন্দে মেট্রোর টিকিটটা পর্যন্ত তোমায় অফার (offer) করে সরে দাঁড়াতে চাইল। দেখলে না কেতকী একেবারে কিরকম নার্ভাস হয়ে পড়ল? ঐ অবহেলার ভাব ভেতরে ভেতরে যে কী সর্বনেশে তা তোমরা বোঝ না।"

"আমি বুঝি না!" আলোক প্রশ্ন করল চোখ বড় বড় করে

"বড়াই থাক্।"

"ঐ ভাব দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে আমার সর্বনাশ করলে, এখন বলছ আমি বুঝি না!"

আবার একটা হাসি। গাড়িটা এসে পড়েছে। সরিতের ঘরটা খোলা, আলো জ্বলছে। ওদের দুজনকে নিয়ে সোজা গোল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সরিৎ।

॥ ঊনত্রিশ ॥

দোলু একটা সোফায় হেলান দিয়ে সলিলকে হাত সাফাইয়ের খেলা শেখাচ্ছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে উঠে এল। চারজনে এসে বসল ঘরে। সলিল উঠে গেল।

চেনে না দুজনকে দোলু, একটু প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে সরিৎ পরিচয় করে

দিল। প্রথমে বাসবীকেই। বলল, "আমার পিসতুতো বোন বাসবী দত্ত; এই মিস্টার আলোক দত্ত। আলিপুরে বাড়ি। মাঝে অনেকদিন ছিল না। আলোকের ট্রান্সফারেবল্ সার্ভিস (Transferable Service); আবার জ্বালাতে এসেছে আমায়।"

ভাষাটা কিরকম একটু হয়ে যেতে তাড়াতাড়ি আলোকের দিকে চেয়ে বলল, "বাসবীর কথা বলছি ভাই, তোমার নয়। তুমি থ্রাইস্ ওয়েলকাম্ (Thrice welcome)।"

"আমার জ্বালাবার ক্ষমতাই বা কোথায়? নিজেই জ্বলছি সর্বক্ষণ।"

বাসবীর দিকে চকিতে একনজর চেয়ে নিয়ে এমন মুখটা করুণ করে বলল, তিনজনেই উঠল হেসে। বাসবী বলল, "হলো আরম্ভ!"

"আমি যাই ভেতরে সরিৎদা, যতটুকু এ জ্বালা থেকে পারি বাঁচাতে। হ্যাঁ, এঁর পরিচয় তো কই দিলে না।"

একবার স্বামীর দিকে চোখের কোণে চেয়ে নিয়ে বলল, "যা পদে পদে বিঘ্ন, লোকের মনে থাকবে তবে তো!"

সরিৎ বলল, "আমার বিশেষ বন্ধু দোলু, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে স্কুল, কলেজ—আমাদেরই অফিসে বাবা ঢুকিয়েছেন, সুতরাং ভবিষ্যতেও আশা করি একসঙ্গেই কাটবে। তুই দেখে থাকতে পারিস এ বাড়িতে, হয়তো পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি বলে অতটা মনে নেই।"

একটু উচ্ছ্বসিত হয়েই দিল পরিচয়টা। বাসবী একটু অন্যমনস্ক হয়েই শুনছিল, বার দুই-তিন দৃষ্টিটাও এসে পড়েছে দোলুর মুখের ওপর, একটু অন্যমনস্ক হয়েই বলল, "হয়তো থাকব দেখে, যখন এতদিনের বন্ধু তোমার।... আচ্ছা, যাই ভেতরে আমি।"

"চল্ তোকে দিয়ে আসি। সলিলটা যে চলে গেল কেন! এত মানুষ এভয়েড্ (avoid) করে!...দু-মিনিট আলোক, এখুনি আসছি।"

বারান্দার একেবারে ওদিকে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "যা, আবার পৌঁছে দোব কি?...একটা কথা বাসু, পার্টিতে গিয়েছিলাম বাড়িতে কেউ জানে না। পরে সব শুনবিখন।"

একটু বিস্ময়াহতই হলো বাসবী; যেন একটু বেদনাহতও। সেকেণ্ড কয়েক কোন কথাই যোগাল না মুখে, তার পর সরিতের চোখে চোখ তুলে বলল, "সাবধানে থেকো কিন্তু সরিৎদা। আমি বলি, আর না এগুনোই ভাল।"

ঘুরে সিঁড়িতে পা দিল। সরিৎ ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "শীলা, বাসবী এসেছে রে! নিয়ে যা মা-র কাছে। আমার ঘরে আলোক তো রয়েছে; চা-টা পাঠিয়ে দে।"

পার্টি নিয়ে কোন কথা হলো না। সরিৎ তুলল না দেখে দোলুও কোন প্রশ্ন করে নি গোড়ায়, তার পর ফেরবার সময় দোলুকে সামনাসামনি পেয়ে দরজার কাছ থেকে দোলুকে চোখ টিপে দিল সরিৎ। একবার আলোক অবশ্য তুলতে যাচ্ছিল কথাটা, ওর ট্যুরিং ডিউটি, ঘুরে বেড়াতে হয়, আজ পার্টিতে দেখা না হলে কবে যে হতো, দোলুই ঘুরে বেড়াবার সূত্রটা ধরে কথাটা ঘুরিয়ে দিল। কত দিনের চাকরি? কোন্ কোন্ জায়গা দেখল? কি রকম জায়গা সব? লম্বা কাহিনী, শাখাপ্রশাখা বের হতে হতে আপনিই অনেকক্ষণ পর্যন্ত এগিয়ে চলল। পার্টির দিকটা একেবারে চাপা পড়ে গেল।

লখার হাতে চায়ের প্লেট দিয়ে, নিজে এক প্লেট খাবার হাতে করে এল শীলা। দোরের কাছ থেকেই অনুযোগ করল, "ভুলে গেছেন আলোকদা আমাদের একেবারে!"

"ভুললে এলাম কি করে?" একটা সাধারণ উত্তরই দিল আলোক, তার পর প্লেটের দিকে চেয়ে বলল, "কিন্তু না না, খাবার আমার মোটেই চলবে না, এখুনি পার্টি থেকে এক প্লেট খেয়ে আসছি। না বিশ্বাস হয়..."

"শীলার দুষ্টুমি ছ্যাখ সরিৎ!"—দোলু সতর্কই ছিল, কথাটা খপ্ করে চাপা দিয়ে দিল, বলল, "আনলেই যখন, দুটো প্লেট আনা উচিত ছিল তো।"

"তুমি না এই মা-র কাছে বসে খেয়ে এলে?" প্লেট না নামিয়েই বলল শীলা।

দোলু বলল, "নিয়ে এলে আমিও সেই কথাটুকুই ভদ্রতা করে বলতাম, কেমন শুনতে হতো, তা তোর সইবে?"

সঙ্গে সঙ্গে আলোকের দিকে চেয়ে বলল, "কাজ নেই এদের সঙ্গে ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা মশাই। আপনার ছিল পার্টি, আমার এখানেই একবার হয়ে গেছে, আধাআধি করে তুলে নিই আসুন। লখা একটা প্লেট নিয়ে আয়।"

"দিলাম আমি! নিয়ে যাব ফিরিয়ে আদ্দেকটা।"

"মা-র কাছে খেতে দেখি নি বলে ধরে নিতে হবে যে তুই না খেয়েই আছিস?"

"তোরা থাম্ দিকিন্—" অধৈর্য প্রকাশ করল সরিৎ, বলল, "দুটোতে যদি

একটু একত্র হয়েছে, অমনি···তুই বরং যা শীলা, আমি চা ঢেলে নিচ্ছি, বাসু এদ্দিন পরে এল···”

“আমিই দিচ্ছি ঢেলে। না খোঁচা দিলে কি বলতে দেখেছ আমায়? আমিই দিচ্ছি। নইলে আলোকদা এতদিন পরে এলেন, মুখে না বললেও হয়তো মনে করবেন···”

“শীলার এ কথাটুকু আপনি তা বলে যেন খোঁচা বলে ধরবেন না আলোকবাবু।”

চা ঢালতে ঢালতে শীলা থেমে গেল, সরিতের দিকে চেয়ে বলল, “দেখলে তো ঝগড়া লাগাবার মতলব?”

হেঁট হয়ে চাটুকু ঢেলে নিঃশব্দে আলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “এ জায়গায় তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা!”

টি-পট্‌টা রেখে হন্‌হনিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুই বন্ধুতে মুখ চাওয়াচায়ি করল। পার্টির কথাটা তো খুব সন্তর্পণে এখন পর্যন্ত যাচ্ছে সামলে বাজে কথা এনে ফেলে।

ও চলে গেলে দোলু একটু হাসি ঠোঁটে করে আর দুটো কাপ ভর্তি করছিল, আলোক বলল, “একটুও বদলায় নি শীলা।”

দোলু নিজের কাপটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বলল, “বদলালে আমার এখানে আসার আদ্দেক অ্যাট্র্যাক্‌শন (attraction) নষ্ট হয়ে যাবে। বেশ লাগে ক্ষ্যাপাতে।” হাসতে লাগল।

দুই বন্ধুতেই একটু অন্যমনস্ক, যদিও সরিৎ আবার তার মধ্যে বেশি। কথাটা হচ্ছে, পার্টির প্রসঙ্গটা এখন পর্যন্ত সামলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বেরিয়ে পড়বার বিপদ তো এখনও পুরো। আলোক এতদিন পরে এল, জামাই মানুষ, তাকে একবার ভেতরে নিয়ে যেতে তো হবেই; যতক্ষণ না হচ্ছে, অন্যায়ই হচ্ছে। বাসবীকে কথাটা তুলতে বারণ করে দিয়েছে সরিৎ, কিন্তু একে করা তো চলবে না।

শীলাকে সরিয়ে দেওয়ার ফিকিরে অন্তত বেশ জমেছিল কিছুক্ষণ। আবার বাতাসটা ভারি হয়ে আসছে। অস্বস্তি বোধ করছে আলোকও। খুব বেশী দিন বিবাহ হয় নি, সুতরাং নিজে হতে যেতে পারছে না ভেতরে, অথচ এসেছে যখন, একবার দেখা করাও দরকার। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে যখন একটা ইঙ্গিতের আশ্রয় নিল, তখন সরিতেরও আর কোন উপায় রইল না—

আলোক চায়ে চুমুক দিতে দিতেই একবার একটু যেন প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে প্রশ্ন করল, "তা মাসীমা—এঁরা সব আছেন কেমন ? একবার..."

বোধ হয় প্রণাম করে আসার কথাটাই ঠোঁটে এসেছিল, দরকার তো কর্তব্য হিসাবে, চেপে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হলো উত্তর সরিৎকে, বলল, "আছেন তো ভালই। তুমি একবার দেখা করে যাবে তো ? নইলে দুঃখ করবেন। দাঁড়াও, চাটুকু শেষ করে নিই।"

শেষ করে উঠতে যাচ্ছিল, একটু ত্রস্তপদেই বাসবী শীলার একটা হাত নিজের কোঁকের কাছে চেপে টানতে টানতে এসে উপস্থিত হলো। বারান্দা থেকেই আলোককে উদ্দেশ করে বলতে বলতে এল, "ওগো শুনছ ? পরের ভুল ধরে ব্যাখ্যানা করছি, এদিকে নিজেদের ভুলের কি হবে ? মা, ঠাকুরঝি—কেউই বাড়িতে নেই, ভাঁড়ারের চাবি আমার কাছে, যাব তবে রান্নার ব্যবস্থা হবে।... চল, ওঠো। মাসীমা তোমায় গিয়ে দেখা করে আসবার কথা বলছিলেন, আমি আজকের ছুটি নিয়ে এলাম।...শীলাকেও আজকের রাত্তিরটার জন্যে চেয়ে নিলাম সরিৎদা ; কাল আমরা দুজনে এসে দিয়ে যাব, রবিবার আছে। মাসীমার সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে ওঁর। তোমাকেও বলে যাচ্ছি।"

শীলার যাওয়ার কথায় একটু শঙ্কাই ফুটে উঠেছিল সরিতের মুখে—পার্টির কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই, এটুকু বাসবী সূক্ষ্ম চোখের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে, বেশ সহজভাবেই বলল, "যাবি নিয়ে, তাতে আমার আর আপত্তি কি ?"

দোলু মুরুব্বিয়ানার টোনে বলল, "আমার আপত্তি ছিল। তবু যাক, শুধু আমার নামে যা সব বলবে বিশ্বাস করবেন না।"

শীলা হাতের টান দিয়ে বলল, "চল বাসুদি চল। ভালই হলো। দাদার বন্ধু, ভেতরের কথা যাই হোক, আমায় তো প্রশংসাই করতে হবে।"

ওরা চলে গেলে দুজনে সামনাসামনি হয়ে বসল দুটো কুশন চেয়ারে। দোলু দুটো সিগারেট বের করে একটা সরিতের হাতে দিয়ে একটা নিজে ধরাল, প্রশ্ন করল, "তার পর ওদিকের খবর কি ?"

ধীরেসুস্থে নিজেরটা ধরাল সরিৎ, পরে ধীরে ধীরে গোটা দুই টান দিয়ে বলল, "পার্টিটা দিনকতক থাক এখন।"

"কেন?" প্রশ্ন করল দোলু।

"থাকই না, তাড়া কিসের?"

খানিকক্ষণ একেবারেই চুপচাপ গেল। সিগারেটের মৃদু টানের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা কয়টির গুরুত্বটুকু টেনে বের করবার চেষ্টা করছে দোলু। এই সময় একটু হঠাৎই উঠে পড়ে বলল, "তাই থাক তবে, পরে শুনব। আমিও অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, যাই এখন।"

উঠে অনেকটা স্বগতভাবেই প্রশ্ন করল, "ভাবছি জ্যাঠামশাই যদি জিজ্ঞেস করেন পার্টির কথা তো কি বলব।"

পরে আবার নিজেই বলল, "সে তখন বলে দেওয়া যাবে কিছু বানিয়ে। তুই জামা-জুতো ছেড়ে একটু জিরো।

বেরিয়ে গেল।

॥ ত্রিশ ॥

মিস্টার রায়ের দিক থেকে কোন প্রশ্নই হলো না দিন-চারেক।

তার কারণ কাজটা নিয়ে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। প্রায়ই ডিরেক্টার-দের কাউকে বা একাধিক জনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অফিসে রইলেন তো বিভাগীয় কর্তাদের ডেকে ঐ নিয়েই আলোচনা বেশিভাগ। ফলে, দিনরাত রুটিনের যা কাজ—লেজারে দস্তখৎ, ফাইলের ওপর অর্ডার, এর মধ্যে আর ফাঁক থাকে না অন্যদিকে মন দেওয়ার।

দোলুও চুপ করেই আছে।

দিন-চার পরে রুটিনগত কাজগুলা সেরে চেয়ার ঠেলে উঠে বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে চাইলেন, বললেন, "হ্যাঁ, ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করব করব করে, পার্টির ওদিকটা চিন্তা করছ তোমরা?"

"হ্যাঁ, সেদিকে আপনি ভাববেন না।" উত্তর করল দোলু, "তবে—ইয়ে—একটু বোধ হয় দেরি হবে। জুবিলী ডেকরেটার্স, যাদের দিয়ে করাই আমরা, করেও ভাল—ফ্রী নেই কিছুদিন এখন।"

"তা হোক, আমিও এদিকটা ততদিনে সামলে নিই একটু। দেরি—তা দু-মাস চার-মাস নয় তো?

"আজ্ঞে না, বাইরের ছটো কনট্রাক্ট্ নিয়েছে, ফুল স্ট্রেংথ্টা (full strength) নেই হাতে এখন, এই আর কি।"

"ঠিক আছে। তোমরা ধীরেসুস্থে এগোও।"

বেরিয়ে গেলেন।

সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

কেতকীর পার্টির কথাটা শুনল দোলু। তবে কিছু-কিছু বলাই ঠিক।... হ্যাঁ, দোলু যেমন বলেছিল, নিজেও দেখল বৈকি সরিৎ, বেশ আমীরি গোছের একটি স্তাবকের দল আছে ঘিরে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে এইরকম মেয়েদের ঘিরে থাকতে দেখেছে। তবে এটা বেশ বোঝা যায়, কেতকীর যেন এখন জন ছুই-তিন নিয়ে পরীক্ষা চলছে। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে বলছে সরিৎ; বাইরে যদি আরও থাকে তো কি করে বুঝবে ?

সরিতের নিজের সম্বন্ধে ? তাকে অভ্যর্থনা করতে আগে থাকতেই কেতকী নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। আর সবার বেলা যেমন মোটরের আওয়াজ শুনে নেমে আসা, সেরকম নয়। পার্টির শেষে ওদের ছু-তিন জনকে ধরে রেখে গল্প করবারও ইচ্ছে ছিল; ওদের মোটরও দিলে ফিরিয়ে। তবে সিনেমার আগাম টিকিট কেনা ছিল বিলোল মিত্রের সঙ্গে, সেটা মনে পড়ে যেতে এমন বিব্রত হয়ে পড়ল, বিলোল আবার খোঁচাও দিল কিনা, সরিৎ গেছে বলেই কেতকীর এই সাংঘাতিক ভুল—কি করত বলা যায় না, তবে বাসবী সামলে নিল সরিৎকে নিজের কারে পৌঁছে দেওয়ার ভার নিয়ে...

এইরকম মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে গেল সরিৎ। সবটুকুই যে খুঁটিয়ে বলল না। (বলতে পারল না বলাই ঠিক), তার কারণ, যেটুকু অবহেলা পেল, হয়তো অবস্থাগতিকেই, কেতকীর অনিচ্ছাসত্ত্বেই—তারই লজ্জা, যার জন্য বন্ধুর কাছেও কথা যায় আটকে। তার সঙ্গে নিশ্চয় আরও একটা কথা আছে, মোহ জিনিসটা যে এত অল্পে যায়ও না। আর আহত মোহ, সে তো প্রচ্ছন্নতাই খোঁজে।

দিনগুলা একটানা গড়িয়ে চলল ধরাবাঁধা রুটিনের মধ্য দিয়ে। সরিৎ নিজের ঘরের মধ্যে চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়ার মতই কায়াহীন ভাঙাগড়া নিয়ে কাটায়। আপিসের কাজ সেরে সোজা চলে আসে দোলু, গল্প হয় ছুই বন্ধুতে। বৈচিত্র্যহীনই, বলবার বা শোনবার যা তা ফুরিয়েই গেছে একরকম, পার্টির চিন্তাও নেই যে একটু সজীবতা আসবে আলাপ-আলোচনায়। বিকালে হয়তো

দুই বন্ধুতে মোটরে করে একটু বেরিয়ে গেল। কোনদিন কোনও সিনেমা; দোলুকে নামিয়ে দিয়ে সরিৎ নিজের গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ফিরে এল।

বড় বিরস, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে জীবন দুজনের। এই সময় অফিসের সুবর্ণা হঠাৎ ওদের আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে খানিকটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করল। ব্যাপারটুকু বেশ কৌতুকপ্রদ। সুবর্ণা অফিসে একটা বেশ সাড়া জাগিয়েছে। কেরানি মহলে নিশ্চয় কিছু কিছু মৃদু গুঞ্জন চলছিল আগে থাকতে, তবে মিস্টার রায় বা দোলুর কানে আসে নি। এল নিতান্ত আচম্বিতে, মিস্টার রায়ের সামান্য একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে।

মিস্টার রায় একটা খাতা নিয়ে একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন কিছুক্ষণ থেকে, অ্যাকাউন্টস্ বিভাগের হরবিলাসবাবু একটা ফাইল হাতে এসে উপস্থিত হলেন। লোকটি অফিসে জনার্দনবাবুর সমসাময়িক। কাজ শুরু করেছেন ওঁর চেয়ে দিনকতক আগেই, কিন্তু একটু ঢিলেঢালা প্রকৃতির মানুষ। ফলে জনার্দনবাবু ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন, হরবিলাসবাবুকে তাঁর পরবর্তী আসনটুকু অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। লোকটি এমনি ভাল, এর জন্যে জনার্দনবাবুর প্রতি কোন আক্রোশ নেই। তবে ঢিলেঢালা গল্পিয়ে মানুষের স্বভাবমত সুযোগ পেলে একটু-আধটু বিদ্রূপ মন্তব্য করতে ছাড়েন না। নিজেদের মধ্যে তো বটেই, তেমন সুযোগ ঘটলে মিস্টার রায়ের সামনেও। অনিষ্টের উদ্দেশ্য থাকে না, শুধু একটু আত্মপ্রসাদ মাত্র।…"তার পর স্যার এদিকে বড়বাবুর খবর অনেকদিন শুনি নি।"—খোঁচা দিয়ে আদায় করে সহকর্মীরা, বিশেষ করে নবীনদের মধ্যে থেকে। অফিসের গতানুগতিক ভাবটা কিছুক্ষণ।

মিস্টার রায়ের কানে কথা ওঠে, যেমন বলা হলো, সেরকম সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হলেই, নতুবা নয়। হরবিলাসবাবু আসেনও কম ওঁর ঘরে, জনার্দনবাবুর ওপর দিয়েই যতটা পারেন এদিককার কাজ চালিয়ে নেন।

ফাইল নিয়ে প্রবেশ করতে মিস্টার রায় খাতা থেকে মুখ তুলেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে যেন কি ভাবলেন, তারপর একটু সচকিত হয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, এই যে হরবিলাসবাবু, আপনাকে ডেকে পাঠাব মনে করে ভুলে যাচ্ছি ক'দিন থেকে।"

"বলুন স্যার।"

হাতের কলমটা খাতার ওপর রেখে দিলেন মিস্টার রায়। প্যাডের ওপর কনুই দুটো চেপে বললেন, "এটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট্ করেছি অফিসে, জানেন নিশ্চয়। আপনাদের ডিপার্টমেণ্টেই।"

"বোধ হয় মেয়ে কেরানিটির কথা বলছেন স্যার ?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি। তা কি রকম মনে হচ্ছে ?"

একটা ফাইলে নোট লিখছিল দোলু, হাত থামিয়ে চোখ তুলে চাইল। মিস্টার রায়ের এই দিকটা বেশ লাগে ওর। পুরনো কর্মচারী অনেককেই এ প্রশ্ন হয়ে গেছে, এঁর উত্তরটা কি হয় শোনবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল।

হরবিলাসবাবু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটা দিলেন না, শুধু মুখ টিপে একটু হেসে দৃষ্টিটা নত করলেন। নিজের কাজে খুব মনোযোগী হওয়ার ভাবটা বজায় রাখবার জন্য দোলু ফাইলের পাতাগুলা আস্তে আস্তে ওলটাতে লাগল। কুণ্ঠা দেখে মিস্টার রায় ওঁকে বললেন, "বলুন যেটা মনে হয়; আপনারা হচ্ছেন অফিসের সিনিয়ার স্টাফ। কিরকম দেখছেন মেয়েটিকে ?"

"আপনার সিলেক্‌শন স্যার, ভাল না হয়ে যায় ? তবে…"

"তবে ?" আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন মিস্টার রায়। দোলুর পাতা ওলটানো ত্বরিত হয়ে উঠল।

হরবিলাসবাবু বললেন, "বড়বাবুর চেম্বারের মধ্যেই কাজ শিখছে, তা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তো যাই না। একটা ফাইলের ওপর অর্ডারটা একটু গোলমেলে ঠেকছিল, বুঝে নিতে গেছি, তা পড়বি তো পড় আমার নজরেই।"

মিস্টার রায় একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, কৌতূহল এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, কোন কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। দোলুর দৃষ্টিও অবাধ্যভাবে উঠে পড়েছে ফাইল থেকে।

হরবিলাসবাবু বলে চললেন, "অবশ্য প্রথমেই চোখে দেখা নয়, শোনাই। ঢুকতেই যাচ্ছিলাম, কথাগুলো কানে কেমন ঠেকতে মনে করলাম একটু দাঁড়িয়ে যাই, শেষ হয়ে যাক আগে ; ঠিক অফিসের কথা নয় তো…"

"তবে !" চোখ দুটো যেন ঠেলে আসছে মিস্টার রায়ের।

"আজ্ঞে গোড়াতে দুটো অফিসের কথাই গেল কানে। উনি বলছেন, 'এখন ঐ চলবে, আইটেমগুলো চেনো, তার পর প্যাঁচাল হিসেব।' শুনে ঢুকতেই যাচ্ছিলাম, ভাল পরামর্শ দিচ্ছেন, কিন্তু মেয়েটি, 'ও ব্বাবা !' বলে শিউরে উঠতে একটু থমকে যেতে হলো। ভাবলাম, থাক, ছেলেমানুষ অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে, তার চেয়ে শেষই হয়ে যাক কথা, তাড়া কিসের এত ? চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ফাইলটা আবার ওটকাতে লাগলাম, দেখি না, যদি হয়েই যায় পরিষ্কার, ফিরেই যাব নিজের টেবিলে।

" 'ওরে ব্বাবা ! করে উঠলে যে একেবারে ?' বড়বাবু প্রশ্ন করছেন।

"মেয়েটি বলল, 'এইতেই মাথা ঘুরে যায়, এর ওপর আবার প্যাঁচাল ! যা হবে বুঝতেই পারছি। আমি মাকে বলেও দিয়েছি জ্যাঠামশাই। বলেছি মাত্র এক মাসের চাকরি, তারও খানিকটা মাইনে কেটে নেবে, আবার নতুন বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচটা আমি গছে নিয়েছি কিনা।'

কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকি স্যার ? পা বাড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ঘুরে যেতে আবার একটু থমকে পড়তে হলো। মেয়েটিই বলছে, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, 'ও জ্যাঠামশাই, আপনার টিফিন করা হয় নি যে এখনও।'

" 'বড়বাবু বলছেন, কাজের যা চাপ মা, মনেই থাকে না।'

"মেয়েটি একটু ধমক দিয়েই উঠল, 'আপনার কিছু মনে থাকে না। বের করুন টিফিন বাক্সটা ডেস্ক থেকে। আজ আমি একটা কাজ করেছি না জিজ্ঞেস করেই জ্যাঠামশাই, ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাথে বেচছে দেখে হঠাৎ খেয়াল হলো।'

"আজ্ঞে স্যার, তখন-তখনই চলে এলে ভালো হতো, কিন্তু···দোষই বৈকি, স্বীকার না করলে চলবে কেন ? নতুন খেয়ালটা কি দেখবার জন্যে একটু ইয়ে হতে—ঢুকেই পড়লাম। আর চেম্বারের বাইরে ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালও তো লাগছিল না।

"মেয়েটি ততক্ষণে নিজের ড্রয়ার টেনে কাগজে-মোড়া একটি চিনেমাটির প্লেট টেনে বের করেছে। আমায় হঠাৎ দেখে—কি যে বলে—একটু হক্‌চকিয়ে গেল বৈকি, তবে তেমন বিশেষ কিছু নয়। বড়বাবু বরং একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমায় সাক্ষী মানলেন—'দেখুন হরবিলাসবাবু, ছেলেমানুষিটা !'

"ও একটু আবদারের সঙ্গেই বলল, 'না জ্যাঠামশাই, আপত্তি করবেন না। দামটা না হয় দিয়েই দেবেন, নিয়ে নোব আমি, কি আর করব।'

"তার পর আমাকেই সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখুন তো, বাক্সর মধ্যে থেকে টেনে টেনে ভেঙে-চুরে খান, সহ্যি হয় কখনও ? আর এই ক'টা দিন পরে আমি যখন থাকব না, যা খুশি করবেন।' "

"ভালই তো স্যার—", একটু বিরক্তি দিয়ে বললেন হরবিলাসবাবু। "বুড়ো মানুষ, একটু তোয়াজ হচ্ছে, এমন আর দোষেরটা কি ? তবে ঐ নতুন প্লেটে সাজিয়ে দেওয়াতেই শেষ হয়ে যায় তবে তো···"

"আবার কি ?" প্যাডের ওপর নখের দাগ কাটতে কাটতে হেঁট হয়ে শুনছিলেন মিস্টার রায়, চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন।

হরবিলাসবাবু বললেন, "আপনার সিলেক্‌শন, মেয়েটি তো বেশ চৌকোশ বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু তাকে শেখালে তবে তো শিখবে স্যার। আমি যদি উল্টে তার কাছে গোকুলপিঠে, মুগসামলি, পাটিসাপটা কি করে গড়তে হয় এই সব শিখতে যাই…"

"তাই হচ্ছে নাকি চেম্বারে।" আবার সিধা হয়ে বসলেন মিস্টার রায়।

হরবিলাস বললেন, "না, এতটা অবিশ্যি এখনও এগোয় নি, যদিও এরকম আস্কারা পেলে ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা তো যায় না। পরদিনেরই কথা স্যার, এই পরশুকার আর কি। এইরকম ফাইলের ওপর অর্ডার নিয়ে একটু গোলমালে পড়ে যেতে মনে করলাম না হয় চেম্বারে গিয়ে জেনেই আসি। টিফিনের সময় কাটিয়েই গেছি স্যার। গিয়ে দেখি ওঁর হাতে আধখানা গোকুলপিঠে, এদিকে মুখ চলছে—মেয়েটি, নামটা বুঝি স্বর্ণা—কি করে তোয়ের করতে হয় তার ফরমুলা উৎসাহের সঙ্গে বাতলে যাচ্ছে; মনের মতন কাজ পেয়েছে কিনা। প্লেটে তখনও দুটো মুগসামলি, একটা পাটিসাপটা। একবার ঘড়ির দিকে চোখটা গিয়ে পড়তে দেখি…"

"আচ্ছা, আপনি যান হরবিলাসবাবু। দেখি কিসের ফাইল।"

ফাইলে দস্তখৎ নিয়ে হরবিলাসবাবু চলে গেলে চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে দিয়ে পাইপ ধরিয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে টেনে গেলেন মিস্টার রায়। খুব যেন চিন্তিত। একসময় কলিং বেলে আর্দালিকে ডেকে বললেন, "জনার্দনবাবু।"

দোলুর নোট লেখার হাত বন্ধ হয়ে গেল।

জনার্দনবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিস্টার রায় প্রশ্ন করলেন, "আপনার রিটার্নটা শেষ হলো জনার্দনবাবু?

"প্রায় শেষ হয়ে এল স্যার। একটু—কি যে বলে…"

"আমারও ভুল দেখুন না—", ওঁর কুণ্ঠার মুখেই আরম্ভ করলেন মিস্টার রায়—"ঠিক এই সময় আবার স্বর্ণাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়ার ভারটাও চাপিয়ে দিলাম আপনার ওপর। তা হপ্তাখানেক তো হলো, কি রকম দেখছেন?"

"পরিষ্কার মাথা স্যার। বাজিয়েই নিয়েছেন তো আপনি। রিটার্নটার জন্যে বেশি মন দিতে পারছি না ওদিকে, তবু এর মধ্যে যা পিক্‌আপ্ করেছে—অন্য কেউ হলে…"

"তাই আমি ভাবছিলাম, এবার না হয় গিয়ে হরবিলাসবাবুর টেবিলে বসুক।"

কলিং বেলটাতে একটা টোকা মারলেন। আর্দালি এসে দাঁড়াতে হরবিলাস-বাবুকে ডেকে দিতে বলে, আবার জনার্দনবাবুকেই বলে চললেন, "ওঁর ফুরসতও আছে, আর আপনার এদিকটা তো খানিকটা দেখলও। কি বলেন?"

একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলেন জনার্দনবাবু, প্রশ্নটায় সচেতন হয়ে উঠে বললেন, "আজ্ঞে, মন্দ কি?...মানে, ঐটেই ভাল ব্যবস্থা হবে। রিটার্নগুলোর জন্যে ঠিক মনও তো দিতে পারছি না ওর দিকে।"

হরবিলাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিস্টার রায় বললেন, "একটা কথা ভাবছিলাম হরবিলাসবাবু। জনার্দনবাবুরও তাই মত। বলছিলাম, সুবর্ণা না হয় আপাতত আপনার কাছেই বসুক; প্রিলিমিনারি আইডিয়া তো কতক-গুলো পেয়েই গেছে ওঁর কাছে। মেয়েছেলে, তায় ছেলেমানুষই, দিনকতক একটু যেন পর্দার মধ্যে থাকলেই সুবিধে হয় ওর। আমি বলি কি, সরিতের চেম্বারটা তো হয়েই গেছে, শুধু ফার্নিচারের জন্যে যা দেরি, আপনি না হয় এই দিনকতকের জন্যে ঐতেই আপনার চেয়ার টেবিল নিয়ে যাবেন, একধারে সুবর্ণারগুলোও রইল।"

। একত্রিশ ।

পেট ফুলছিল দোলুর। একেবারে নূতন ধরনের এত বড় একটা রগোড় আফিসে তো দুর্লভই, জীবনে অন্য কোথাও পেয়েছে কিনা সন্দেহ। ওঁরা আগুপিছু হয়ে বেরিয়ে যেতে একটু ফাইল ঘাঁটার ভান করল, তার পর মুখে একটা ক্লান্তির ভাব টেনে এনে মিস্টার রায়কে বলল, "কেন জানি না, মাথাটা বড় টন্‌টন্ করছে, যদি বলেন তো এই নোটটুকু শেষ করে বাড়ি চলে যাই।"

"মাথা টন্‌টন্ করছে, তা এতক্ষণ বল নি কেন?" একটু ব্যস্তই হয়ে উঠলেন মিস্টার রায়, বললেন, "চলেই যাও বাড়ি। খুব দরকারি ফাইল নয় তো?... হলেও থাক, তুমি বাড়ি গিয়ে একটু রেস্ট্ নাও গে।"

মোটরে নয়, যেন হাওয়ায় উড়ে এল দোলু, কেন যে কোন অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল না সেইটেই আশ্চর্য। সোজা গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সরিতের ঘরের দরজায় ঘন ঘন কয়েকটা ঘা দিয়ে ডাক দিল, "এই ঘুমুচ্ছিস? শীগ্‌গির ওঠ, দোর খোল! শীগ্‌গির!"

ঘুমোচ্ছিলই সরিৎ, ব্ল্যাঙ্কেটটা গা থেকে সরিয়ে গর্‌গর্‌ করতে করতে উঠে এল, "জুটল এসে হতভাগা জ্বালাতে! শুরু করেছিস তো আফিস পালাতে? ওকে আবার জোর করে মানুষ করে তুলতে যাওয়া!"

দোর খুলে দিতেই হাত উঁচু করে একটু গলা তুলেই আরম্ভ করল দোলু, "হুররে! ফেল! ফেল! সব্বাইকেই এবার আফিস পালাতে হবে! আর আফিস নেই, পিষ্টক-সংগঠনী প্রতিষ্ঠান!..."

"খুলে বলবি তো বল্‌, নয়তো বেরো বলছি দোলু, আমায় ঘুমুতে দে।"

"ভেতরে আয়।" পাশ কাটিয়ে ওকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসাল দোলু, নিজে সামনাসামনি হয়ে বসে গলাটা একটু চেপে বলল, "সবাই নীচে তো? তুই যে সেদিন বললি, কর্তা জ্যাঠাইমাকে বলেছেন দোলুটাকে হয়তো মানুষ করে তুলতে পারবেন—শুনে এত রাগ ধরেছিল! আজ গিয়ে ওঁর সে গুমোর ভাঙল। · ফেল! একজন নারী—সামান্যা বালিকার কাছে ফেল! দেখে এলাম হেঁট হয়ে প্যাডে আঁচড় কাটছেন, লজ্জায় ঘাড় তোলবার ক্ষমতা নেই। মাথা ব্যথার ছুতো করে ছুটে এলাম।"

"সেই মেয়ে-কেরানিটা?" আর যেন বেশি প্রশ্ন করতে পারছে না সরিৎ।

দোলু বলল, "আগে চা এক কাপ। আর, মাথা-টন্‌টনানিটা টিফিন পর্যন্ত আটকে রাখতে পারি নি, খাবারের কথাও বলে দে লখাকে ডেকে। শীলা তো স্কুলে? দাঁড়া আমিই বলে দিচ্ছি।...না, যা ভাবছিস—রোম্যান্স নয়, অতি শান্ত, সুশীলা, অবলা বালা—তাইতেই তো পরাজয়টা আরও লেগেছে মনে।"

উঠে গিয়ে লখাকে ডেকে চা আর জলখাবার আনতে বলে আবার এসে বসল। বলল, "বলব তো, কিন্তু তিনজনের সে মুখের ভাব আনব কি করে?—জনার্দনবাবু, হরবিলাসবাবু আর খোদ কর্তার।"

সে ক্ষমতাও যে ওর নেই এমন নয়। চা-জলখাবারের সঙ্গে হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে একটু একটু করে বর্ণনা করে গেল দোলু। শেষ করে বলল, "তুই আয় এবার সরিৎ। অফিস আর এখন সে নীরস মরুভূমি নেই।"

চুরুট ধরিয়েছে, টানতে টানতে নির্লিপ্তভাবে সরিৎ বলল, "এবার যাবে আর কি। গরীব, কোনরকমে হয়েছিল একটা উপায়..."

"যাবে মানে? ও মেয়ে যদি পুলিপিটে খাইয়ে জ্যাঠামশাইকে পর্যন্ত হাত করে না ফেলে তো আমার নামে একটা কুকুর পুষে রেখে দিস। যাক

পুলিপিটের কথা, ওর সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারবেন জ্যাঠামশাই ? নেঃ, সেদিন যদি সরেজমিনে না দেখতাম তা হলেও না হয় বলতিস। যেভাবে চালিয়ে গেল, আমার তো ওঁকে ছেড়ে তাকেই জ্যাঠামশাই বলে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। বাপ্‌স্! একদিকে ঐ দু-দুটো জঁাদরেল বেটাছেলে, একদিকে ঐ একফোঁট্টা একটা মেয়ে—পাত্তাই পেতে দিলে না! তুই চলে আয় বলছি; এ তামাশা এখন চলবে। হরবিলাসবাবু ওকে একতিয়ারে রাখবে ? ফুঃ! সাতটা হরবিলাসবাবুকে আঁচলে বেঁধে ও হাটে…”

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনে আওয়াজ উঠল, সরিতেরই কাছে ছিল, তুলে নিল রিসিভারটা—

“হাল্লো !”

“আমি।”

“বাবা ? কিছু বলবেন ?” (সরিৎ মাথাটা এগিয়ে নিয়ে গেল)

“দোলু ওখানে আছে ?”

“হ্যাঁ, রয়েছে।”

(“উঃ! হতভাগা !” মাথা সরিয়ে নিয়ে চাপা গলায় কথা দুটো বলে মুখ বিকৃত করে নিজের চুল খামচে ধরল দোলু।)

“সোজা ওখানেই গেছে তা হলে ? নীচে আছে, না তোমার ঘরে ?”

(“বল নীচে চলে গেছে !” মুখের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করে হাওয়ায় ঘুষি আছড়াতে লাগল দোলু।)

“না এখানেই।”

মুখটা যতটা সম্ভব কুঁচকে সরিতের হাত থেকে খপ্ করে রিসিভারটা নিয়ে নিল দোলু। খুব সহজ গলায় খুব দক্ষতার সঙ্গে একটু ক্লান্তির ভাব এনে প্রশ্ন করল, “জ্যাঠামশাই আমায় কিছু বলবেন ?”

(সরিৎ মাথাটা এগিয়ে নিয়ে এল।)

“তুমি বাড়ি যাও নি এখনও ? একটা দরকার ছিল, সেখানে ফোন করেছিলাম…”

“বাড়িই সোজা যাচ্ছিলাম, প্রায় কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল, জ্যাঠাইমা চমৎকার একটা টোট্‌কা জানেন মাথাধরার। মোটর ঘুরিয়ে চলে এলাম।”

“জানে বটে নানারকম। তা পেয়েছ ? আছ কিরকম এখন ?”

"ঘুমুচ্ছেন নীচে। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে শেষে উল্‌টে ওঁরই মাথা ধরাব, তাই বসে বসে সরিতের সঙ্গে একটু গল্প করছি। ওরও আর একলা একলা ভাল লাগে না।"

এবার সরিতের শূন্যে ঘুষি ছোঁড়বার পালা।

"বলো, আমি দিচ্ছি তাড়া চেম্বারটার জন্যে।"

"তাড়া দিচ্ছেন সে-ও জানে। আমি একটা কথা আপনাকে বলব বলব করছিলাম ; ব্যস্ত থাকেন বলে হয়ে ওঠে নি। বলছিলাম না হয় ও তদ্দিন পর্যন্ত আমার টেবিলেই বসত, আমি কোনখানে নিতাম ব্যবস্থা করে। আর তো একেবারে নতুন নয়।"

পরিত্রাহি হাত ছুঁড়ে যাচ্ছে সরিৎ, তার সঙ্গে চাপা গালাগাল—"হতভাগা! ইডিয়ট! রাস্কেল! ··"

একটু বিরতি গেল ওদিকে, তার পর—

"বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠে থাকে তো না হয়···বেশ, সে আমি ভেবে দেখছি।··· হ্যাঁ, তোমায় যেজন্যে ফোন করেছিলাম—লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রাঙ্ক এসেছিল। পরাশর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

"পরাশর কাকা! আমার সঙ্গে!" ফোনটা প্রায় হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে, সরিতের দিকে চাইতে ছাখে তারও চোখ কপালে উঠেছে। কান খানিকটা এগিয়েই বসেছিল, আরও কাছে নিয়ে গেল ফোনটার।

উত্তর হলো, "হ্যাঁ, পরাশর। আমার সঙ্গেই একটা দরকার ছিল, তোমারও খোঁজ করল। কেন জিজ্ঞেস করতে বললে, তোমার সঙ্গেই একটু কথা আছে। চলে গেছ শুনে নম্বরটা চেয়ে নিলে। তাই ফোন করেছিলাম—যেন বাড়িতেই থাক।"

"আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

"না, অত তাড়াহুড়োর দরকার কি? ট্রাঙ্ক, সঙ্গে সঙ্গেই তো কনেকশন্‌ পাবে না, ওষুধটা নিয়েই যাও তুমি।···আচ্ছা।"

রেখে দিলেন। দোলু নিজের কপালে একটা চড় বসিয়ে বলল—"আর ওষুধ! মাথার ব্রহ্মতলে ছুবলেছে! ভেবেছিলাম আপদ বুঝি বিদেয় হয়েছে। সে তবু সামনাসামনি ভেবে উত্তর দেওয়া যেত। এ ট্রাঙ্ক ফোন, কি শুনতে কি শুনব, কি উত্তর দিতে কি উত্তর দিয়ে কি জাঁতিকলে পা গলিয়ে দিয়ে বসব। নাঃ!"

হাতটা ঝেড়ে উঠে পড়ল। সরিৎ বলল—"ওষুধ নিলি নি কিছু, মাকে তো আবার জিজ্ঞেস করতে পারেন বাবা।"

"আবার পেছনে ডেকে দিলে ছোঁড়া!" ঘুরে থমকে উঠল দোলু, বলল, "এ যা মাথাব্যথা, এর টোটকা ওঁর কাছে থাকলে তবে তো! উঃ! কী রাগটাই যে হচ্ছে ওঁর ওপর!

। বত্রিশ ।

ফোনটা এল প্রায় সন্ধ্যার সময়, উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় যখন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে দোলু।

কথা হলো। দুশ্চিন্তা কিন্তু মোটেই গেল না, বরং আরও বেড়েই উঠল। কিছুই নয়, শুধু দোলু আছে কেমন? উনি শুনেছেন মিস্টার রায় নাকি ওকে নিজের অফিসে ডেকে নিয়েছেন। তা লাগছে কেমন কাজ? যদি কিছু বলবার থাকে, নিজে হতে মিস্টার রায়কে জানাতে বাধে তো ওঁকে লিখলে, বা দরকার হলে ফোন করলে উনি তাঁকে বলে দিতে পারেন। এমন কি, এ কাজ ভাল না লাগলে অন্যত্রও ব্যবস্থা করা যায়। মোট কথা, ঘাবড়াবার দরকার নেই, উনি আছেন। দোলু অবশ্য জানাল কাজ ভালই লাগছে। না, অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা নেই। কিন্তু যা আন্দাজ করেছিল—সরিৎ-কেতকী নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবেন, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না দেখে অস্বস্তিই বোধ করতে লাগল কথা-বার্তার মধ্যে। নিজেই ওপর-পড়া হয়ে তুলবে কথাটা. এই সময় অপারেটর নির্ধারিত তিন মিনিট হয়ে গেছে বলায়, "রাইট, ফিনিশ্‌ড্‌ (Right finished)" বলে কেটে দিলেন কনেক্‌শন।

আবার মাথায় হাত দিয়ে বসল দোলু। অবশ্য, পরিচয় হয়েছে, কেমন লাগছে কাজ, কি বৃত্তান্ত খোঁজ নেওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় (যদিও প্রয়োজনই বা কি এমন তা বুঝতে পারে না দোলু), কিন্তু মিস্টার রায়কে যে জানাল বিশেষ করে দোলুর সঙ্গেই কথা বলতে চায়, তার কি এমন দরকার ছিল? এ ক'টা কথা তো মিঃ রায়কেও জিজ্ঞেস করলে সন্ধান পেতে পারত।

হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু লোকটা ধড়িবাজ, যা করে একটা গুরু উদ্দেশ্য নিয়েই করে—পূর্বপরিচয়ে এইরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠায় রীতিমত অস্বস্তি

বোধ করতে লাগল দোলু। ক্রমে অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে, একটা স্পষ্ট ধারণা না করে নেওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠল নিশ্চিন্ত থাকা। ভেবে ভেবে একটা উপায় ঠিক করে ফেলল—চিঠি লিখে নিজেই ওপরপড়া হয়ে প্রসঙ্গটা তুলবে। কথাটা মনে হতে ভেতরে ভেতরে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, কেন যে আগে হয় নি মনে! এইরকম লোক, যারা বাইরে এক, ভেতরে এক, পত্রাচারই হচ্ছে এদের ভেতরের কথা টেনে বের করবার একমাত্র উপায়—যতই চাপতে চাক, কিছু না কিছু বেরিয়ে আসতে বাধ্য। একটা চিঠিতে না হোক, দুটোতে; দুটোতে না হোক তিনটেতে। কতক্ষণ পারবে চেপে রাখতে? এসব লোক থেকে ভয়ে-সন্দেহে সরে থাকা ঠিক নয়, বরং চেষ্টা করে মাখামাখি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ও-ও সুযোগ পাবে মন জানবার? পাক না, হোক না সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।

অফিসে ঢোকাবার ফন্দি যে ওরই—হয়তো সরিৎকে ঢোকাবার জন্যই—সেটাও কেমন গেল চেপে! এ লুকোচুরিরই বা উদ্দেশ্য কি? আরও গূঢ়তর কিছু আছে এর পেছনে?

উঠে লিখেই ফেলল চিঠিটা। ফোনের অসম্পূর্ণ আলাপ, মস্ত বড় একটা সুবিধাও রয়েছে। তাই দিয়েই আরম্ভ করল—

"শ্রীচরণেষু,

আজ বৈকালে সময় হয়ে গেছে বলে ট্রাঙ্কের অপারেটর কনেকশন কেটে দেওয়ায় মনে হচ্ছে আপনার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তাই এই চিঠি দিচ্ছি। জ্যাঠামশাই বললেন আপনি বিশেষ করে আমার সঙ্গেই কথা কইতে চান। এ থেকে মনে হয় সরিতের সম্বন্ধেই আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। আমি এদিকে খুব সতর্ক আছি, যাতে কোন অঘটন না ঘটে সেই চেষ্টাই করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই পর্যন্ত লিখে কলম তুলে নিয়ে একটু চুপ করে ভাবল। এতটা লেখা ঠিক হয় না। এসব হৃদয়ের ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা তো যায় না। জ্যাঠাইমা ওঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ফল যদি অনুকূল না হয় তো ওঁর চৌকোশ-পনা সম্বন্ধে তাঁর আস্থাটা কমে গিয়ে বোধ হয় ভবিষ্যতে দোলু-সরিতের পক্ষে ভালই হবে। এমন একটা লোক যত দূরে দূরে আর নিঃসম্পর্ক থাকে ততই ভাল।

শেষের "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন" লাইনটা কেটে দিয়ে লিখল, "এ সম্পর্কে আপনিও চিন্তা করতে থাকুন এবং যদি উপদেশ দেওয়ার কিছু থাকে তো জানালে আনন্দিত হব।

এর পর আরও খানিকটা ভেবে নিয়ে জুড়ে দিল—

"আমার সম্বন্ধে আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকবেন। শুধু আশীর্বাদ করুন, জ্যাঠামশাই আপন হতে যে ভার দিয়েছেন, যেন তাঁর উপযুক্ত করে তুলতে পারি নিজেকে। আপনাকে শুধু এইটুকুই জানাই, আমার দিক থেকে কোন চেষ্টার ত্রুটি হবে না।"

শেষ করে, শেষের কথাগুলার টীকা হিসাবে চিঠিটা তিনবার কপালে ঠেকিয়ে নিজের মনেই বলল, "রেহাই দাও বাবা? ঢের হয়েছে, আর দোলুর ভাবনা দয়া করে ভাবতে হবে না তোমায়!"

কাটাকুটি হয়েছে, অন্য কাগজে লিখতে গিয়ে থেমে গেল। সরিৎ জিজ্ঞেস করবে ফোনে পরাশরকাকার সঙ্গে কি কথা হল। সব বলে তাকে একবার চিঠিটা দেখানোও দরকার।

এত অন্যমনস্ক ছিল যে ওদিকটা খেয়ালই হয় নি।···ফোনেই সারিৎকে সব বলে শুনিয়ে দিক না চিঠিটা। নাঃ, চলেই যাক, অনেক কথা, তা ভিন্ন হঠাৎ চলেও এসেছে তখন।

উঠে পাশের ঘরে গিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে নিচ্ছে, একটা মোটর এসে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দোলু দেখে বাসবী নেমে দাঁড়িয়েছে, তার পাশে শীলা; আলোক ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে আসছে।

অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল বৈঠকখানায়।

॥ তেত্রিশ ॥

বাসবী বলল, "ক'দিন থেকেই আসব-আসব করছি, তা এ-মানুষের আর ফুরসত হয় না। শেষে যখন বললাম, আমি ঐদিক থেকে শীলাকে তুলে নিয়ে একাই আসব, এই তখন···"

"অর্থাৎ শীলার লোভ দেখিয়ে আমায় রাজি করালে।" চুরুটের ফাঁক দিয়ে মন্তব্য করল আলোক।

"না বাপু, আমি উঠি।" উঠেই পড়ল শীলা। বলল, "এসে পর্যন্ত শীলা, শীলা। যাই কাকীমার কাছে; পৌঁছে তো দিলাম।"

উঠে গেল সিঁড়িতে, দোলু হেঁকে বলল, "চায়ের কথা বলে দিবি শীলা।"

"আমার বয়ে গেছে। যার খাতির করবার সে করুক।"

চলে গেল ওপরে। আলোক বাসবীকে বলল, "নাও, পরিষ্কার করে দিলাম আসর, এবার যা বলবে বল।"

একটু ভাবল বাসবী, তার পর দোলুর দিকে চেয়ে বলল, "একটা দরকারী কথা নিয়েই এসেছি দোলুবাবু, আগে সেটাই শেষ করে নিই, তার পর ওপরে গিয়ে দেখা করে আসব সবার সঙ্গে। কথাটা হচ্ছে, সেদিন যখন থেকে টের পেয়েছি আপনি সরিৎদার বিশিষ্ট বন্ধু…"

একটু কুণ্ঠায় পড়ে গিয়ে চুপ করল। দোলু বলল, "নিঃসঙ্কোচে বলুন; আমি বোধ হয় একটু আন্দাজ করতেও পেরেছি। সেদিন আপনারা একসঙ্গে পার্টি থেকে এলেন…"

"পারবেন আন্দাজ করতে।" ওর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বলল বাসবী।—"মনটা আমার বড্ডই খারাপ হয়ে রয়েছে সেদিন থেকে। কী মিথ্যে আশায় কি ভুলটা যে করে যাচ্ছেন সরিৎদা!—সত্যসত্য ওঁকে ও-পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিতে না পারলে এর পরিণাম যে শেষ পর্যন্ত কি বিষময়!…"

ঝোঁকের মাথায় এতটা এক নিশ্বাসে বলে হঠাৎ আবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, "কেমন, আপনার আন্দাজটাও কি এই নিয়েই?"

"একেবারে এই।" উত্তর করল দোলু, "বন্ধুত্বের বড়াই করতে পারি না বাসবী দেবী, তবে আমারও এই নিয়ে দুশ্চিন্তা। আমি চেষ্টা করে সাক্ষাৎ করেছি মিস্ আইচের সঙ্গে, আলগোছে মনোভাবটা বোঝবার জন্যে। আপনি একই পার্টিতে থেকে ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছেন, সম্বন্ধেও ভগ্নী, ছট্‌ফট্ করছিলাম কি করে দেখা করি আপনার সঙ্গে। আপনি নিজে অনুগ্রহ করে এলেন—আর আপনারও এই নিয়েই দুশ্চিন্তা—আমি যে কত বড় একজন সহায় পেলাম! একজন মেয়েছেলে—খানিকটা তফাতে থেকে একজন বেটাছেলের তার সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া সহজ নয়, তবে যতটা বুঝেছি…"

এবার একটা অভিমত দিয়ে ফেলার কুণ্ঠায় দোলুও গেল থেমে; উচ্ছ্বাসের মুখে ও-ও এতটা বলে গিয়ে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। বাসবী অভিমতটা শোনবার জন্যে একটু চেয়ে রইল ওর মুখের পানে, বেশ কয়েক সেকেণ্ডেও না

পেয়ে বলল, "এইরকম পার্টিতে শুধু বাইরে বাইরে পরিচয় নয় ওর সঙ্গে আমার দোলুবাবু। কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, মেলামেশা করেছি, বন্ধুত্ব আছে, ওকে আমি ভালরকমই জানি। এমনি মেয়ে ভাল, তবে······কি করে বোঝাই আপনাকে?"

"আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি—", হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠল আলোক, "মেয়ে হয়ে মেয়েদের কথা বলা—একরকম ঘরের কেচ্ছাই তো · "

আড়চোখে চাইল বাসবী, বলল, "কাজ নেই উপকারে, তুমি তো নিজের মতন করেই বলবে।···কেতকী মেয়ে ভাল দোলুবাবু, তবে বোধ হয় গার্জেনের বেশি ঢিলেপনার জন্যে···"

"অর্থাৎ মাথার ওপর আমার মতন কড়া গার্জেন না থাকায়···" আরম্ভ করল আলোক।

"গার্জেনের বেশি ঢিলেপানার জন্যে—", আবার একটা কটাক্ষপাত করে বলেই চলল বাসবী, "হাই সোসাইটিতে যেমন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে—ওর একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে, অনেকগুলি স্তাবক ওকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকুক···"

"অন্য মেয়ের তা সইবে কেন?" পা দোলাতে দোলাতে মন্তব্য করল আলোক। বাসবী উদ্ব্যস্ত হয়ে বলল, "আঃ, একটু থাম তো! বেশ আমিও তা হলে ঘরের কেচ্ছা বের করেই বলি ওঁকে; প্রমাণ পেয়ে বুঝবেনও ভাল।··· আমি এইরকম একটি স্তাবককে খসিয়ে নিয়েছি দোলুবাবু, সামনেই রয়েছেন বসে তিনি। অস্বীকার করুন না পারেন তো। স্বচক্ষেই দেখছেন।"

"মেয়েদের বন্ধুত্বের নমুনা দোলুবাবু; মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।" চুরুটের ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল আলোক। জুড়ে দিল, "স্বমুখেই স্বীকার করা। স্বকর্ণেই শুনলেন।"

"আঃ! জ্বালাতন হয়ে উঠল বাসবী, বলল, "ওগো, দোলুবাবু নতুন মানুষ, সে-খাতিরটাও একটু রাখ না হয়!"

"ঘরের কেচ্ছা বের করে দিয়ে তো আগেই পুরনো করে নেওয়া হয়েছে।"

"মাগো মা! দেখুন দোলুবাবু, এই যন্ত্রণা নিত্যি ভুগছি, সময় নেই অসময় নেই···"

দোলু বলল, "মনে হয় ওদিক থেকে খসিয়ে এনে মস্ত বড় ভুল করেছেন একটা।"

তিনজনেই এবার হো-হো করে হেসে উঠল। বাসবী স্বামীর দিকে করুণ

মিনতির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "না, দোহাই একটু থাম। আর কিছু নয়, কথাটা শেষ করে ফেলা দরকার, যার জন্যে ছুটে আসা। কখন শীলা এসে পড়বে, আর হবে না।...এই অবস্থা দোলুবাবু। সেদিন শীলার মুখে আপনাদের দুজনের সম্বন্ধের কথা শুনে অবধি আরও ছট্‌ফট্‌ করছি। বেশ ভাল করেই সেদিন লক্ষ্য করলাম কেতকীর মনের ভাবটা—লক্ষ্য করবার সুবিধেও হয়ে গেল ঘটনাচক্রে। না, মোটেই অনুকূল নয় সংক্ষেপেই বললাম আপনাকে। অনুকূল হলে আমি দাঁড়াতাম না মাঝখানে।"

"আমিও ঠিক এই মনোভাব নিয়ে এগিয়েছিলাম বাসবী দেবী। সত্যিই তো আর সব দিক দিয়েই যোগ্য, যদি সিন্‌সিয়ারিটি (Sincerity) থাকে তো কেন অন্তরায় হতে যাব? কিন্তু..."

"নেই, তা মোটেই নেই।"

"আমারও তাই অভিজ্ঞতা, কিন্তু কী উপায়?"

"আমি একটা ঠাওরেছি। বলেই ফেলি, কখন্ শীলা এসে পড়বে। সরিৎদাকে অন্য মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমার জানা তিনটি মেয়ে আছে। শুধু ঠিক করতে পারি নি এখনও কোন্‌টির সঙ্গে দোব পরিচয় করিয়ে..."

"ওরে ব্বাবা! কূটচালে মেকিয়াভেলির (machivelli) নাক কাটে!" —মুখ থেকে চুরুট বের করে নিয়ে অবাক হয়ে শুনছিল আলোক, বিস্ময়টুকু উচ্চারণ করে বলল, "আমি বলি যেটি তোমার মতন খলিফা সেটিকেই দাও না ভিড়িয়ে।"

হো-হো করে হেসে উঠল দোলু। বাসবীও চাপবার শত চেষ্টা করেও পারল না। খানিকটা হাসি মুক্ত করে দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে বলল, "বাবাঃ বাবা! কী লোকের পাল্লায় যে পড়েছি!...থাক দোলুবাবু, ওঁকে বাদ দিয়ে এসে একদিন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সরিৎদার বন্ধু, আপনিও তো আমার দাদাই।"

"তাতে উনি রাজি হবেন?"

"কেন হবেন না? দাদার বন্ধু যখন..."

"দোলুবাবু হয়তো বলবেন, তোমারও বন্ধু হয়েই থাকুন, তাইতে আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকবে। তুমি যদি দাদা করে নাও তা হলে সরিৎদার মতন..."

"কি সরিৎদার মতন?"—প্রশ্ন করে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল বাসবী, তার পর আলোকের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে বলে উঠল, "ওগো, এত শীগ্গির—এত অল্প পরিচয়ে তুমি করতে পারলে ও-ইঙ্গিতটা ওঁকে নিয়ে!...যার এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই সে-মানুষকে আপনি ক্ষমা করুন দোলুবাবু।"

দোলু উদ্দেশ্যটা গোড়াতেই বুঝে নিয়ে মৃদুমৃদু হাসছিল, বলল, "আপনি ভাবছেন কেন? বোনের খাতিরে তো সবাইকেই ভগ্নীপতির এ বেয়াদবিটুকু গা পেতে নিতে হয় বাসবী দেবী। দুজনের এক দুশ্চিন্তা, এ অবস্থায় আমায় সরিতের সঙ্গে এক করে নিয়ে আপনি আমায় যে কতটা সাহস আর শক্তি দিলেন! বেশ তো, একদিন আসুন, যাক ভাল করে পরামর্শ করা। ওঁকেও আসতেই হবে। এত বড় দুশ্চিন্তার কথা, উনি না থাকলে বাতাস যে অসহ্য-রকম উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। মেয়ে তিনটি কে, একটু যদি পরিচয় দেন..."

আলোক বলল, "আমার কাছেও লুকিয়েছে।"

আবার যে একটা হাসি উঠল তার মাঝেই শীলা সিঁড়ির মোড় পর্যন্ত নেমে এসে বলল, "কাকীমা ওপরে আসতে বলছেন সবাইকে।"

॥ চৌত্রিশ ॥

সত্যই মস্তবড় একটা স্বস্তি অনুভব করল দোলু। একলা পড়ে গিয়ে নিতান্তই অসহায় বোধ করছিল। অবশ্য পরাশরকাকাও রয়েছেন। তবে যে ধরনের মানুষ, তিনি নিজেই দোলুর কাছে একটা সমস্যা।

বড় ভলে লাগল মেয়েটিকে। আলোককেও। ও আবার একেবারে দোলুর প্রকৃতির লোক। কথাবার্তার মধ্যে গুমোট বরদাস্ত করতে পারে না, হাসি-কৌতুক দিয়ে বাতাসটাকে সচল করে রাখবার চমৎকার একটি ক্ষমতা আছে। বড় একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল জীবনটা। সরিৎও যদি এল ফিরে বিলেত থেকে তো গোমড়া মুখ নিয়ে এল। তার ওপর পরাশরকাকা। এ বেশ দুজন সাথী পাওয়া গেল। আলোক নিশ্চয় সে ধরনের লঘুচিত্ত মানুষ নয় যাকে চলতি ভাষায় 'ছ্যাবলা' বলে, সেরকম হলে বাসবীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয় ঘেঁষত না ওর দিকে। আপিসে একটা দায়িত্বের স্থানই অধিকার করে রয়েছে। সব বিষয়েই তিনজনে মিলে পরামর্শ করা চলবে। যেখানে সরিৎকে বাদ দেওয়া

দরকার সেখানে তিনজনেই, নয়তো চারজনে মিলেই; যেমন পার্টির কথা। বেশ হলো।

ওরা চলে যেতে রেডিওটা খুলে দিয়ে সোফায় গা ঢেলে পড়ে রইল দোলু। শানাইয়ে বেশ একটি মিষ্টি রাগিণী ধরেছে। আরও মিষ্টি লাগছে এইজন্য যে মনে একটা নূতন স্বর উঠেছে হঠাৎ। মনে একটু ডুব দিতেই বুঝল সেটা এদের দুজনের মধ্যে থেকেই এসেছে উঠে—এই বাসবী আর আলোকের। স্বামী-স্ত্রী অনেক দেখেছে, নব-পরিণীত থেকে আরম্ভ করে সব বয়সেরই, কিন্তু কথায় কথায় হাস্য-পরিহাস রাগ-অভিমানে এমন দুটি আর কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। এ যেন জীবনের পদে-পদেই ওদের মিষ্টি সম্বন্ধটিকে স্মরণ করতে করতে চলেছে ওরা। আজকের যা আসল কথা ছিল, যা নিয়ে আসা ওদের, তা থেকে সরে গিয়ে মনটা এই মাধুর্যটুকুর চারিদিকে গুম্ গুন্ করতে লাগল; ফুলের চারিদিকে মৌমাছির মতই। এক সময় কি করে আজকের অফিসের অভিজ্ঞতাটুকুও গেল মিশে এর সঙ্গে। যথেষ্ট কৌতুকজনকই, কিন্তু কোথায় যেন একটি অপূর্ব মিষ্টাস্বাদও রয়েছে তার মধ্যে। সেখানেও গোড়ায় একটি মেয়ে; আর এক রূপে।...ওরা যেখানে যেভাবেই থাকুক, সব রুক্ষতা যেন মিটিয়ে দিতে দিতে চলে। ফাইল-লেজার-বিধ্বস্ত অতবড় একটা আপিসের সব গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ করে ক'টা দিনেই ভোল ফিরিয়ে দিল সুবর্ণা। নিজের বিধিগত কর্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে।

শীলাটার কথাই ধরা যাক। উঠতে বসতে অবাধ্য, কিন্তু...

পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠতে চিন্তায় ছেদ পড়ল দোলুর। একটু নিরুৎসাহের সঙ্গেই উঠে গেল—সরিৎ পরাশরকাকার সঙ্গে ট্রাঙ্কের কথা জিজ্ঞেস করবে। এই সুরের গায়ে এতই বেসুরো যে ও-আলোচনায় যোগ দিতে একেবারেই সায় দিচ্ছে না মন।

না, সরিৎ নয়। ওদের জুনিয়ার উকিল সত্যব্রত। বাড়িভাড়া নিয়ে একটা মকদ্দমা সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করার আছে, দোলু ফ্রী থাকে তো আসে। দোলু জানাল শরীর ঠিক নেই, কাল সকালে ও নিজেই যাবে।

এসে আবার পড়ে রইল। একেবারে বাকি ভাড়ার মকদ্দমা—সুরটা গেছে কেটে। বেশ লাগছিল, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে দোলু। এল ফিরে, তবে রূপ বদলে; যেন কড়া-মিঠে দুটো রাগিণী গেছে মিশে।...আর এক মেয়ে এই কেতকী, আলেয়ার রূপ নিয়ে দিকে দিকে বিভ্রম ঘটানোতেই আনন্দ।

সরিৎ পড়ল ঐ বিভ্রমে। পার্টি থেকে ফিরে যা রিপোর্ট দিল সরিৎ, তা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে ও-ও বুঝেছে আলেয়া, কিন্তু সতর্ক হতে পারছে না।···পারছে না, কি চাইছেই না সতর্ক হতে ?···কেমন যেন ভয় ভয় করছে দোলুর। বাসবী, সুবর্ণা, শীলা—সবাই ছায়ায় পড়ে গিয়ে সব আলোটা গিয়ে পড়েছে কেতকীর ওপর। এই যেন আসল রূপ মেয়েদের ; বুঝবে বিভ্রম, কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ; সরিতের জন্য কি নিজের কথা ভেবেই ঠিক বুঝতে পারছে না। যদি তারও সামনে আলেয়া হঠাৎ জেগে ওঠে কোথাও, কখনও—পারবে কি সেই অলীক আলোর অমোঘ মোহ কাটিয়ে উঠতে ?···কেমন একটা মায়া হচ্ছে নিজের ওপর—সেই অসহায়-অবস্থায়-পড়া দোলুর ওপর।

আবার ফোন বেজে উঠল, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এলেই ভাল হতো।

এবার—"আমি শীলা। মা তোমায় একবার আসতে বলছেন। অতি শীগ্‌গির। যেমন আছ চলে এস।"

"তোকেই করতে বললেন যে ফোন্ ? কেন, সরিৎ নেই ?"

"মেট্রোতে সিনেমা দেখছে।"

একটু চুপ করল দোলু। এইজন্যই সরিতের কাছ থেকে ট্রাঙ্ক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আসে নি।

বলল, "মিথ্যে বলছিস না তো ?"

"বেশ, এস না। মাকে বলি গে বিশ্বাস করছ না আমার কথা।"

"এই শোন্, ছেলেমানুষী নয়, কেন ডাকছেন রে ?"

"নিজে যে একটা মিথ্যে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছ, হুঁশ নেই ? কানে গিয়ে অবধি যে ছট্‌ফট্ করছেন।"

"মিথ্যে ?"

"সত্যি ?"

চুপ করল দোলু। শীলার প্রশ্নে যেন একটা আত্মপ্রত্যয়ের জোর আছে। একটু থেমে প্রশ্ন করল, "সত্যি কি মিথ্যে তুই কি করে জানলি ?"

"বলতেই হবে ? আপিস পালিয়ে যখন বড়াই করতে করতে ঘরে ঢুকলে, হুঁশ ছিল যে একটা ঘর বাদ দিয়ে লোক থাকতে পারে ? থাক্, আমি যাচ্ছি, এত জবাবদিহি দিতে পারি না।"

"এই শীলা শোন্, লক্ষীটি। জ্যাঠাইমাকে বলিস নি তো ? জ্যাঠামশাইয়ের কানে পর্যন্ত উঠবে তা হলে।"

"আমি কারুর সত্যি-মিথ্যে কোন কথাতেই থাকি না। আর, আমি বললে আদুরে-গোপাল দোলুর কথা ছেড়ে যেন বিশ্বাস করবেন কেউ। আগে মা-ই ছিলেন, এখন আবার বাবার মুখে সুখ্যেৎ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।"

"বড্ড মুখ হয়েছে শীলা তোর।"

"আমার মুখ আমারই আছে, তার জন্যে ভাবতে হবে না কাউকে। আসছ, না মাকে গিয়ে বলব মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারছেন না, তোমায় ওষুধ নিয়ে ডাকছেন ?"

"এই, এই খবরদার! আসছি—আসছি তোর মুণ্ডুপাত করতে।"

"তাই বলতে…"

তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রেখে দিয়ে কেটে দিল দোলু।

। পঁয়ত্রিশ ।

বরদাসুন্দরী পূজোর ঘরের কাছে পাটকরা কালো কম্বলটায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ছিলেন, পাশে গুটিচার কাগজের পুরিয়া। সামনে রতন ঝি একটা হামানদিস্তায় কি গুঁড়োচ্ছে, তার ঝাঁঝালো গন্ধ বেরিয়েছে। এমন কিছু উদ্বেগের ভাব নেই চেহারায়, তবে দোলু যেতে রাগ করেই বললেন, "হ্যাঁ রে তোদের কাণ্ডখানা কি জিজ্ঞেস করি। মাথা ধরেছে, জ্যাঠাইমার কাছে ওষুধ নিতে যাচ্ছি বলে ছুটি নিয়ে এলি, তার পর আর দেখা নেই!"

"তার পর আর মাথাব্যাথারই যে দেখা নেই জ্যাঠাইমা।" পরাশরকাকার ট্রাঙ্ককলের কথা আর তুলল না দোলু। না শুনে থাকেন ভালোই।

"শুনে রাখ রতন। ছেলে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা বন্ধ!…হ্যাঁ রে, সত্যিই মাথাধরা, না তোদের ছেলেবেলার সেই স্কুল-পালানো দুজনে জোট করে ?"

"আশ্চর্য কি ?" হামানদিস্তা চালাতে চালাতে বলল রতন ঝি। ওঁর বাপের বাড়ি থেকে আমদানি বলে কর্তার সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধটা ধরে রাখে, একটু মুখ টিপে হেসে জুড়ে দিল, "তেমনি গবেট হেডমাস্টারও পেয়েছে তো রায়মশাইকে।"

"তা মিথ্যে বলিস নি। অবিশ্যি না ধরলেই ভাল। তুই উঠে একটা আসন দে আগে।"

"আমিই নিয়ে নিচ্ছি; রতনমাসি যা করছে করুক।"

পাশে কাঠের আলনায় আসন গোছানো রয়েছে, একখানা টেনে নিয়ে একটু ঘেঁষেই বসতে যাচ্ছিল দোলু, 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন বরদাসুন্দরী, বললেন, "একটু সরে বাবা, যে পর্যন্ত গঙ্গাজল দেওয়া রয়েছে।"

"মা-গঙ্গা এলে দিয়েছেন জ্যাঠাইমা, আপনিও দিলেন ঠেলে আমায়?" জানে কিরকম শুচিবাই, একটা জলের দাগের বাইরে আসনটা বিছিয়ে বসতে বসতে বলল দোলু।

"শোন কথা ছেলের! ওষুধটা করছি, অনাচার সইবে?"

"কিসের ওষুধ জ্যাঠাইমা?"

"ওমা! ন্যাকা সাজে ছাখ! তোর মাথাধরার, আর কিসের? উনি অফিস থেকে এসে বললেন, 'হ্যাগা, দোলু যে তোমার কাছে মাথাধরার ওষুধ নিতে এসেছিল, তা নিয়ে গেছে?'...হ্যাঁ, আমার ওষুধের জন্যে তার বয়ে গেছে; বাড়ির লোকেই বড্ড নাকি আমল দিচ্ছে। জানতুম তো, একে একে সব ভুলেই যাচ্ছি। সে যাক; না-ই এল, ডাক্তারের ওষুধেই যদি থাকে বিশ্বেস, কিন্তু শুনে অবধি মনটা তো আইঢাই করছে, আনিয়ে নিলাম জিনিসগুলো দোকান থেকে। তার পর এখন শীলা এসে বলতে প্রাণটা জুড়ল..."

"কী বললে শীলা? মিথ্যে ছুটি নিয়ে এসেছি বলেছে তো?" উদ্বিগ্নভাবেই অনুযোগের স্বরে প্রশ্ন করল দোলু।

"ওমা, তা কখনও বলতে পারে? সামনে যতই খেয়োখেয়ি করুক, তা বলে..."

কি যেন বলতে গিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "বলল, সেরে গিয়েছিল মাথাটা তাই তোমায় আর ওঠান নি। এই তখন গিয়ে ধড়ে প্রাণ এল। সেরে গেলেই ভাল বাবা। আমার বাবার ওষুধ—কেই বা গেরাহ্যি করে, বড় বড় ডাক্তার এখন ..."

"না জ্যাঠাইমা, আমার ভয়ানক বিশ্বাস। আপনার টোট্‌কার কথা শোনা পর্যন্ত (কার মুখে যে শুনলাম সেদিন!) ছট্‌ফট্ করছি, একবার ধরুক মাথা, দেখি বেটার কত দাপট। তা যদি ধরল একটু..."

মুখের দিকে চেয়ে শুনতে শুনতে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বরদাসুন্দরী,

বললেন, "দ্যাখ্‌ নকুলেপনা রতন। চিরকাল একরকম রয়ে গেল, লোকে মাথা-ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করে, ওর করছে না বলে ছট্‌ফটানি। কোথায় যাব মা!"

রতনও মুখ টিপে হাসছিল, বলল, "হয়েছে গুঁড়ো, দ্যাখ তো।"

হামানদিস্তাটা এগিয়ে দিতে চোখ মুছতে মুছতে হাতে একটু গুঁড়ো পরখ করে নিয়ে বললেন, "হয়েছে। নে তুই এবার সবগুলো একত্তর করে মিশিয়ে নে তো একটু সরে গিয়ে।···তুই বাবা উঠে আয় এবার।"

শেষের কথাগুলো দোলুকে বলে কাগজের মোড়াগুলো বাড়িয়ে দিলেন রতনের দিকে। কম্বলে নিজের খানিকটা হাত টেনে মসৃণ করে দিতে দিতে বললেন, "কী অলক্ষুণে কথা সব, মা-গঙ্গা এলে দিয়েছেন, তুমিও নাকি ঠেলে দিচ্ছ। নে, উঠে আয়।"

রতন মুখ টিপে হেসে বলল, "ঠেলে দিচ্ছ কি আরও কোলে টেনে নিচ্ছ দেখুন এবার।"

বরদাসুন্দরীও মুখ টিপে হাসলেন।

এই আদরেই অভ্যস্ত—এদিকে হয়তো কতকটা ছেড়ে গিয়েছিল, উঠে গিয়ে পাশে বসল দোলু। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "তুই আর আসিস না বড়, কেন রে?"

"কাজটা নিয়ে জ্যাঠাইমা আর······"

"চুপ কর দিকিন! কেউ আর কাজও করে না, কেউ আর বিলেতফেরতাও হয়ে আসে না!"

একেবারে স্তব্ধতা এসে পড়ল খানিকটা। সব ওজনদুরস্ত কথাই হালকা করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে দোলুর, কিন্তু এটা যেন কোনমতেই পেরে উঠছে না। উনি আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। রতন ঝি একবার চোখ তুলে চেয়ে নিয়ে আবার হামানদিস্তায় মন দিল।

উনিই বললেন, "আসবি। আসিস তো, টের পাই, শুধু জ্যাঠাইমাকে আর তেমন মনে পড়ে না।"

চুপ করেই রইল দোলু। অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে বুঝেই যেন উনি কথাটা উল্টে দিলেন, বললেন, "কাজের কথাই যখন উঠল—কেমন লাগছে রে কাজ? কিছু অসুবিধে হয়, ওঁকে না বলতে পারিস, আমায় বলবি।···এই দ্যাখ, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি—আজ পরাশর ঠাকুরপো তো লক্ষ্ণৌ থেকে টেরাঙ্ক করেছিলেন!"

"হ্যাঁ, তাতেই তো তাড়াতাড়ি চলে যেতে হলো জ্যাঠাইমা—আপনার সঙ্গে দেখা না করেই।"

"উনি বললেন কিনা, করেছিলেন ফোন—তোকেই নাকি কি কথা বলবার ছিল। তা, কি বললেন রে?"

একটু যেন সন্ধানী দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে রইলেন দোলুর দিকে। দোলু বলল, "এই আপনি যা বললেন—কাজ কেমন হচ্ছে? সবার মুখেই এখন এই এক কথাই তো?"

একটু অনুযোগের কণ্ঠেই বলল দোলু। পিঠে হাতটা পড়েই ছিল, আবার টানতে টানতে উনি বললেন, "না, করবি বেশ মন দিয়ে। কাজই যে লক্ষ্মী বাবা। কাজ করতে করতে বেটাছেলের ছিরি আসে।"

"বিচ্ছিরি থেকেও তো আপনাদের কাছে এইরকম আদর পাচ্ছিলাম জ্যাঠাইমা। আমার হলো ঐ পুঁজি। এত খুটেখুটে ছিরি না ফিরিয়েই যদি পাই তো মিছে খাটুনির দিকে কেন যাই বলুন?"

রতন-ঝি মুখ টিপে হেসে আবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। বলল, "নেও, দাও জবাব।"

বরদাসুন্দরী বললেন, "মা-জ্যাঠাইমা, তাদের কাছে আবার ছেলে বিচ্ছিরি কি ছিরিমন্ত!...যাক সে কথা; আর কিছু বললেন না?"

ঘাড়টা আরও একটু ওর দিকে ঝুঁকেছে, দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। দোলু একটু কুণ্ঠিতভাবে রতন-ঝির দিকে চাইতে উনি বললেন, "দেখি রতন।"

রতন হামানদিস্তাটা এগিয়ে দিতে দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হয়েছে, এবার তুই যা। কিছু পাঠিয়ে দে দোলুর জন্যে শীলাকে দিয়ে।"

ও চলে গেলে যেন উৎসুক হয়ে উঠেই বললেন, "হ্যাঁ, এবার বল, লজ্জার কিছু নেই।"

"নিশ্চয় সরিতের সেই ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করছেন জ্যাঠাইমা? লজ্জা করলে চলবে?"

বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন উনি, একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, "হ্যাঁ, সে কথাও।"

"সে সম্বন্ধে একেবারে কিচ্ছু নয় জ্যাঠাইমা। আমি তাই ভেবে সারা হচ্ছি সেই থেকে। আপনি ওঁকে এইজন্যেই আনালেন সেবার। আমায়ও

উনি ঐদিকে নজর রাখতে বলে গেলেন, অথচ কতদূর কি হলো সে বিষয়ে একটা কথাও নয়! জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে যে কথা হলো তাতে কিছু জিজ্ঞেস করছেন এ সম্বন্ধে?"

"কৈ, উনি কিছু বললেন না তো।" অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দিলেন বরদাসুন্দরী।

"শুধু কাজের কথাই হয়েছে?"

"হ্যাঁ, তাই তো বললেন উনি!" সেইভাবেই বললেন টেনে টেনে।

"একটু অদ্ভুত মানুষ জ্যাঠাইমা আপনার এই ঠাকুরপোটি"—নালিশের টোনেই বলল দোলু, "এ কথা আমি বলবই, রাগ করুন আর যাই করুন। কী করছেন, কী বলছেন পাত্তাই পেতে দেন না কাউকে।"

হাতের টানটা বেড়ে গেছে, হাসতে লাগলেন বরদাসুন্দরী। বললেন, "না রে, বড় চৌকশ মানুষ। যেদিকে কারুর নজর নেই সেদিকেও যে ওঁর নজর কখন্ কিভাবে গিয়ে পড়ে বোঝবার জো নেই। শীগ্‌গির একবার আসবেন বলেছেন। দেখবি, এসে ঠিক একটা সুরাহা করবেনই। একটু চাপা লোক। আসছেনই, সেইজন্যেই আর তোলেন নি ওসব কথা। আমি তো ওদিকটা ভাবিই না বাবা আর। ওঁর হাতে দিয়েছি, জানি উনি ভাবছেন।"

"ভাবতে হবে না ওঁকেও আর জ্যাঠাইমা, ভাববার লোক এখানেও আছে।" বোধ হয় প্রশংসার জন্যই আরও রাগটা নামতে চাইছে না দোলুর। বলল, "তবে আপনাকেও ভাবতে হবে না। সুরাহা আপনিই হয়ে আসছে।"

"সত্যি বাবা?" মুখে একটু হাসি নিয়ে হাতে টান দিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে, রতন-ঝিই প্লেটে করে খাবার নিয়ে এল, বলল, শীলা আসতে পারল না। কি একটা কাজ আছে বলল।

"ঐ এক মেয়ে হয়েছে—কাজের সময় অকাজ, অকাজের সময় যত কাজ!"

"হ্যাঁ, ওটাকে আপনার চৌকোশ দেওরের হাতে দিয়ে দিন তো, শায়েস্তা করে ছাড়ুন।"

রাগ করতে গিয়ে হেসেই ফেললেন বরদাসুন্দরী, বললেন, "তা যা বলেছিস, উনিই এসে পারবেন।"

॥ ছত্রিশ ॥

আরও সপ্তাহখানেক কাটল।

মোটামুটি একভাবেই চলেছে এদিকে। পার্টির ব্যাপারটা মনে হয় যেন অনিশ্চিতকালের জন্যই পেছিয়ে গেল। মিস্টার রায় খুব ব্যস্ত নূতন কাজটা নিয়ে। মাঝে মাঝে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে দোলুকে জিজ্ঞেস করে নেন, কতদূর হলো; নিতান্ত পাশে রয়েছে বলেই। পরিস্থিতিটা বোঝে দোলু। বলে, ওরা লেগে রয়েছে, তবে ছোটখাটো বাধার কথা তুলে চালিয়ে দেয়, কোনটা কাল্পনিক, কোনটা হয়তো সত্যই।

সরিতের আপিসে আসাটাও পেছিয়ে যাচ্ছে। একদিন এমনি কথাচ্ছলেই ও প্রস্তুত আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে দোলু বলল, "হরবিলাসবাবুকে স্বর্ণার তালিমের জন্যে চেম্বারটা দিয়ে সত্যসত্য ও-ব্যবস্থাটা বাতিল করা ঠিক হবে কি?"

ভালই লাগল কথাটা ওঁর, বললেন, "মন্দ বল নি, অতটা স্ট্রাইক (strike) করে নি আমার। তবে থাক ক'টা দিন।"

এর পর আর একটা ব্যাপার হলো যার জন্য আপিসে যে আসতেই হবে সরিতের এ প্রয়োজনটা অনেকখানি কমে গেল। আইডিয়াটা আলোকের।

ওদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম হয়ে এসেছে এই কটা দিনেই। ওরা যেদিন আসে, সামাজিক সৌজন্য হিসাবেই তার পরদিন সরিৎকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুরে দেখা করে এল দোলু। অবশ্য সরিৎ রয়েছে, কেতকীকে নিয়ে কোন কথা হলো না। তবে উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। তার পর, সরিতের কথা হলো না বলেই পরদিন সন্ধ্যার পর আবার ওরা দুজনে আগে ফোনে ঠিক করে নিয়ে দোলুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সরিৎ কখনও কখনও এসে পড়ে বলে তাকে দোলু অফিস-ফেরতাই জানিয়ে এসেছিল থাকবে না বাড়িতে সন্ধ্যায়।

সরিৎ-কেতকী সমস্যা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। অভ্যাস যায় না, মাঝে মাঝে বুকনি এনে ফেলে বাসবীকে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করলেও, আজ মূল আলোচনায় বিষয়টার গাম্ভীর্য রক্ষা করেই গেল আলোক। ভেবেছে, স্বামী-স্ত্রীতে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাড়িতে, তারও প্রমাণ পেয়ে যেতে লাগল দোলু। কথাবার্তার সময়ই একসময় বাসবী আলোকের দিকে চেয়ে

বলে উঠল, "আর তোমার সেই প্ল্যানটা, বল না দোলুদাকে।…মন্দ বের করেন নি মাথা থেকে।"

প্রশংসাটুকুর জন্যই আলোক বলল, "তুমিই বল না, এমন বিরাট আর কি? তাও যদি রাজি হন তবেই। তার চেয়ে তুমি যে প্ল্যানটা এঁটেছ সেটা বরং…"

বাসবী হঠাৎ একটু চোখ কুঁচকে উঠতে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নেওয়ার জন্য বাসবী বলল, "তোমার প্ল্যান, তোমারই ক্রেডিট্ (Credit), তাই বলছিলাম। বেশ বাপু, আমিই বলছি।…সরিৎদার মনটা কেতকী থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিলাম আমরা দোলুদা যতরকমে পারা যায়। একটা হচ্ছে, আপিসে যাচ্ছেন না, আপনি বলছেন দেরিও আছে—তা বেশ তো, বড় কাজটা যে পেয়েছেন তাই নিয়ে বাইরে বাইরে ঘোরান না মামা ওঁকে। এই যে সমস্ত দুপুর-বিকেল একলা বসে বসে ভাবা—মনটা সরে যাবেই এ থেকে। তার সঙ্গে আরও একটা কথা। প্রথমটা না হয় ঘুরে ফিরে নিজের ঘরেই ফিরে এলেন, তার পর আস্তে আস্তে কাজ জমা হতে হতে ঘরে আর যখন কুলুবে না তখন—এত যে খোশামোদ—আপনিই সেধে আপিসে গিয়ে উঠতে পথ পাবেন না। এক মতলবে দু কাজই…"

"প্ল্যানের এই দ্বিতীয় অংশটা আমার নয় দোলুবাবু, কোনও এক উর্বরতর মস্তিষ্কের সৃষ্টি।"—চুরুটটা মুখ থেকে সরিয়ে মন্তব্য করল আলোক। একটু হেসে বলল, "মনে হবে ভগ্নীপতির ঠাট্টা, কিন্তু আসলে ওটা জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠার…"

"ব্যস্, আরম্ভ হলো!"—ঘুরে চোখ পাকিয়ে বলল বাসবী।

আলোচনা এইরকম হালকাভাবেই শেষ হয় প্রায়; তবে রীতিমত ভাবে দুজনে। এর মধ্যে কেতকীর সংস্রবটা তো অজ্ঞাতই মিস্টার রায়ের, দোলু সরিৎকে আপিসে এনে ফেলার গৌণ অভিসন্ধিটাও বাদ দিয়েই বলল ওঁকে। ওঁরও পছন্দ হলো কথাটা। তবে, না বললেও উনি ঐ শঙ্কাটুকু নিজে হতেই প্রকাশ করলেন, আপিসে টেনে আনার কৌশল হিসাবে নেবে না তো সরিৎ? কাজ করতে করতে ফাইল বাড়বে, প্রাসঙ্গিক অন্য সব ফাইলের দরকার হবে আপিস থেকে, বাড়িতে বসে ফোনের ভরসায় চলবে না তো।

বাসবীর কূটচালটা সঙ্গে সঙ্গে কেমন ওঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে দেখে হঠাৎ একটু হাসি ফুটে উঠল দোলুর মুখে, সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলল, "কথাটা

আমি অন্যভাবেই তুলব ওর কাছে, অর্থাৎ রাজি হয় তো বলি আপনাকে। কথা যে আগেই হয়ে গেছে সেটা আর জানাব না।”

এবার হাসি ফুটল মিস্টার রায়ের মুখে; দোলুর কূটবুদ্ধি দেখে নিশ্চয়। বললেন, “বেশ, তাই ছাখ বলে।”

বেশ ফল পাওয়া গেল; অপ্রত্যাশিত রকম। কাজ পেয়ে এত মেতে উঠল সরিৎ যে, ওকে ওর আত্মনিপীড়ন থেকে উদ্ধার করবার এই অতি-সামান্য উপায়-টুকুর কথা আগে মনে পড়ে নি কেন ভেবে অনুতাপই হলো—দোলু, মিস্টার রায়, দুজনেরই। প্রথম দুদিন মিস্টার রায়ই সঙ্গে করে, নূতন কাজটার জন্য নূতন-পুরাতন যে-সব পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। তার পর থেকে খাওয়াপরা সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিজেই মোটরে করে বেরিয়ে যেতে লাগল সরিৎ—কাজের দায়িত্বের চেয়ে যেন মুক্তির আনন্দেই। মিস্টার রায়ের সঙ্গে সকালেই বাড়িতে ওঁর অফিসঘরে বসে আলোচনা করে, সমস্ত দিনের একটা কর্মসূচী ঠিক করে নেয়, তার পর বেরিয়ে যায়। একদিন ওঁকে বলে দোলুকে নিয়ে বর্ধমানের কাছে জায়গাটাও দেখে এল, কাজের প্রকৃতি আর সংস্থান নিয়ে সমস্ত কাজটুকুর একটা পরিপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে থাকলে সুবিধা হয়।

শুরু করার পর হপ্তাখানেকের মাথায়। আজকাল ফিরতে একটু রাতই হয় মিস্টার রায়ের, সেদিন ফিরে আর বেরুলেন না। ওরা দুজনে প্রায় সন্ধ্যার সময় যখন ফিরল, উনি পাইপ মুখে একটা ড্রেসিং গাউন পরে সামনের বারান্দাতেই পায়চারি করছিলেন, অন্য কিছু প্রশ্ন না করে বললেন, মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি বাড়িতেই আছি।”

বেশ খানিকটা সময় দিয়ে, যখন ওরা সামনাসামনি হয়ে সিগারেট টানছে, ওঁর আর্দালী এসে খবর দিল, ডাকছেন; শুধু দোলুকেই।

আপিসঘরে নিজের টেবিলের সামনে বসেছিলেন মিস্টার রায়, দোলু গিয়ে দাঁড়ালে বললেন, “একটা ভুল হয়ে যাচ্ছিল হে কাজের চাপে। তোমার তো মাস দুই হয়ে গেল, অথচ…”

কোন কাগজ-কলমে অর্ডারের ওপর কাজ করছিল না দোলু, হয়তো ওর উপযোগী একটা জায়গা ঠিক করতে পারছিলেন না মিস্টার রায়। তবে মাইনে একটা মোটারকমই পেয়ে যাচ্ছিল। সেটাকে দেড়া করে দিয়ে, মর্যাদাসম্পন্ন একটা পদবীও দিয়ে আপিসের মোহর দেওয়া একটা পার্চমেণ্ট কাগজ ওর

সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "এটা রাখ। কাল সকালে শুনব সব তোমাদের দুজনের কাছে, কি ইম্প্রেশন্ (impression) নিয়ে এলে সেখান থেকে।"

ফিরে এসে কাগজটা সরিতের হাতে দিল দোলু। সরিৎ দেখে নিয়ে বলল, "বাবা সহজে এত সেন্টিমেণ্টাল (sentimental) হয়ে পড়েন না। খুব খুশী হয়েছেন তোর ওপর।"

"কিন্তু আমি কৈ পারলাম খুশী হতে ?···আদপেই বলি।"

"কেন ?" বন্ধুর মনের ভাবটা বুঝে নিয়ে প্রস্তুতই ছিল সরিৎ, বলল, "আমার বকশিশ কোথায়—এই না ? বাবা জানেন কাকে খুশী করতে হলে কাকে আগে খুশী করতে হয়,নইলে এতবড ফার্ম্‌টা প্রায় একাই দাঁড করাতে পারতেন না।"

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ক্লান্তই ছিল, প্রায় দেড়শ মাইল ঘুরে এসেছে, তবু বাড়ি না গিয়ে সোজা আলিপুরেই চলে গেল দোলু। বাসবী-আলোককে না শুনিয়ে পারছে না। ওর পুরস্কারের কথা নয়, সরিৎকে কতটা আপিসের কাছাকাছি এনে ফেলেছে এই ক'টা দিনে, সেই কথা। আর আজকে একঝোঁকে একেবারে কতখানি ; কেন না ওকে পুরস্কৃত করার মধ্যে যে সরিতের প্রতিও মিস্টার রায়ের স্নেহের ইঙ্গিত রয়েছে একথা—সরিৎকে তখন যাই বলুক না কেন, দোলু তো বোঝেই।

দুজনেই ছিল ওরা। চায়ের গোলটেবিল-বৈঠকে পরামর্শ করতে লাগল, যেমন চলছে মাঝে মাঝে। আলোক বাসবীকে বলল, "আর দেখতে হবে না, এদিককার কাজ আপ্‌সেই হয়ে যাবে। এবার ছাখ, তোমার হাতের সেই টেক্কা-বিবি-গোলামের কোন্‌টি ছাড়বে !"

বাসবী বলল, "মন থেকে কেতকী বেশ খানিকটা যাক, এই তো সবে আপিসের দিকে একটু ঝোঁক হয়েছে।"

আলোক বলল, "যাবেই ! এক বনে দুই সিংহের মতন এক মনে আপিস আর কেতকী দুই থাকতে পারে না।"

"তা হলেও আপিস-সিংহ বেশ ভাল করে মনটা দখল করে নিক আগে, কি বলুন দোলুদা ? আর, এবার যে আসবে তাকে তো আপিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসতে দিলেও চলবে না। সে আসবে কল্যাণরূপ নিয়ে। আমার বাছাইও

ঠিক হয়ে গেছে। প্ল্যানও ঠিক। পার্টির দিনেই তাকে নেমন্তন্ন করে এনে পরিচয় করিয়ে দোব ঠিক করেছি। এখন যত শীগ্‌গির আপনারা ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন। আপিস আর আপিসের বাইরের জীবন নিয়ে সরিৎ রায় বলে যে মানুষটি, তার সমস্তটিকেই আপন করে নেওয়ার মতন মেয়ে অসিতা। তখন আর অপর সিংহ রইল কোথায় যে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা? সে তখন…"

"দোলবাবু মনে করবেন…", মৃদু হাসির সঙ্গে একটু ঘাড় উল্টে চুরুট টানতে টানতে আলোক শুরু করতেই, উচ্ছ্বাসের মুখে থেমে গিয়ে বাসবী প্রশ্ন করল, "কি মনে করবেন?"

"মনে করতে পারেন তুমি সংকেতে নিজের কথাও বলে নিচ্ছ।…না দোলু-বাবু, আমি অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে বাসবী সত্যিই ঐরকম কল্যাণরূপেই আমার জীবনে…"

"বাবা, বাবা! তোমার কি এ ছাড়া আর কাজ নেই গা!" উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল বাসবী, বলল, "তা যদি পারতাম কল্যাণরূপে আসতে তা হলে তোমার এই খুনসুটিপনা আগেই ঘোচাতাম না?…বলুন দোলুদা?

দুলে দুলে হাসতে লাগল আলোক। দোলুও প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে হেসে বলল, "এ তো হলো আলোকবাবুর প্ল্যান, বেশ কাজও শুরু হয়েছে। তোমারও যেন কি একটা আছে মনে হলো সেদিন—তিন কন্যা ছাড়া; যদি আপত্তি না থাকে…"

একটু ভাবল বাসবী ঘাড় হেঁট করে, তার পর মুখ তুলে একটু লজ্জিতভাবেই বলল, "সে আমি বলতে পারব না দোলুদা; মনে করবেন বাসবীটা কী ফিচেল! তার চেয়ে একেবারে যখন হয়ে যাবে তখন আপনিই টের পাবেন।"

"তাতে মনে হবে না—বাসবীটা কি দ্বিগুণ ফিচেল? তার চেয়ে আমিই না হয় বলি—তোমার যদি লজ্জা করে?"

শিউরে উঠল বাসবী, বলল, "না, দোহাই! তুমি লজ্জা বাড়াতেই জান, কমাতে শেখ নি। আমিই বলছি।…লজ্জার কথা কী এমন দোলুদা? দোষের কথাই বা কি? যা সব চোখের সামনে ঘটতে দেখছি তার সুযোগ নেব না—যদি তাতে নিজের লোককে বাঁচাতে পারি? সেদিন আপনাকে বললাম কেতকী এখন সবাইকে ঝুলিয়ে রেখে দু-তিনজনকে নিয়ে পরীক্ষা করছে। তার পর একটু বেশী লক্ষ্য রেখে এখন প্রায় এইটেই পাকা মনে হচ্ছে যে উপস্থিত বিলোলই নম্বর ওয়ান। ভাল কথাই; একটা যদি ঠিক করে ফেলে। তবে

দোষের এই হয়েছে যে আর সবগুলিকে হাতছাড়া করছে না একেবারে। আমাদের দিক দিয়ে ভাববার কথা এই যে, এদের মধ্যে সরিৎদা একেবারে নতুন বলে ওঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু মনস্থির করে উঠতে পারে নি। অথচ, আমি জানি খানিকটা প্রশ্রয় পেলেও শেষ পর্যন্ত সরিৎদাই পেরে উঠবেন না বিলোলের কাছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত আমাদের বলুন না।"

"তোমার তিন কন্যার একটি ওদিকে যদি···"

বাসবী ঘুরে বলল, "দোহাই তুমি থাম। অমন অনেক কন্যা বিলোলের হাতে আছে। ওদের জান না তো।"

তার পর দোলুর দিকে চেয়ে বলল, "আপনি আমার সম্বন্ধে যাই ভাবুন দোলুদা, আমি ইতিমধ্যে একটা কাজ করেছি। এটা করেছি—ঐ যে বললাম, নিজেদের স্বার্থেই, সেদিন সরিৎদাকে ওখানে দেখার পর। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে যখন দেখলাম কেতকী ওঁকেও আর সবার মতন খেলার পুতুল করে নেওয়ারই মতলব এঁটেছে মনে। আমি ওর বাড়িতে একটি গোয়েন্দা বসিয়ে রেখেছি।"

মুখের দিকে চেয়ে চুপ করতে দোলু বলল, "থামলে কেন? আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। কেন, আলোকবাবুর কি অপছন্দ?"

আলোক বলল, "কিছুমাত্র নয়। একজনের হাতের খেলার পুতুল না হয়ে আর একজনের হাতের হওয়া।"

বাসবী একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে বলল, "বাজে কথা থাক দোলুদা। যেমন বললাম, আমি কেতুর প্রোগ্রাম মোটামুটি যা টের পাচ্ছি তা থেকে বেশ বোঝা যায় তার ঝোঁকটা এখন বিলোলের দিকেই বেশী। এবার এইটুকু শুধু সরিৎদাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। দোষের আছে কিছু? আমি বলি আগে মনটা ভাঙুক ওদিকে ভাল করে···"

"আর যদি মেয়েজাতটার ওপরই···মানে, নারীজাতির সম্বন্ধেই মন ভেঙে গিয়ে লোটা কম্বল···"

"তুমি নিয়েছ?"—বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল বাসবী।

আলোক বলল, "সময় পেলাম কোথায়? এক হাত থেকে খসে সঙ্গে সঙ্গে আর এক হাতে। তাই তো বলছিলাম, সরিৎদার বেলায়ও এদিকে একজন হাত পেতে রেডি থাকলে হতো না?"

রহস্য করে বলা হলেও বাসবী যেন শুনল একটু মন দিয়ে, তার পর আবার দোলুর দিকে চাইল। এবার দোলু কিছু মত দেওয়ার আগে নিজেই বলল, "সে তো হাতের পাঁচ। অসিতার কথা বললামই, বংশে, স্বভাবে, শিক্ষায় আমরা যেমনটি চাই সেইরকম মেয়ে, দরকার বুঝি তো, পার্টির আগেই তাকে টেনে নেব। এখন শুধু সরিৎদার চোখ ফুটিয়ে দেওয়া একটু। আমি তক্কে তক্কে রয়েছি দোলুদা, আপনাকে জানিয়ে দেব, ফোনে বা এসেই, বা আপনাকে ডেকে নিয়েই—যেমন সুবিধে হয়। আপনি সরিৎদার দিকটা ম্যানেজ করবেন। কেমন, এই ব্যবস্থাই থাক আপাতত?"

একটি টানা নিঃশ্বাস পড়ল আলোকের।

"ওকি, দীর্ঘনিঃশ্বাস যে!"—বলে আবার ঘুরে চাইল বাসবী। আলোক সিগারেটের আড়ালে হেসে বলল, "ওটা কিছু নয়। যতদিন বইছে নাকে, কখনও হ্রস্ব কখনও দীর্ঘ হয়েই বইবে তো?"

॥ আটত্রিশ ॥

একদিন এই ব্যবস্থা অনুযায়ীই চিড়িয়াখানায় ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখল সরিৎ। সাদা বাঘ দেখবার হিড়িক পড়েছে; ওদিকে ওরা দুজনই, এদিককার দলে দোলু, সরিৎ, শীলা আর সলিল। খাঁচার সামনে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, দোলু এগুতে এগুতে দূর থেকেই বলল, "বিলোলবাবু না?"

নিজেই উত্তর করল—"ওরা দুজনেই তো।"

তার পর সরিতের হাতটা একটু টিপে বলল—"থাক্, আমরা ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি আগে।"

—অর্থাৎ শীলা, সলিল সঙ্গে রয়েছে। ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে সরিৎ বলল— "হ্যাঁ, তাই চল্।"

যেতে যেতে বারকয়েক ফিরে চাইল সরিৎ। তার পর বেশ খানিকটা ঘুরে দোলু যখন ফিরতে চাইল খাঁচার দিকে, বলল—"আমার একটু যেন…"

"ক্লান্ত মনে করছিস?" প্রশ্ন করল দোলু। একটা চায়ের স্টলের কাছাকাছি এসে পড়েছে, বলল—"চল্, একটুখানি না হয় বসা যাক।"

চা পান করে একটু জিরিয়ে নিয়ে যখন ওঠবার কথা বলল, সরিৎ বলল—"তোরা বরং ঘুরে আয়, আমি বসিই আর একটু।"

এর পর দুদিন সিনেমায়। ইংরাজী সিনেমা, একদিন মেট্রো, একদিন লাইটহাউস। পরে আর একদিন শুভলক্ষ্মীর নৃত্যে নিউ এম্পায়ার। সমস্তটা বাসবীর কলকাঠি নাড়া। কেতকী যে অন্য কারুর সঙ্গে যাচ্ছে না কোথাও এমন নয়, তবে শুধু যেদিন বিলোলের সঙ্গে যাচ্ছে, সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়ে সেইদিনই সেই জায়গাটিতে সরিৎকে দিচ্ছে পৌছে; দোলু সঙ্গে থাকেই, আরও যদি কেউ রইল। খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে, এমন নয় যে যেখানে যাচ্ছে ওদের দুজনকে পাচ্ছেই দেখতে সরিৎ। আজকাল মনটা আছে ভালো, ভালো জিনিস থাকলে যায় এখানে-ওখানে। দুটো দিন বাসবী-আলোকও টেনে নিয়ে গেল; একটা দিন ছিল কেতকী আর বিলোল, একটা দিন ছিল না। অর্থাৎ ব্যবস্থাটা এমন যে যেন দৈবাৎ হয়ে যাচ্ছে দেখা।

দেখাও-যে তা একতরফাই; সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা—সেদিকে কিছু নয়। ব্যবস্থা করেই ওদের সীটের বেশ খানিক পেছনে নিজেদের জায়গা করে নেয়। এরা ওদের দুজনকে দেখতে পায়, ওরা পায় না। সন্দেহেরও তো কোন কারণ থাকে না।

নাটের গুরু অবশ্য বাসবীই, তবে হয় তিনজনের মিলিত পরামর্শেই। উদ্দেশ্য যে খুব খারাপভাবে দেখানো, তাও নয়। শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে দেওয়া যে কেতকী বিলোলকেই নিয়েছে বেছে। ও স্বয়ংবর-সভা এখন ভাঙা আসর। সুতরাং···

বাড়াবাড়িও নয়। এইরকম চারটি যোগাযোগের পরই চিকিৎসার পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ একটা ব্যাপারে—

রবিবার। সরিৎদের বাড়ি ছোটখাটো একটা প্রীতিভোজ ছিল। দোলু চাকরি নেওয়ার পর দুটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। এদিকে এরা সবাই, অপরদিকে বাসবীরা নূতন এসেছে, তার শ্বশুরবাড়ির সবাই। দোলুদের সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ফলে দোলুর বোন রাধার সঙ্গে শীলার পরিচয়টা অন্তরঙ্গতায় দাঁড়িয়েছে, বেশ জমে দুজনে, যাওয়া-আসা লেগেই আছে। শীলার তরফ থেকে কিছু উদ্দেশ্য থাকাও আশ্চর্য নয়।···রাধা মেয়েটি চমৎকার।

আহারের পর দোলু সরিৎ আর আলোক সরিতের ঘরে বসে সিগারেট-চুরুটের সঙ্গে-সঙ্গে গল্পগুজব করছিল, বাসবী এলে দোলু আর সরিৎ উঠবে। ও আসবার পরও চলল একটু গল্পের জের। তার পর উঠতে হবে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

দোলুর কাছেই ছিল, তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল—"হ্যাল্লো!"

"মিস্টার সরিৎ রায় আছেন?"

দোলুর জ্রদুটো যে একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল সেটা ওদিককার কণ্ঠস্বরে। খানিকটা হাতে রেখে বলল, "ভেতরে আছেন, ডেকে দোব?"

"হ্যাঁ, দিন একটু দয়া করে।"

"এক্ষুনি দিচ্ছি। কি নাম বলব?—যদি আপত্তি না থাকে আপনার। আমি ওর বিশেষ বন্ধু।"

মুহূর্ত কয়েকের বিরতির পর, "বলবেন মিস্ আইচ ফোন করছে।" ফোনের মুখটা চেপে খানিকটা সরিয়ে ধরে দোলু চাপা গলায় ওদের বলল, "মিস্ আইচ!"

সরিৎ ক্লান্তভাবে একটু টেনে টেনে বলল—"আবার—এখন…একেবারে বাড়ি নেই বলে দিলেই পারতিস—দে দেখি।"

"দাঁড়া একটু। নীচে থেকে আয় আগে।"

"আসছিলামই।"—একটু ঝুঁকে তুলে নিল—

"মিস্ আইচ? নমস্কার। ব্যাপার কি?"

"গুরুতর কিছু নয়। নিউ এম্পায়ারে লণ্ডনের একটা বিখ্যাত ব্যালে পার্টি (Ballet party) নেক্সট্ উইকে আসছে শুনেছেন বোধ হয়।"

"নিউ এম্পায়ারে ব্যালে পার্টি?"…এদের শুনিয়ে প্রশ্ন করল সরিৎ। বলল—"দেখছিলাম বটে কাগজে।"

"ফরচুনেট্‌লি প্রথম দিনেই খানসাতেক সীট পেয়ে গেছি। আসতে হবে আপনাকে। প্রথম শো'তেই।"

"আসতে বলছেন?"—এদের শুনিয়েই বলল, তবে দৃষ্টিটা ওপরে তুলে; মুখের কয়েকটা রেখা যেন একটু কুঁচকেও উঠল।—বলল—"সোমবার তো? অসম্ভব। ফার্ম্ম্ একটা বড় গবর্নমেণ্ট কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছে বর্ধমানের কাছে, রাত দশটা হয়ে যাবে। সরি।"

"একেবারে অসম্ভব? না, করুন কোন একটা ব্যবস্থা; ভয়ানক মিস্ (miss) করব আমরা সবাই।"

"কোন রকমে সম্ভব হলে এতবড় লোভ কখনও ত্যাগ করতে পারি? আমার কথা মনে করবার জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ। আছেন কেমন বলুন।"

"যতক্ষণ আশায় আশায় ছিলাম, ভালোই তো ছিলাম। এর বেশি কি বলি?"

"ভয়ানক দুঃখিত, বিশ্বাস করুন।"

"কি করা যায়? এবার মেনে নিতে হলো। প্রতিবারই কিন্তু ফার্মের দোহাই চলবে না।...আপনি আছেন কেমন? অনেকদিন দেখা হয় নি।"

"অনেকদিন দেখা না হলে যেমন থাকা সম্ভব।" একটু রহস্যের হাসিও ফুটল সরিতের মুখে, বলল—"আচ্ছা আসি এখন তা হলে। পেলাম তো মার্জনা? নমস্কার।"

"নমস্কার। কিন্তু ঐ শেষ কথা আমার। ফার্ম্ ছাড়া আরও কেউ থাকতে পারে এটুকু ভুললে চলবে না।"

দোলু আর আলোক কান এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দোলু প্রকৃতই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বলল—"গেলি নি কেন? এত করে বললে।"

একটু রেগেই উঠল সরিৎ, বলল—"ব্যালে অ্যাটেণ্ড (attend) করবার ফুরসত দেখছিস খুব!"

॥ ঊনচল্লিশ ॥

অনেকটা তা-ই বৈকি। কাজের মধ্যে সত্যই একেবারে ডুবে রয়েছে সরিৎ, যদিও আজকের এই প্রত্যাখ্যানের মূল কোথায় সেটা বুঝতে বাকি থাকে না কারুরই।

ব্যালেটা কিন্তু ওরা দেখল একদিন। এ ব্যবস্থাটা হলো দোলুরই পরামর্শে; আজকের এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন ওদের তিনজনের আলোচনা হলো আলোকদের বাড়িতে। সেই দিনই সন্ধ্যার পর। দোলু বলল, আর সব কিছু থেকে মনটা টেনে নিয়ে নিরবশেষভাবে কাজে ঢেলে দেওয়া—এও তো একটা সুস্থ লক্ষণ নয়। হয়তো অভিমানই নিজের জীবনের ওপরে, এক ধরনের বৈরাগ্যই।

ওকে একদিন টেনে নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। অন্তত চেষ্টা করে দেখাটা দরকার।

তার পরদিন সরিৎদের বাড়িতে সন্ধ্যার পর সবাই একত্র হয়েছে, দু-একটা কথা কয়ে বাসবী ভেতরে চলে যেতে আলোক কথাটা তুলল। নিতান্তই একটা সাময়িক প্রসঙ্গ হিসাবে। পার্টিটা নাকি সত্যই খুব নামকরা, ওদের আপিসেও বেশ সাড়া পড়ে গেছে। অ্যামেরিকান কোম্পানীর আপিস, সাহেব-সুবো রয়েছে অনেকগুলি। ওকেও টানছিল। ও বলেছে—দাঁড়াও বাপু, নতুন ট্রান্সফার হয়ে এসে যা কাজের চাপ—এখন নাকি ব্যালে দেখতে যাবে!

একটু চুপচাপ, তার পর দোলু বলল—"আমার ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, কিন্তু যা আপনাদের কাজের দোহাই পাড়া—দুজনেরই—সঙ্গী না পেলে একা একা যাওয়া, সে পোষায় না।"

"যেতে চাস তুই?"—বেশ আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্ন করল সরিৎ, বলল—"পার্টিটা ভালোই। লণ্ডনের একটা নামকরা পার্টির টুরিং ব্যাচ—বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়।"

"সে বুঝেছি। দেখে অরুচি না ধরে গেলে যে শ্রীমতীর অমন লোভনীয় নেমন্তন্নটা প্রত্যাখ্যান করতে না এটা বেশ বোঝা যায়। এর পর যে দোলু হতভাগার ওপর এত সদয় হবে—কথা তুলতেই তো সাহস হয় না। বর্ধমানে কত কাজ সে তো আমার অজানা নয়।"

সব ঠিকঠাকই ছিল। তিনদিন পর্যন্ত টিকিট নেই, বাসবীর গোয়েন্দা বিভাগের খবর, চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার শো'তে বিলোল-কেতকী বুক্‌ড্। ওরা সেইদিন ম্যাটিনি, অর্থাৎ অপরাহ্ণের শো'র জন্য টিকিট নিল। ব্যালে ডান্স্—স্বভাবতই মাত্র পুরুষ তিনজনের, সরিৎ, দোলু আর আলোক।

না, বিলোল-কেতকীর যুগলরূপ দেখানোর কথাই আর আসে না। ওটা তো এদের আনন্দ ছিল না, ছিল প্রয়োজন। তা ভালো ভাবেই সিদ্ধ হয়েছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা বেশ আওয়াজ তুলেই গোল সিঁড়ি বেয়ে আসছে দোলু, সরিৎ ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসতে মাথার চুল খামছে বলতে বলতে এল—"ওরে রাস্কেল! কাল রাজী হয়ে যে কী জিনিসেই বঞ্চিত করেছিস্ আমায়!—তোর ছাই লণ্ডনের ব্যালে যে কত তুচ্ছানুতুচ্ছ তার কাছে!..."

সরিৎ বলল—"হলো আরম্ভ! ব্যাপারখানা কি বলবি তো?"

ওকে বাঁ হাতে জড়িয়ে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল দোলু, সামনা-সামনি হয়ে বসে বলল—"আবার দশমহাবিদ্যা মূর্তিতে শ্রীমতী স্বর্ণা চৌধুরানী—এবার অঘটনঘটনপটীয়সী ঘটকিনী রূপে।"

জিতেন ভাদুড়ী মিস্টার রায়ের স্টেনো, তারই রিপোর্ট। ছোকরা দোলুরও কাজ করে মাঝে মাঝে, আর বেশ নকুলে। মিস্টার রায় চেম্বারে না থাকলে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায় দোলু। একে-ওকে-তাকে নিয়ে নিত্যই কিছু-না-কিছু হচ্ছেই আপিসে, কাজের ধুয়ো ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে শোনে। প্রধান লক্ষ্য ওপরের ক'জন, নরহরি-জনার্দন-হরবিলাস-হারাণবাবুদের দল; মিস্টার রায়ও ওদের প্রসঙ্গেই এসে পড়েন কখনও কখনও, আজকাল আবার নূতন সংযোজন স্বর্ণা। ছোকরার মাত্রাজ্ঞান আছে, প্রশ্রয় পায় দোলুর কাছে। রিপোর্টটা তারই—

চেম্বারে একটা বড় ডিক্টেশন ছিল মিস্টার রায়ের। ছোটখাটো থাকলে জিতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টুকটাক করে টুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, কাল চেয়ার নিয়ে গুছিয়ে বসে খানিকটা এগিয়েছে, হারাণবাবু ঢুকেই বোধ হয় কাজ আন্দাজ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মিস্টার রায় টুকলেন—"বেশি কিছু আছে নাকি?" উনি জানালেন—"না, গোটা দুই দস্তখত একটা অর্ডার শীটে; একটু জরুরী, তাই..."

"নিয়ে আসুন"—বলে ডেকে নিলেন মিস্টার রায়। তার পর দস্তখত বসিয়ে, পুরনো লোক পেলেই ওঁর যেমন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে আজকাল, জিজ্ঞেস করলেন—"নতুন এক্সপেরিমেন্ট্‌টা যে করছি অ্যাকাউন্টসে মেয়েটিকে নিয়ে—আন্দাজ পাচ্ছেন কিরকম দাঁড়াবে?"

হারাণবাবুর আসার উদ্দেশ্যই এই। ভেতরকার কথা, জনার্দনবাবু স্বর্ণাকে তাঁর এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভোলেন নি। হারাণবাবু রোগ-বাইগ্রস্ত লোক, ছুটিছাটার বেশি দরকার হয় বলে বড়বাবু হিসাবে ওঁর একটু অনুগত, তাঁকে গোয়েন্দাগিরিতে লাগিয়ে রেখেছিলেন। হারাণবাবুও কার্য-সাধন করে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। কাল ঐটুকু পেয়ে উপস্থিত হন। ঢুকেই বেরিয়ে যাওয়া অবশ্য নির্লিপ্ততার অভিনয়।

মিস্টার রায়ের প্রশ্নের উত্তরে হারাণবাবুও হরবিলাসবাবুর মতোই একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার অবতারণা করেন—ওঁর নিজের সিলেক্‌শন, সে কখনও বাজে হতে পারে? তবে তাকে শেখালে তবে তো শিখবে? "ব্যাপারখানা কি?"

—বলে মিস্টার রায় আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন, জানালেন একটা ফাইল ওঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন হরবিলাসবাবু (অমন দেন মাঝে মাঝে। ওপরওয়ালা, তা ভিন্ন কাজ তো আপিসেরই, সামলে দেন হারাণবাবু), শেষ করে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন ওঁর চেম্বারে, ঢুকতে যাবেন, মেয়েছেলের গলা শুনে একটু থমকে দাঁড়াতে হলো। স্বর্ণার কথা ওঁর মনেই ছিল না। বড় শান্ত মেয়ে, (অন্য সব অফিসের মতো চুল ছাঁটা, বাহার দিয়ে—বেড়ানো মেয়ে তো রাখেন নি মিস্টার রায়) কখন্ আসে কখন্ যায় টের পাওয়াও যায় না—মেয়েলি গলা শুনে একটু থমকে গিয়ে কি করবেন ভাবছেন, তার মধ্যেই কতকগুলি কথা কানে ঢুকে গেল। আগে কি হয়েছে শোনা হয় নি। মাঝখান থেকে কানে গেল—'আপনার মেয়েকে কাল দেখতে এসেছিল জ্যাঠামশাই?' ...হরবিলাস বললেন—'এসেছিল, হলো না মা। হাতের-কাজের নমুনা দেখে পেছিয়ে গেল, গানের কথা আর তুললেও না। পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে, ওসবের পাটও তো নেই সেখানে। কী যে হবে!'...মেয়েটি বলছে—'আপনি নিয়ে আসুন জ্যাঠামশাই, আমাদের পাড়াতেই বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি। আর ট্রেনিং?—সে আমি নিজেই দিয়ে দোব, ছুটোতেই।'...'তুমি জান?'—উনি জিজ্ঞেস করছেন। মেয়েটি বললে—'কত প্রাইজ পেয়েছি, গান তো আমার একটা সাবজেক্ট্ই ছিল। থাক, সে তো পরের কথা, এর মধ্যে কেউ এলে আপনি এই হাতের-কাজগুলি মেয়ের বলে চালিয়ে দেবেন জ্যাঠামশাই! ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। পরের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছ ঘরে, আসল যা দরকার সেসব বাদ, গান, হাতের-কাজ—ওসব আদিখ্যাতা বুঝি নে আমি। আপনার যদি তাতেও করে মন খুঁতখুঁত, এই করে পার তো করে দিন, তার পর ঘর করতে যাওয়ার আগেই আমি এসব দিকে এমন তালিম দিয়ে দোব আপনার মেয়েকে যে...'

—হারাণবাবু বলেন, অবাক হয়ে গেছেন। শেষে কি করবেন, কি করবেন করতে করতে যখন এতখানি কানে গেছে সেঁদিয়ে, তখন চটক ভাঙল —এ সে মেয়েটিই নয় তো? স্যার যাকে নিয়ে নতুন এক্সপেরিমেণ্টটা করছেন! হুঁশ হলো, দাঁড়িয়েও রয়েছেন অনেকক্ষণ বাইরে। তাড়াতাড়ি ঢুকে দেখেন—র‍্যাশন ব্যাগ থেকে একগাদা হাতের-কাজ ঢেলেছে টেবিলের ওপর—লেস্, খঞ্চেপোশ, নকশাওলা রুমাল, টেবিল ক্লথ, আসন, বালিশের ঢাকনা—কী যে নয়!

"যেন ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছে স্যার! আজ্ঞে হ্যাঁ, একফোঁটা মেয়ে!"

যতদূর পারে রসিয়ে রসিয়ে বলে গেল দোলু যেমন যেমন শুনেছে জিতেনের মুখে। মাঝে মাঝে নিজের চুল খামছে ধরছে—ওর আপসোস, নিজের কানে শোনা হলো না তুচ্ছ এক ব্যালে ড্যান্স দেখার লোভে।

॥ চল্লিশ ॥

এ আপসোস পরের বার আর রইল না। এবার মাত্র দিন-চারেক বাদ দিয়েই।

টিফিনের পর চেম্বারের কোণে আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানছিলেন মিস্টার রায়। আজকাল রোজ এ অবসরটুকু জোটে না, আজ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই পড়ে আছেন। তবে বেশ অন্যমনস্কই, যেন কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত।

দোলু একটা বড় ফাইল ঘেঁটে নোট লেখবার তোড়জোড় করছিল, এক সময় হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা···তুমি ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখ?"

এতই আচমকা যে দোলুর মুখটা রাঙা হয়ে উঠল—আমতা-আমতা করে বলল—"কোন্ মেয়ে?"

মুখের দিকে চেয়েই রইলেন অন্যমনস্ক হয়ে, সেই কি-এক চিন্তাটা ভেতরে ভেতরে কাজ করছে, তার পর বললেন—"ঐ যে গো, অ্যাকাউণ্টস্ সেক্শনের মেয়েটি, সুবর্ণা নাম না?"

না, খোঁজ রাখে না একেবারে দোলু, তবে উত্তরটা কিরকম ভাষায় দিলে শোভন হবে ভাবছিল, উনি সেইরকম অন্যমনস্কভাবেই বললেন—"কলিং বেলটা টিপে দাও তো।"

আর্দালি এসে দাঁড়ালে বললেন—"হারাণবাবু।"

হরবিলাসবাবু একটা ফাইল নিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ওঁকে আরাম করতে দেখে, মিস্টার রায় বললেন—"আসুন। দরকারী?"

"আর্জেন্টই স্যার। তাই···"

"আসুন।"

"উনি বললেন, 'নেই যে একেবারে বলতে পারি না। মনে হয় একটু একটু টান ওঠে মাঝে মাঝে।'

" 'তা হলে এই সময় সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। গাছ-গাছড়া চেনেন? মা-র কাছ থেকে জেনে নিয়ে এসে বলে দিলে যোগাড় করে নিতে পারবেন? আমি না হয় র‍্যাশনব্যাগে নমুনাও নিয়ে আসব কিছু কিছু।'

"এর পরেই উঠে পড়ল মেয়েটি স্যার। সামনের র‍্যাশনব্যাগটা ছিল, তুলে নিয়ে বলল—'একটু আসছি কাকাবাবু। জনার্দন জ্যাঠামশাইয়ের টিফিনটা করিয়ে আসি। মনে করবেন দেখেছ, চেম্বার ছেড়ে গেছে, আর সম্বন্ধই রাখে না কোনও।'

"পেছন ফিরে বসে ছিল দরজার দিকে, রসময় বলে উঠতেই ওকে দেখতে পেয়ে একটু যেন গেল হয়ে অপ্রস্তুত। তবে বিশেষ কিছু নয়, এদিকে আবার বেশ চটপটে আছে তো। ও বেরিয়ে গেলে রসময় ওটা মিলিয়ে নিয়ে চলে এল। এই অবস্থা স্যার। শার্প হতে বাধা কি? তবে ঐ যে বললাম..."

ফাইলটা উলটেই যাচ্ছিলেন মিস্টার রায়, দু-জায়গায় টিক্ মার্ক দিয়ে দস্তখৎ করে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন—"আচ্ছা, আপনি আসুন।"

রবারের পাউচ্ থেকে তামাক বের করে পাইপে ভরে আবার টেনে যেতে লাগলেন। দোলু নোট লিখতে শুরু করে দিল। একটু আতঙ্কিতই ভেতরে ভেতরে, আবার মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস না করে বসেন। এক সময় বললেন—"বেলটা টিপে দাও তো।"

আর্দালি এসে দাঁড়ালে বললেন—"নরহরিবাবু।"

খুব জমেছে আজ। এবার চূড়ান্ত কিছু প্রত্যক্ষ করবার প্রস্তুতিতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল দোলু।

দেখল একটু পরে নরহরিবাবু চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে সামনে চালাতে চালাতে থপ্ থপ্ করে এসে উপস্থিত হলেন।

সমস্যার কিছু হলে ওঁকে ডাকেন মিস্টার রায়, নয় তো একটু স্পষ্টবক্তা বলে সাধারণত দূরে দূরেই থাকতে দেন। মোটামুটি একটা আইডিয়া দিয়ে প্রশ্ন করলেন—এরকম অবস্থায় দিনকতক ওঁর চেম্বারে বসিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন কিনা।

একেবারে শিউরে উঠলেন নরহরিবাবু। বললেন—"না স্যার, এমনি জোর করে পাঠিয়ে দেন, কি করব, নিরুপায়, তবে যদি জিজ্ঞেস করেন—করেস্‌পনডেন্স,

রেকর্ডস্, সেল্স্, অ্যাড্ভার্টাইজমেণ্ট—কোনও ডিপার্টমেণ্টেই পাঠাতে পরামর্শ দোব না। ও এক পাকা গিন্নী এনে অফিসে তুলেছেন কোথা থেকে! কাকে গোকুলপিঠে, মুগসামলি, শঙ্কচাকলি, ভাজাপুলি খাওয়াতে হবে; কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, তালিম দিয়ে তোয়ের করে দিতে হবে, সব ওর ভাবনা! তার পর শুকনো-কাঁচা হরেকরকম গাছগাছড়ায় টেবিল তো বোঝাই করে ফেলেছে স্যার! ঐ এক ফোঁটা মেয়ে, টোটকায় সেকেলে ঠান্‌দিদিদের নাক কাটে! দেখে যাচ্ছি মুখ বুজে—একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছেন, অ্যাপয়েণ্ট্‌-মেণ্টের পর আর জিজ্ঞাসা করেন নি, ওপর-পড়া হয়ে বলতেও পারছি না।"

"মেয়েটি বড় দুঃস্থা নরহরিবাবু"—একটু সঙ্কুচিত হয়েই বললেন মিস্টার রায়—"তাই ছাড়তেও পারছি না; বড় ভালোও তো এদিকে। আচ্ছা যান আপনি, দেখি কি করা যায়।"

উনি চলে গেলে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন। দোলু নোট লেখা শুরু করে দিল। ঘরের বাতাসটা এমন থমথমে হয়ে গেছে যে, অনেকক্ষণ পরে উনি যখন ওর নাম ধরে ডাকলেন, একটু চমকেই উঠল দোলু। হাত বাড়াতেই যাচ্ছিল ঘন্টির দিকে, উনি বললেন—"না আর্দালি নয়, আমি বলছিলাম—ওকে এই ঘরেই এনে ফেললে কেমন হয়? তোমার টেবিলে বসত দিনকতক।"

"আমার টেবিলে !!"—সোজা হয়ে বসল দোলু। অত যে হাসিতে পেট গুরগুর করছিল, নিমেষে কোথায় উবে গিয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল, ঘাম জমে উঠল কপালে। উনি অন্যমনস্কভাবে নিজের চিন্তা নিয়ে একটু চেয়েই রইলেন ওর দিকে। দোলু আর কিছু শোনবার ভয়ে বহু কষ্টে একটু হাসি টেনে নিয়ে এসে বলল—"বড় বড় হাতি তলিয়ে গেল, আমি একটা ক্ষুদ্র শেয়াল বৈ তো নয়…"

কোথায় শুড়শুড়ি দিল কথাটা, সব গাম্ভীর্য ঠেলে একটু হাসি ঠেলে উঠল ওঁর ঠোঁটে। তার পর সেটা বেড়ে' গিয়ে বেশ একটু দুলিয়ে দিল ওঁকে। বললেন—"সে কথা মন্দ বল নি।…বেশ, দেখি ভেবে। বড় দুঃস্থা মেয়েটি, একটা উপায় যেন না করলেই নয়।"

সেইরকম অন্যমনস্কভাবে ওর মুখের দিকে চেয়েই রইলেন আবার গম্ভীর হয়ে পড়ে। দোলু ফাইলের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে এবার নূতন কি উপায়ের কথা ভাবছেন ভেবে ঘামতে লাগল।

। একচল্লিশ ।

সেদিনকার মতো ছুটি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা দুটো নিসপিস করছে, তবে রাখল কোনরকমে সামলেসুমলে নিজেকে আজ। শেষের দিকে কয়েকটা কাজ এসে পড়ায় একটু দেরিও হয়ে গেল, সরিৎদের বাড়ি যখন পৌছাল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সলিল দুজন সঙ্গীর সঙ্গে লনে খেলা করছিল, ছুটে এসে, "দোলুদা, দোলুদা"—করে ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল—"চলুন, আমায় আজ আরও খেলা শিখিয়ে দিতে হবে।"

"দাদা আসে নি ?"—ভেতরে যেতে যেতে প্রশ্ন করল দোলু।

"দাদা আসে নি ?"—ভেতরে যেতে যেতে প্রশ্ন করল দোলু।

"না, চলুন দাদার ঘরেই।"

"জ্যাঠাইমা আছেন ?"

"না।"

"শীলা ?"

"না। ওর বিয়ে দিতে হবে না ? আজ শনিবার, আমাবস্তে, তাই কালীঘাটে নিয়ে গেছেন।"

"তাই নাকি ?"—ওর বলার ঢঙে একটু হাসিই ফুটল দোলুর মুখে, বলল —"ঠিকই করেছেন; বিয়েটাও তো বলিদান, না রে ?...শনিবার আমাবস্তেই ভালো। তা কার সঙ্গে হচ্ছে বিয়ে জানিস ?"

জানে না; খুব বেশি আলোচনাও নেই বাড়িতে এ নিয়ে, তবে এত বড় একটা কথা সম্বন্ধে অজ্ঞতাটাও স্বীকার করতে রাজি নয়। দুবার "কার সঙ্গে ? কার সঙ্গে ?"—করে বলল—"ভগ্নপোতের সঙ্গে।"

এবার একটু ভালো করেই হেসে উঠল দোলু। বোনের বিয়ে হলে 'ভগ্নীপতি' হয় এ-তত্ত্বটা নিজের ভাষায় উলটে বলেছে বেচারি, হয়তো লখার কাছ থেকেই আহরণ করা; বলল—"ভগ্নপোতের সঙ্গে ? তা যা দিদি তোমার, আস্তপোত জুটলে হয়। চলো।

সিঁড়ির অর্ধেক উঠেছে, নীচে থেকে ডাক এল—"সলিল!"

"মাস্টারমশাই! আজ আরও সকাল সকাল এলেন!"—দাঁড়িয়ে পড়ে অনুযোগের নাকীস্বরে বলে উঠল সলিল।

দোলু বলল—"যাও লক্ষ্মীটি। পরশু রবিবার আছে, এসে সমস্ত দুপুর ধরে ভালো করে শেখাব।"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি তো?"

"হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি, সত্যি, যাও।"—হেসে বলল দোলু। সলিল নেমে গেল।

রসভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। পেটে এত কথা অথচ শোনাবার লোক নেই। এত ভিড় করে আসছে, আজ হয়তো জ্যাঠাইমাকেও শোনাত বাদসাদ দিয়ে। ওঁর হাসবার ক্ষমতাটা বেশ আছে। মন্থরভাবেই উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হতে গতিটা দ্রুত হয়ে উঠল; বাসবী-আলোককে ডেকে নিলে কেমন হয়? সেদিনের ব্যাপারটা ওদের শোনা আছে। ফুরুবার নয় তো, মাঝে মাঝে ওঠে কথা। আলোক নাম দিয়েছে, 'জনার্দন-হরবিলাস চরিত।'

ফোন করে জানতে পারল ওরা কেউই নেই বাড়িতে। একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছেন। খবর দিল চাকরটা।

লখাকে চা করে আনতে বলে সরিতেরই ঘরে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল আস্তে আস্তে।

সুবর্ণার কথাটাই এসে পড়ছে। অবশ্য অনন্যভাবে, একটা বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে। সত্যিই মেয়েটি ভালো। খুব দেখে নি এদিকে। চেম্বারের মধ্যেই থাকে, তবে সেই প্রথম দিন দেখা চেহারার সঙ্গে ওর এদিককার কার্যকলাপের এমন একটি সামঞ্জস্য আছে নারীজনোচিত সেবা-দাক্ষিণ্যে যে, অলস চিন্তার মধ্যে ও এক সম্পূর্ণ অন্যরূপে ফুটে উঠেছে আজ, সেই সুবর্ণাই যাকে কেন্দ্র করে ওদের এত কৌতুক-রহস্য।···কিছু করা যায় না? যদি যেতেই হয় ওকে অফিস থেকে! বেদনায় ভরে আসে মনটি—আকুলিবিকুলি করে একা একা সিগারেট টানার ফাঁকে। তারই মধ্যে একটু আশ্বাসও পায়। মিস্টার রায়ের দৃষ্টি আছে—কোন একটা উপায় করবেনই।

হর্ন্ দিয়ে সরিতের মোটর এসে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পায়ের দ্রুত উঠে আসার শব্দ আর সরিতের গলা—"সলিল! তোমার বন্ধুরা এল। কোথায়?"

এমন একটা চকিত, বাঁধনছেঁড়া উল্লাস যে, দোলু ঘর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল—"গেছলি কোথায় হতভাগা? সোজা চলে আয়—জবর খবর—আজ একেবারে অন্ধকূপ—ভিষগ্‌শাস্ত্রী!"

খট্‌ খট্‌ করে এগিয়ে আসছে পদক্ষেপ। দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে গেছে দরজার কাছে দোলু, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল—সরিৎ, আলোক, বাসবী, বাসবীর একটি ছোট ননদ, সলিলের বয়সী, ঐ বয়সেরই ওর বড় ননদের একটি ছেলে। সলিলও পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে, এদের দুজনকে দখল করে নিয়ে চলে গেল; ছুটি পেয়ে গেছে।

"আর আপনার দেওয়া নামে কুলুচ্ছে না আলোকবাবু—চরিতকথায় নতুন সংযোজন—নরহরি—হরবিলাস—হারাণচন্দ্র উপাখ্যান"—দোলু আলোকের দিকে চেয়ে কথাটা বলে, বাসবীকে বলল—"তুমিও বসো বাসু। জ্যাঠাইমা নেই, শীলাকে নিয়ে কালীঘাটে গেছেন—সলিলের ভাষায় 'ভগ্নপোতের' সঙ্গে নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে ওর।" .

সরিতের দিকে চেয়ে বলল—কৈ, এখবর তো দিস নি আমায়।"

"বিয়ের ভাবনা জন্মে পর্যন্ত ভাবছেন মা, তুই যদি এখন খবর না রাখিস। কালীঘাট অবশ্য এদিকে বেড়েছে, তার কারণ…"

হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু ক্ষুব্ধও; সবাই বুঝেছে এ ছন্দপতনের কারণটা কি। দোলু তাড়াতাড়ি কথার মোড ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"থাক ওঁর বিশ্বাসের কথা, থৈ পাব না আমরা। এদিকে শোন্, আজ আর টাইপিস্ট জিতেনের মুখে নয়, স্বকর্ণে একেবারে।"

খালি বাড়ি, মুক্ত কণ্ঠে দিয়ে যাচ্ছে বিবরণ। সুবর্ণাকে অবশ্য যতটা সম্ভব নেপথ্যে রেখেই। প্রধানত ওদের তিনজনের কথাই—হরবিলাসবাবুর সূক্ষ্মভাবে কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ—হারাণবাবুকে কাৎ করে ফেলা—নরহরিবাবুর আতঙ্কের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান—কোথাকার এক গিন্নি নিয়ে এসে বসিয়েছেন অফিসের মাঝখানে—টোট্‌কায় সেকেলে ঠান্‌দিদের নাক কাটে!

হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়ে চলল আলোচনা—আলোক মাঝে মাঝে মেয়েছেলে হিসাবে বাসবীকেও জড়িয়ে নিচ্ছে। ওদের চিরন্তন দাম্পত্য-কলহে আরও জমে জমে উঠছে।

তার পর কিন্তু হঠাৎ যেন সব ঠাণ্ডা মেরে গেল। লখা চা নিয়ে আসতে একটা যে বিরতি এল আলোচনায়, সেটা যেন আর কাটতে চায় না। প্রধানত

দোলুর জন্যই। হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। কী একটা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে একেবারে গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেছে তার মধ্যে; ওর অভাবে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আর ফিকড়িও বেরুতে পাচ্ছে না। কথা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত শব্দের মধ্যে বাকি রইল শুধু চারজনের চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সিরসিরিনিটুকু।

সরিৎ প্রশ্ন করল—"হঠাৎ কি হলো রে?—একেবারে বোবা মেরে গেলি যে।"

চায়ের কাপের ওপর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থেকে থেকে একটু হাসল দোলু, বলল—"বোবা-মেরে যাওয়ার মতনই ব্যাপার, নয়?…বলুন আলোক বাবু? কেন সবারই তো এই অবস্থা দেখছি।"

চা শেষ করে হঠাৎ উঠেও পড়ল, বলল—"তা নয়, একটা কথা মনে পড়ে গেল, এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে।…চলুন আলোকবাবু, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে যাই।"

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ওদের বাড়ি পৌঁছে নিজেও নামল; বিনা আমন্ত্রণেই। অত জরুরী কাজ বাড়িতে, ওরা বলতেও পারে নি।

নীচেই ড্রয়িংরুম, তিনজনেই গিয়ে বসল। দোলুই বলল—"আর এক কাপ করে চা হলে হতো না?"

খুব বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ওরা দুজনে ওর এই আকস্মিক পরিবর্তনে; এত দিনের পরিচয়ে এ-রূপ তো একদিনও দেখে নি। বাসবী বলল—"আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি তোয়ের করে।"

"না, তুমি উঠো না এখন; একটা কথা আছে।"—ভেতরে ভেতরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আলোক বলল—"আমি বলে আসছি।"

"না, না, বসুন।…এই যে, হয়েছে।…খোকা, তিন কাপ চা, বলে দাওগে।"

বাসবীর ননদের ছেলেটি ওপরে গিয়ে আবার নেমে আসছিল, তাকেই

বলে দিয়ে বাসবীর দিকে চেয়ে বলল—"আমি বলছিলাম, তোমার সেই তিন-কন্যার জায়গায় চতুর্থ একটিই বা নয় কেন ?"

"কে চতুর্থ ?—বিমূঢ়-ভাবেই প্রশ্ন করল বাসবী। আলোকও উত্তরের প্রতীক্ষায় সেইভাবে রইল চেয়ে।

"কেন ?—ঐ সুবর্ণা !"

"সুবর্ণা !! ঐ অফিসের মেয়েটি—যার কথা এতক্ষণ হচ্ছিল ?—"

বিশ্বাসই করতে পারছে না বাসবী। আলোকের ভ্রূযুগল একটু কুঁচকে উঠেছে।

"হ্যাঁ; কেন নয় ?"—চ্যালেঞ্জ করার মতো করে প্রশ্ন করল দোলু। আলোকের দিকে চেয়েও প্রশ্ন করল—"আপনার কিরকম মনে হয় ?"

"কিন্তু সে—সে একটা কেরানি-মেয়ে—ওঁদেরই আপিসের—আর অবস্থার দিক দিয়েও...", বাসবীই বলে চলল। যেন আশ্চর্যের আর সীমা-পরিসীমা খুঁজে পাচ্ছে না।

দোলু বলল—"অবস্থা খারাপ বলেই তো কেরানি।"

"কোথায় সরিৎদা—অতবড় ঘরের ছেলে—বিলেতফেরত—আর কোথায় একটা..."

"তোমার মুখে এ-ধরনের যুক্তি আশঙ্কা করি নি বাসু"—একটু বেদনার সঙ্গেই বলল দোলু, তার সঙ্গে বেশ কিছু ব্যঙ্গও মেশানো আছে। বলেই চলল—"একজন আধুনিক, শিক্ষিতা মেয়ে হিসেবেই করি নি আশঙ্কা। এদিকে তোমরা দল বেঁধে আন্দোলন..."

"কিন্তু দোলুদা, সরিৎদার কথাটাও তো ভাবতে হবে কাউকে ?..."

"আন্দোলনের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়াও।"—হেসে বলল আলোক।

আত্মপক্ষ সমর্থনে বাসবীও বেশ একটু সোজাসুজিই বলে উঠে আরও এগিয়ে যেতে চাইছিল, আলোকের টিপ্পনীতে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল। নিজেকে একটু ঢিলে করে দিয়ে বলল—"বাঃ, তা কেন ? অমনি ঝগড়া দেখলে তুমি ! একটা কথা বললেন, ভেবে দেখতে হবে না চারিদিক দিয়ে ? সেই কথাই বলছিলাম।"

দোলুও বুঝল নিজের দিকটা। সুবর্ণার কথাটা আজ প্রায় সমস্ত দিন অবচেতনার মধ্যে একটা সমস্যার আকারে থেকে এই সম্ভাবনার কথাটা হঠাৎ মনে উদয় হওয়ায় ও চঞ্চলই হয়ে উঠেছিল। ফলে, বিশেষ করে বাসবীর

কাছেই বাধা পেয়ে একটু যে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, কথাগুলো রূঢ় হয়ে পড়েছিল, এতে ভেতরে লজ্জিত হয়ে উঠেছে একটু।

ও-ও নিজেকে আলগা করে দিয়ে একটু হেসেই বলল—"বেশ তো, ভেবেই ছাখো না ভালো করে। পরামর্শ করবার জন্মেই তো ছুতো করে বেরিয়ে এলাম, এখনও ঠিক বুঝতেও পারছি না। এস না ভেবে দেখি।··· কৈ, আলোকবাবু তো এখনও কিছু বললেন না।"

"বাঃ। ভাই-বোনের হাতাহাতি থামিয়ে দিলাম!"

"বাবাঃ!"—বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে হেসেই ফেল বাসবী। আগেকার লজ্জার সঙ্গে এ-লজ্জা মিশে গিয়ে ওকে বাঁচালও কিন্তু এবার। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, "উঠলাম তা হলে আমি।···না দোলুদা, বসুন। আমি ঝগড়ায় হেরে পৃষ্ঠভঙ্গ দিচ্ছি না তা বলে। আসছি চায়ের কথাটা বলে দিয়ে। দেরি করছে।"

এরা দুজনে চুপ করে বসেই রইল। দোলু একজায়গায় ধাক্কা খেয়ে আর যেন তুলতে সাহস করছে না প্রসঙ্গটা, আলোকও এ নিয়ে কিছু বলছে না। তবে দুজনেই বেশ চিন্তিত। একসময় দোলু বলল—"আলোকবাবুর কিরকম মনে হলো টের পেলাম না এখনও।"

"অরিজিন্যাল (original) বৈকি।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাসবী নেমে এল। বেড়াবার শাড়ি পালটে নিয়েছে, নিজের মনটাকেও নিয়েছে গুছিয়ে, নেমেও এল বেশ শান্ত পদক্ষেপে। তবে নিতান্ত শান্তির কথা মুখে করে নয়। বসতে বসতে বলল—"না দোলুদা, ঢের চেষ্টা করলাম, মন কিন্তু কোনমতেই সায় দিচ্ছে না।···বেশ, অন্যদিক দিয়েও দেখা যাক। মেয়েছেলেদের রূপ থাকলে সব মানিয়ে যায়, তা দেখতে-শুনতে কেমন মেয়েটি?"

চুরুট বের করে ধরিয়েছে আলোক, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আমার কোন্ সেদিকে লক্ষ্য ছিল?"

"বলো না অমন অধর্মের কথা!" ঘুরে ফোঁস করে উঠল বাসবী, বলল—"তুমি বুঝি শুধু কেতকীর কাঁটার ভয়েই পালিয়ে এলে?"

"যদি গোলাপই বল নিজেকে, সেখানেও তো···"

"থাক, হয়েছে। দোলুদার সামনে আর বেহায়াপনা করতে হবে না। ···তা কেমন দেখতে-শুনতে দোলুদা?"

"ডানাকাটা পরী অবশ্য নয়, তবে তোমরা যাকে পাঁচপাঁচি অর্থাৎ মাত্র চলনসই বল তাও নয়। বেশ শ্রী-ছাঁদ আছে। বেমানান হলে আমিই কি সরিতের কথা তুলতাম?"

"কেতকীর তুলনায়?"

"গড়ন, ফীচার্স (features) ভালোই। তবে কেতকীর গ্ল্যামারটা (glamour) নিশ্চয় নেই।"

একটা নিঃশ্বাস পড়ল বাসবীর।

"দীর্ঘনিঃশ্বাস যে তবু?"—প্রশ্ন করল দোলু।

"কি জানি—সব মিলিয়ে যেন…বেশ, মামীমার মত পাবেন? তাঁর দিকটাও ভেবে দেখতে হবে তো?"—যেন এতক্ষণে একটা খুব লাগসই যুক্তি পাওয়া গেছে এইভাবে চেয়ে রইল দোলুর দিকে।

দোলু বলল—"আমি তাঁর কথা আগে ভেবেছি, তাঁদের দুজনের কথাই বলি বরং। জ্যাঠাইমার মনের মতন বলতে গেলে স্বর্ণা তো আদর্শ পুত্রবধূ। আমরা না হয় পিঠে গড়া থেকে টোট্‌কা পর্যন্ত সবটুকু হাসির পর্যায়ে ফেলে উপভোগ করছি, কিন্তু সত্যিই কি ওসবের মূল্য তাই?"—একটু অনুতপ্ত স্বরেই প্রশ্ন করল দোলু, বলল—"অন্তত ঐ একটি মানুষ যাঁর কাছে এসবের কদর আছেই এখনও। তার ওপর এর সঙ্গে যে সেবার ভাবটা জড়িয়ে রয়েছে—বুড়ো জনার্দনবাবুকে যত্ন করে খাওয়ানো, হরবিলাসবাবুর মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা—যতটুকু সাধ্যি নিজের, হারাণবাবুর চিকিৎসা—মিলিয়ে দ্যাখো বাসু জ্যাঠাইমার সংসারের সঙ্গে…"

"এর পাশে পাশে কেতকীকেও মিলিয়ে দ্যাখো না।" আলোক এবার গম্ভীর ভাবেই মন্তব্য করল।

বাসবী ঘুরে চেয়ে বলল—"ভূতের মুখে রামনাম যে?

দোলুর দিকে চেয়ে বলল—"কিন্তু আমি তো কেতকীর কথা বলছিও না।"

আলোক বলল—"বাসবী আসলে এই সুযোগে কিছু ঘটকালি কামিয়ে নিতে চায় দোলুবাবু।"

"তার মানে?"—আবার ঘুরে প্রশ্ন করল বাসবী।

"কেতকীকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিলে, স্বর্ণাকে ঢুকতে দিচ্ছ না, বাকি থাকে তোমার সেই তিন কন্যার একটি।"

"ঘটকালি পাব? আপনি কি দিয়েছিলেন মশাই?"

"সাতাশ বছরের একটি সুন্দর সুকান্তি যুবা..."

"ওঃ, সুন্দর সুকান্তি! আর কেউ তো কখনও বললে না, সুতরাং... তা হলে দেখছি তুমিও দোলুদার সঙ্গে একমত ?"

"আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার মত! দিনে কতবার করে দেখছি আর্শিতে, তবু নিজের সম্বন্ধেই বলবার অধিকার নেই।"

"ত্যাখোগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"—বলে দোলুর দিকে ঘুরে চাইল, প্রশ্ন করল—"আর মামার কথা দোলুদা ?"

"জ্যাঠাইমার মতন অতটা জোর করে বলতে পারছি না, তবে অত্যন্ত সিম্প্যাথেটিক (sympathetic) মেয়েটির ওপর। বড ভাল মেয়ে—কি উপায় করা যায়, এ তো ক'বারই শুনলাম ওঁর মুখে..."

চা এসে পড়ল। দোলু ইচ্ছা করেই ও প্রসঙ্গটা তালাচাবি এঁটে দিয়ে বলল—"আজ এই পর্যন্ত থাক। বেশ ভাল করে ভাবো বাসু, বিষয়টার নিজের মেরিটে (merit)। ইতিমধ্যে আমিও দেখি ভেবে। কথাটা হঠাৎ মনে উদয় হলো, তোমরা ছিলে সামনে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ডেকে নিয়ে এসে বললাম। আমিই বা ধীরে সুস্থে ভেবে দেখবার সময় পেলাম কোথায় যে তোমাদেয় অমত থাকলেও নিজের জিদ ধরে বসে থাকব? আপনিও ভেবে দেখুন আলোকবাবু।"

পরের দিন একেবারে ভোরের দিকেই টেলিফোনটা ঝন্ঝনিয়ে উঠল। দোলু দৈনিক কাগজটা নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছে, উঠে গিয়ে ধরল—

"কে ?"

"আমি আলোক। রাজি! বাসবীর কথাই বলছি।"

"সম্পূর্ণ তো ?"

"তা যদি জিজ্ঞেস করলেন তো আর একটা কথা বলবার লোভ হচ্ছে। আপনি হয়তো লজ্জা পাবেন।"

"বলতে পারেন। ও-জিনিসটার খুব বেশি নেই বলেই বদনাম আছে আমার।"

"কালকে বাসবীর শেষ কথা—দোলুদার একটা ফটো চেয়ে রাখতে হবে!"

"উদ্দেশ্য ?"

"নিত্যি ফুল চড়াবো।"

"না—না—না! খবরদার নয়!"—শিউরেই উঠল দোলু, বলল—"ওরা মেয়েছেলে, বড় সেন্টিমেণ্টাল (sentimental), যেদিকে ঝোঁকে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মানা করে দেবেন। একটা ফটো আমি না দিলেও যোগাড় করে নিতে ওর দেরি হবে না। কী সর্বনাশ! কোথায় সে? ডেকে দেবেন একটু?"

"ঐ আসছে নিজেই।"

বাসবী ধরল ফোন।

"বাসু, একি শুনছি, আলোকবাবুর মুখে! না! কোন মতেই নয়। তা হলে আমিই উল্‌টে এমন ভাংচি দোব, সব যাবে ভেস্তে। আমার সে ক্ষমতাও আছে।"

"এবার তা হলে অন্য ধরনের ঝগড়া ভাই-বোনে দোলুদা।" একটু হাসির সঙ্গে অদ্ভুত রকমের এক নরম স্বরে বলল বাসবী—"আমি তো মামা আর মামীমাকে এমন হাত করে নোব যে আপনি পাত্তাই পাবেন না। সে ক্ষমতা আমারও আছে।"

"না—না, লক্ষ্মী দিদিটি! কোনরকম ছেলেমানুষী করতে যাবে না। তা হলে আরও একটা কথা। আমি সমস্ত রাত ভেবে জ্যাঠাইমাকে দলে টেনে নেওয়ার একটা উপায় ঠাউরেছি। আগে সেটা হয়ে যাক। বেশ তো?"

"বেশ তা হলে।"

"হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি।"

। তেতাল্লিশ ।

একটু দুঃসাহসের কাজই করে বসল দোলু।

অবশ্য, প্রচণ্ড দ্বিধা অতিক্রম করেই। যেমন বলল—আগের রাত সমস্ত ক্ষণই ভেবেছে, তার পর আরও দুটো দিন কেটে গেল মনস্থির করে উঠতে। মিস্টার রায়ের অর্ডার যদিও কিছু বেরোয় নি সুবর্ণা সম্বন্ধে, তবু ওকে রাখা হবে কিনা এ নিয়ে আপিসের ফিস্‌ফিসানিটা ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে।

তৃতীয় দিনের কথা।

মিস্টার রায়ের আদেশমতো সুবর্ণা এক ঘণ্টা আগে ছুটি পায়। ব্রেবোর্ন্ রোড থেকে নিয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত সমস্তটাই আপিসপাড়া; ওঁর উদ্দেশ্য, আপিস

বন্ধের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই ও যেন বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। ওকে যেতে হয় ভবানীপুরের একটু ভেতরের দিকে।

এ-অফিসের ছুটি পাঁচটায়। যখন চারটে বাজতে পনেরো মিনিট বাকি আছে, দোলু ফাইল-পত্র গুছিয়ে রেখে মিস্টার রায়কে বলল—"কাজ আছে, আজ একটু আগে যাচ্ছি আমি।"

নীচে নেমে এসে ফুটপাথে দরজা থেকে হাত চার-পাঁচ তফাতে দেয়াল ঘেঁষে একটু উল্‌টো মুখে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। ঘড়িও দেখছে ঘন ঘন। ঠিক যখন চারটে বেজে মিনিট তিনেক হয়েছে, স্বর্ণা এল নেমে। একপাশে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটা রিক্‌শা ডেকে চড়ে বসল। বলল—"ডালহৌসী-স্কোয়ার।" ব্রেবোর্ন্‌ রোডে ট্রাম নেই, একটা যে বাস এল তাতে উঠল না।

রিক্‌শাটা বেশ খানিক এগিয়ে গেলে নিজের মোটরে উঠে স্টার্ট্‌ দিল দোলু। এগুতে লাগল কিন্তু খুব আস্তে আস্তেই, রিক্‌শার ওপর দৃষ্টি রেখে। ডালহৌসীর ট্রামলাইন পেরিয়ে ফুটপাথের ওপর নেমে পড়ল স্বর্ণা। ভাড়া চুকিয়ে ট্রামের অপেক্ষা করছে। দোলু খানিকটা দূরেই মোটর থেকে নেমে পাশের রেলিং ঘেঁষে এগিয়ে একেবারে পাশে গিয়ে বলল—"আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল আমার।"

"আমার সঙ্গে!!"—হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে পড়ে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে স্বর্ণার, বেশ একটু ভয় পেয়েও চারিদিকে একবার চেয়ে নিল। প্রত্যেক মুহূর্তটি অমূল্য, দোলু সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করে দিল—"আমায় আপনি আপিসে দেখে থাকবেন—মিস্টার রায়ের আপিসেই বসি—ওঁর ছেলের বন্ধু—তাই স্নেহও করেন…"

"কিন্তু এসব আমায় বলছেন কেন?"—অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে স্বর্ণা, ওকে জানিয়েই যেন চারিদিক থেকে নজরটা আবার ঘুরিয়ে আনল। লোক গিজ্‌গিজ করছে। বেগ পেতে হচ্ছে নিজেকে ঠিক রাখতে দোলুর, কিন্তু আর পেছুবার উপায় নেই। কণ্ঠস্বরকে স্থির রেখে বলল—"আছে দরকার! আমায় কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে। দেখেছেন তো আমায় ওঁর আপিসে?"

মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটু চেয়ে রইল স্বর্ণা, ভ্রূ-দুটো অল্প কুঁচকে গেছে। দোলু সাহায্য করল—"যেদিন আপনার অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্টটা হয়।"

"বেশ, বলুন।"

"আপনার কাজে একটা মস্ত বড় ফাঁড়া এসেছে···

"তাতে আপনার কি?"—চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সুবর্ণার।

দোলু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করল—"ব্যক্তিগত কিছুই নয়।···কিন্তু এভাবে পথের মাঝে আপনাকে দাঁড় করিয়ে আমার উদ্দেশ্যটা জানাবার আগে আমায় কথা দিতে হবে যে আপনি আমায়—কি বলব?—অবিশ্বাস করছেন না। তা হলে আর একটু পরিচয় দিই নিজের। আমি ওঁর ছেলের বিশেষ বন্ধু··· তার আগে আর একটা কথা—একটু ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়াতে আপত্তি আছে?"

ফুটপাথের কিনারা ছেড়ে পার্কের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। দোলু শুরু করল—"যা বলছিলাম—আমি ওঁর ছেলের বিশেষ বন্ধু, প্রায় বাড়ির ছেলের মতন, আপিসে ভালো চাকরি আমার—মিস্টার রায় নিজে ডেকে দিয়েছেন, আপনি একটু অবিশ্বাস করে ওঁকে ফোন্ করে দিলে তো আমার সব গেল। ঐ তো সামনেই টেলিগ্রাফ আপিসে পাবলিক টেলিফোন। এ-রিস্‌কটা মানে, এতখানি বিপদের ঝুঁকিটা নিতাম আমি?"

"কিন্তু আপনি আমার জন্যে এতটা···এতটা ··"

"চিন্তিত হয়ে পড়েছি কেন—এই তো?"—সেকেণ্ড দু-এক ভাবল দোলু, বলল—"আপাতত এইটুকুই জানুন—আপনাদের কথা তো শুনলাম সেদিন—কিরকম দায়ে পড়ে চাকরিটা নিতে হয়েছে। আমি এ নিয়ে—একটু চিন্তা এই জন্যেই করছি যে আমার হাতে এমন উপায় আছে যাতে আপনার চাকরিটা থেকে যেতে পারে। উন্নতিও করেন আপনি।"

"তাতে কিন্তু আপনার স্বার্থটা কি?"

এবার একটু সময় নিল দোলু ভাবতে, তার পর বলল—"হরবিলাসবাবুর মেয়ের বিয়ে হলে আপনার স্বার্থ কি? হারাণবাবুর ক্রনিক্ (chronic) অসুখ সারলে আপনার কি?"

এবার সুবর্ণা একটু চুপ করে রইল। খুবই যে মেনে নিয়েছে যুক্তিটা মুখের ভাবে এমন মনে হয় না, তবে নরম হয়ে এসেছে আর একটু। দোলু জো বুঝে আরও একটু এগুল—"এই মনোবৃত্তিটা, অর্থাৎ হাতে উপায় থাকলে অপরের জন্যে চেষ্টা করা, এটা আপনাদেরই একচেটিয়া হয়ে থাকবে?"

পারে নি মেনে নিতে, তর্কটায় যে মস্তবড় একটা ফাঁক আছে সেটা নিজেও বুঝছে দোলু, তবে ফল হলো। বোধ হয় ওদের প্রশংসা বলেই আর বাড়তে দিল না স্থবর্ণা, বলল—"বেশ, বলুন কি বলবেন; কি উপায় আছে আপনার হাতে।"

"মিস্টার রায়ের স্ত্রী অপূর্ব মানুষ, দেবী বললেও ভুল হয় না। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে বলুন একবার।"

একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটল স্থবর্ণার মুখে। দোলু বলল—"আমি ওদিকটা ঠিক করে রাখব। অত্যন্ত স্নেহ করেন আমায়।"

স্থবর্ণার হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হোল। দোলু প্রশ্ন করল—"হাসলেন যে?"

"ধর্না দোব বাড়ি গিয়ে?"

ভেতরের উত্তেজনাতেই একটু ভুল বুঝল দোলু। বলল—"আপনি একলা যাবেন কেন—বড়লোকের বাড়ি? আপনার মা সঙ্গে যাবেন।"

"আমার মাকে আপনি জানেন না বলেই বলছেন।"—মুখটা একটু কঠিন হয়ে যাওয়ায় এবার হাসিটুকুর রং একটু বদলে গেছে। একটা ট্রাম এসে পড়েছে ওদিকে, বলল—"আমি যাই তা হলে, কি বলেন?"

এগিয়ে গিয়ে কিন্তু ছেড়েই দিল ট্রামটা। দোলু একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, স্থবর্ণা ফিরে এসে বলল—"মাফ করবেন, আমার কথাগুলো বোধ হয় একটু রূঢ় হয়ে পড়েছে। তা ভিন্ন আপনি যে আমার জন্যে এতটা ভেবেছেন এর জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি, তাই ফিরে এলাম।"

"না না, তার জন্যে কি হয়েছে? আপনি যে অবিশ্বাস করেন নি আমায়—"

"সত্যিই করি নি, বিশ্বাস করুন আমায়—ভাবে বৈকি একে অন্যের জন্যে। আমি যে সত্যিই করি নি অবিশ্বাস এটা কিন্তু কি করে বোঝাই আপনাকে।"

চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে উঠেছে। দোলু আর একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসল। বলল—"আমার মোটর রয়েছে—ঐ যে ঐখানে। আপত্তি না থাকে তো আপনাকে বাড়ি পৌছে দিই। দেরি করে দিলাম খানিকটা। বাড়ির খানিকটা আগেই নেমে যাবেন না হয়।"

"কেন?"—এবার একটু অন্যভাবে হাসল স্থবর্ণা, বলল—"মোটর একেবারে আমার বাড়ির সামনে যেতে পারে না। সে কিন্তু গলিটা একটু সরু বলে। আসুন।"

। চুয়াল্লিশ ।

সুবর্ণার চাকরি যাওয়ার যে ভয় নেই সে-বিষয়ে দোলু সম্পূর্ণ নিশ্চিত। ওর উদ্দেশ্য ছিল ওকে একবার দেখিয়ে দেওয়া বরদাসুন্দরীকে, তার পর সুবিধা বুঝে কথা পাড়বে। হলো না।

তবে যা হলো তারও তুলনা নেই। ওর ইচ্ছা করছিল সোজা আলিপুরে ছুটে যায়, দুজনকে জানায় কী অপূর্ব রত্নেরই সন্ধান পেয়েছে। বিশেষ করে বাসবীকে। গরীব—কেরানি—সুন্দর কি? কথাগুলো বড় আঘাত দিয়েছিল দোলুর মনে। বাসবী অবশ্য ঘুরেছে, তবু কতকটা যেন সেই পুরনো কথা ভেবে এই নূতন রূপটা ওর সামনে ধরে দিতে ইচ্ছে করছে। সত্য সত্য।

গেল না কিন্তু। সুবর্ণাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরতে ফিরতে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। ওর সমস্ত প্ল্যান নির্ভর করছে সুবর্ণাকে একবার দেখিয়ে দেওয়ার ওপর। বিফল হলো, তার জন্য একটা মনস্তাপ তো আছেই, তা ছাড়া এখন একটা লজ্জাও ঠেলে উঠেছে মনে—হয়তো ঠিক হয় নি। উত্তেজনার মুখে এ ধরনের একটা প্রস্তাব করে বসা। মেয়েছেলেই তো।

মনটা ঝিমিয়ে রইল। সরিৎ বা আলোকদের বাড়িতে গেলে কিছুটা অন্য-মনস্কও থাকতে পারত; কিন্তু ওরা তো এখন কেউ নেই।

কিন্তু স্বভাবটাই এমন, ঝিমুনি ওকে বেশিক্ষণ কাবু করে রাখতে পারে না। বাড়িতে এসে চা খেয়ে বারান্দায় উইকার চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টনতে ওর মুখে একটু হাসিও ফুটল। সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে হঠাৎ এক অন্যরূপে ফুটে উঠেছে। প্রত্যাখ্যানে সুবর্ণার চরিত্রের যে মহত্ত্ব সেটা অবশ্য রয়েছেই, কিন্তু দোলুর মনে হলো ও যেন একটা সামান্য মেয়ের কাছে হেরে গেল—ওর এত ভেবেচিন্তে প্ল্যানটা যেন ধূলিসাৎ করে দিলে ঐ মেয়েটা। এ আবার এক অন্য ধরনের লজ্জা যা মনের কূটবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করে হাসি ফোটায় মুখে। হেরে থাকতে হবে ঐ একফোঁটা মেয়ের কাছে?

তা ভিন্ন চলবেও না তো হারলে।

আর একটা সিগারেট ধরাতে হলো। তার পর যতক্ষণে এটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে ততক্ষণে এদিকে ওর দ্বিতীয় প্ল্যান প্রস্তুত হয়ে উঠল; সম্পূর্ণ রূপেই।

সিগারেটটা বাইরে আছড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। ভবানীপুরে স্থবর্ণাদের বাড়ির দিকে দৃষ্টিটা একটু ঘুরে গেল, মুখে এবার বিজেতার হাসি ফুটে উঠেছে।...স্থবর্ণার দোষ নেই, সবটাই গুণ বরং। কিন্তু দোলুর হারাটাই যে ওর দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে কি করে।

মোটর বের করে নিয়ে চলল দোলু সরিৎদের বাড়ি; সলিলকে দরকার। সলিল স্কুল থেকে এসে গেছে। খেলছিল লনে, হর্ন্ দিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকতে ছুটে এল।—দোলু নামতে ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল—"আজ কে এসেছে বল তো দোলুদা?"

প্রশ্ন—উত্তর একসঙ্গেই এনে ফেলে—ঠিক উত্তর দিয়ে ফেললে সে একরকম হারই তো; বলল—"দিদি; বলুকে সঙ্গে করে।"

দিদি অর্থাৎ সরিতের খুড়তুত বোন অরুণা। বড় বোন। হুগলীতে শ্বশুরবাড়ি, মোটরেই চলে আসে মাঝে মাঝে।

সলিলকে উদ্দেশ করেই আসা দোলুর, ওর প্ল্যানের কি করে সূত্রপাত করবে তার মোটামুটি একটা খসড়াও ঠিক করে এসেছে, একটা আরও ভালো স্থযোগ আপনি-আপনিই এসে পড়ল। সলিল আবদার ধরল—"কাল আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে দোলুদা। কালই। পরশু ওরা চলে যাবে।"

"হঠাৎ? ওরা তো দেখেছে চিড়িয়াখানা কতবার।"

"সাদা বাঘ দেখেছে বলু? আমি বললাম, তা মানতেই চাইছে না। বলছে—সাদা বাঘ না হাতী! তা হলে রাঙা কাক হবে না কেন? কালো হরিণ হবে না কেন?"

স্থযোগটা ছাড়ল না দোলু, একটু হেসে বলল—"পাড়াগেঁয়ে তো? এর পর কোন্‌দিন বলবে মেয়ে-কেরানি বলেও কিছু নেই। সেখানে এসব তো দেখতে পায় না।"

একটু চুপ করে রইল সলিল এ বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পারল না কৌতূহলটা দমন করতে; যতটা পারল নিজেকে বাঁচিয়ে বলল—"আমি যে কেরানিই দেখিনি, নইলে মেয়ে-কেরানি কিরকম হয় ঠিক বলে দিতে পারতাম।"

"সে কিরে! কেরানি দেখেছিস বৈকি। এমন বোকার মতন কথা যেন বলুর কানে না যায়! এই তো আমি কেরানি, কোটপ্যাণ্ট পরে আপিসে যাই, খাতাপত্র লিখি, মাস গেলে মাইনে পাই। তার পর কতশত কেরানি

রোজ দশটা-এগারোটায় ট্রামে বাসে বোঝাই হয়ে আপিসে যাচ্ছে, কতরকম আপিসের সাজে। বোকার মতন কথা বলছে ছাখো সলিলটা!"

একবার ভালো করে নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত দোলুকে দেখে নিল সলিল, ফেল্টহ্যাট্‌টা পর্যন্ত মাথায় রয়েছে। প্রশ্ন করল—"মেয়ে-কেরানিরাও এইরকম করে যায়?"

দোলু বলল—"এরকম করে গেলে তো বাঁচতাম। তারা আবার যা পরে থাকে সেই কাপড়েই চলে যায়—কী হেঁসেলে যাওয়ার কাপড়, কী পুজোয় বসবার কাপড়। গিয়ে খস্ খস্ করে কলম পিষছে।"

"আমাদের বামন-ঠাকরুণের মতন?"—কোটপ্যাণ্ট পরার চেয়েও যেন আশ্চর্য লাগছে এবার সলিলের।

দোলু বলল—"কেন, তোদের আপিসেই তো আছে, জানিস না? এই ছাখো! সলিলটা এতসব জানে এদিকে, অথচ নিজেদের আপিসের অমন মেয়ে-কেরানির কথাই জানে না! হেরে বসল এবার বলুর কাছে আর কি!"

"ক'টা আছে দোলুদা?"—ভেতরে ভেতরে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

"নাঃ, আজ সলিলটার যে কী হয়েছে! সাদা বাঘ ক'টা দেখে এসেছিস চিড়িয়াখানায়? এসব জিনিস কি বেশি থাকে? তোদের অতবড় আপিস তাইতেই কোনরকমে একটি যোগাড় হয়েছে। তাও যে কতদিন রাখতে পারা যাবে বোঝা যাচ্ছে না।"

"আমি দেখব দোলুদা।"—আবদারে হাত ধরে ঝুলে পড়ল, বলল—"আমায় নিয়ে চলো কাল তোমাদের আপিসে।"

"এই তো বললি কাল সাদা বাঘ দেখতে নিয়ে যেতে হবে বলুকে সঙ্গে করে।"

"না—না—না" প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল সলিল।—"আগে কাল আমায় মেয়ে-কেরানি দেখাতে নিয়ে চলো। কোথায় থাকে আপিসে?"

"কামড়াবার ভয় নেই তো। তবু মেয়ে-কেরানিই, একটা ছোট কাঠের ঘর দেওয়া হয়েছে তাকে।"

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল সলিল, যেন উৎকট রকম কিছু একটা কল্পনা করে। হাতে দু-তিনটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"না, আমায় চলো নিয়ে। আগে মেয়ে-কেরানি। না, বলো আগে, নইলে কোনমতেই ছাড়ব না।"

"মুশকিলে ফেললে, না বললেই হতো দেখছি! আপিস তো চিড়িয়াখানা নয় যে পয়সা দিয়ে ঢুকে পড়লাম।...আচ্ছা দাঁড়া, তোর যখন এতই ইচ্ছে, সাদা বাঘ, মেয়ে-কেরানি দু-ই যাতে হয় তার ব্যবস্থা করছি। সে বরং আরও ভালই হবে। তুই একাই দেখবি কেন?—জ্যাঠাইমা, শীলা, তার পর দিদি এসেছেন, বলু আছে—সবাই দেখবি একসঙ্গে। কিন্তু সে আমার দ্বারা হবে না, তোকে জ্যাঠাইমাকে ধরতে হবে, আমায় যেমন ধরেছিস তার চেয়েও জিদ করে। অবিশ্যি বেশি জিদ বোধ হয় করতে হবে না, ওঁরাও তো দেখেন নি কেউ। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইকে বলবেন, তা হলেই আনিয়ে দেবেন উনি। ছাখ পারবি তো?"

সলিল নিজের ডান হাতটা ঘুরিয়ে বলল—"আমি কিছু খাবুই না, আনিয়ে না দিলে।"

"ঠিক আছে। কাল দুপুরে সাদা বাঘ; বলুকে তোয়ের থাকতে বলিস। আমি নিজে পারব না, গাড়ি আর লোক পাঠিয়ে দোব, দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসবে'খন। সরিৎ এসেছে?...আসে নি এখনও? তা হলে যাই এখন, ওর সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।"

"বলে দোব এলে?"

"থাক, আমি নিজেই আসব'খন।"

মোটরে উঠে স্টার্ট দিয়ে বলল—"ওরে সলিল শোন্! অবিশ্যি তোকে বলতে হবে না, বলুর মতন বোকা নয় তো। জ্যাঠাইমা, কি-শীলা, কি-দিদি—কাউকে বলবি না যে আমি শিখিয়ে দিয়েছি। কেন তা বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়?"

খুব বেশি করে ঘাড় কাৎ করে সলিল বলল—"সে আমার জিভ কেটে নিলেও বলব না।"

"হ্যাঁ, খবরদার! নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

সতর্কতার ভঙ্গিতে চোখ বড় বড় করে নিজের ঠোঁটে তর্জনী চেপে ধরে বলল—"ছাখ, এই!"

এত শীঘ্র যে ফল পাওয়া যাবে মোটেই আশা করে নি দোলু।

পরদিন একটু সকাল সকালই আপিসে গেছে, ইচ্ছাটা নয় যে সুবর্ণার সঙ্গে হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে পড়ে, মিস্টার রায় পাইপের ডগাটা মুঠোয় ধরে

যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন। দোলু দেখল মুখে অল্প একটু হাসি লেগে রয়েছে। থাকে মাঝে মাঝে আজকাল, প্রবেশ করবার সময়ই একবার দেখে নিয়ে দোলু নিজের কাজে মন দিল।

দস্তখৎ-জাতীয় প্রাথমিক কাজ সেরে নিয়ে উনি চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে দিয়ে কয়েকটা টান দিলেন পাইপে। তার পর কতক স্বগত, কতকটা দোলুকে উদ্দেশ করে বললেন—"কি আজগুবি শখ ত্যাখো দেখি! বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়…"

বেল টিপলেন, একটু অন্যমনস্কভাবেই, আর্দালি এসে দাঁড়ালে বললেন—"মিস্ চৌধুরী—নয়া লেডি-ক্লার্ক—হারানবাবুকা আফিসমে।"

সুবর্ণা উপস্থিত হলো; বেশ একটু চঞ্চল ভেতরে ভেতরে; স্বভাবতই। মিস্টার রায় বললেন—"বসো ঐ চেয়ারটায়। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?"

"আজ্ঞে…করছি চেষ্টা।"

"হ্যাঁ, করো…তোমায় অবশ্য তার জন্যে ডাকি নি আমি। আমি ডেকেছি …কী মনে করবে তুমি জানি না…"

বিব্রতভাবে একটু হাসলেন। সুবর্ণা বলল—"মনে করবার কি আছে? আপনি বলুন।"

"ইয়ে—আমার স্ত্রী (দোলুর দিকে পাইপটা ঝুঁকিয়ে)…এর জ্যাঠাইমা আর কি—একবার দেখতে চান তোমায়।"

চোখ দুটো আপনিই উঠে পড়ল দোলুর। প্রায় কালকের মতোই এক ঝলক রক্ত মুখটায় ছড়িয়ে গেছে সুবর্ণার। এবার কিন্তু সহজ লজ্জাতেই। উত্তরও অন্য ধরনের; একটু হেসেই বলল—"দেখবেন এমন কি? অবশ্য, ডেকেছেন—সে তাঁর দয়াই তো।"

"দেখবেন—মেয়ে-কেরানি কখনও দেখেন নি—একটু পাড়াগেঁয়ে গোছের স্ত্রীলোক তিনি। অবশ্য তোমায় কোন এম্ব্যারাসিং (Embarrassing) প্রশ্ন করবেন না। সেদিকে নিশ্চিন্দি থাকতে পার।"

"করলেনই বা?"—মুখ তুলে বেশ সহজভাবেই বলল সুবর্ণা। ওঁরই বারণ করে দেওয়া সম্ভব মনে করে বলল—"বাধা-নিষেধের দরকার কি? মা-র মতনই তো।"

"যাক, তা হলে আপত্তি নেই তোমার? বেশ, তা হলে এক কাজ করবে। কাল তোমায় আপিসে আসতে হবে না। সকাল সকালই আমাদের বাড়ি চলে এসো, গাড়ি যাবে। না, তোমায় একলা আসতে হবে না, তোমার মা-ও

আসবেন, আর তোমার ছোট ভাইটি। ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া—কোন অসুবিধে হবে না তাঁর। দোলুর জেঠাইমা যে কিরকম গোঁড়া সেটা আমায় দেখে বুঝতে পারবে না।”

হাসলেন। খুবই প্রসন্ন ; হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন আপত্তি করবে। যত ভদ্রভাবেই হোক, সে বড় খারাপই হতো তো।

হাসল তিন জনেই। ওর নাম করার জন্যই দোলুর মুখটা উঠে পড়েছে, “বেশ যাও”—বলতে সুবর্ণাও যেই নমস্কার করে ঘুরেছে, ওর সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল। শুধু হাসি ছাড়া অনেক কিছু তার মধ্যে। বুঝল তো কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

তার পরদিন সন্ধ্যার সময় দোলু বরদাসুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে (ব্যাপার যেন কিছু নয় ; এমনি যেমন যায় সরিতের ঘরে যাওয়ার আগে বা পরে) উনি ডেকে নিয়ে বললেন—“হ্যাঁরে, এ কি কাণ্ড! আমায় বলতে হয়। তা এতদিন ঘুণাক্ষরেই জানতে দিস নি কেউ।...কেউই নয়!”

“কি জ্যাঠাইমা?”—নিরীহভাবে প্রশ্ন করল দোলু।

“কি জ্যাঠাইমা? ন্যাকা সাজছেন ছেলে। আপিসে মেয়ে-কেরান রাখা হয়েছে তা এ্যাদ্দিন জানি না। কাল সলিল হঠাৎ আবদার ধরে বললে, দেখাতে হবে। আমি বলি—হ্যাঁরে, মেয়ে-কেরানি হয় এইটুকুই শুনেছি, তা দেখাব কোত্থেকে আমি?—না, আমাদের আপিসেই আছে—কাঠের ঘরে থাকে। খাবে না দাবে না, শেষে বলতে হলো তোর জ্যাঠাইমাকে—কুকর্ম করেছ, এখন সামলাও, দেখাতে হবে ছেলেকে।

“তা সত্যিই কুকর্ম বৈকি বাবা। গেরস্তর মেয়েকে দিয়ে কলম পেষানো এমনিই কুকর্ম ছাড়া কি? তার ওপর এ আবার একেবারে লক্ষ্মীঠাকরুণটি রে! কী শান্ত! কী কাজের! কী মিষ্টি! আমি ভাবছি হয়তো চুলছাঁটা উঁচু জুতো পায়ে এক কালা মেমসাহেব এসে দাঁড়াবে (কিছু ভাঙেন নি তো উনি, কম ইয়ে?)—কোথায় বসাব—আবার নেমন্তন্ন করে বসেছেন গুষ্টিসুদ্দু—কি খাওয়াব ভেবে সারা হচ্ছি—মোটর থেকে নামল। নেহাৎ সাদামাটা শাড়ি,

ব্লাউস, পায়ে একটা চপ্পল—সঙ্গে বুড়ি মা, ধপ্ধপ্ করছে থান কাপড়—ছেলেটিও নেহাৎ আটপৌরে। বললাম—আসুন ; তা মেয়ে-কেরানিটি কোথায় ? বলে ফেললাম বাবা, পেটে কথা রাখতে পারিনে তো। মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল—'আমিই আপনাদের আপিসে কাজ করি মাসিমা, এই আমার মা, এই ভাই।'···অবাক কাণ্ড!

"তার পর কী কাজ, কী ভাব করে নেওয়া রুণা-শীলার সঙ্গে—কী মিষ্টি কথা। ···হ্যাঁরে, তুই ভাবছিস মিছে বলছি, রুণা চলে গেছে, ডাক শীলাকে, জিজ্ঞেস কর বরং। ও তো ছাড়তেই চায় না। সন্ধ্যের সময় যখন গেল বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল। তা হবে না ? ঐটুকু সময় ছিল, তারই মধ্যে কত শিখিয়ে দিয়েছে—রান্না থেকে, হাতের কাজ, তার পর কতরকম কি···"

"রান্নাঘরেও ঢুকেছিল ?"

"জোর করে। আমি একটু ওদিকটা দেখাতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁগা, নেমন্তন্ন করে বসলেন—একটু নিজে দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে, শুধু বামন-ঠাকরুণের হাতে ছেড়ে দিলে হয় ? তা আমায় মাড়াতেই দিলে না ওদিকটা —আপনি বসুন মাসিমা, মা-র সঙ্গে গল্প করুন। আমিই না-হয় একদিন রেঁধে খাওয়াই। শীলাকে ডেকে নিলে। আর সেকি নিষ্ঠি ঐটুকু মেয়ের! একটা গরদের শাড়ি চেয়ে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে—সে যেন কোন্ গোঁসাই-ঘরের গিন্নি ঠাকুরের ভোগ রাঁধছে···"

"তা রাঁধুক, মানা করি নে।"—একটু মলিনভাবে হেসে বলল দোলু—"কিন্তু···"

"আবার কিন্তু কি বাবা ?"

"কথাটা হচ্ছে জ্যাঠাইমা, যে মেয়েকে চিরজন্ম কলম পিষে খেতে হবে, তার পক্ষে তো এসব বড়াই করার কথা নয় এমন।"

"তা যদি বললি তো আমিও বলব—ঐ মেয়ে—একটা হীরের টুকরো; ও আপিসে কলম পেষার জন্যে জন্মেছে ? বালাই! এই পাপেই না এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে দেশটা। অরাজ গেল, স্বরাজ হলো, তবু ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলুচ্ছে না, হাহাকার ঘুচছে না দেশের। এইসব পাপেই না তো কি বলব বল্ ?"

"তা তো বুঝলাম জ্যাঠাইমা। দেশের, সমাজের সেইরকম অব্যবস্থা না হলে এমন অঘটন ঘটে না। তবে ও বেচারির তো এখন দেশের কথা ভাবলে

পেট চলবে না। দেখলেন তো—ঐ বিধবা মা, ঐ একটি অপোগণ্ড ভাই।… মাকে কিরকম দেখলেন জ্যাঠাইমা?"

"সেকথা আবার জিজ্ঞেস করে বাবা? কী বিচক্ষণ মেয়েছেলে। এদিকে কী মাটির মানুষ। অথচ তারই ভেতর কী মর্য্যেদা-জ্ঞান নিজের। দুঃখ-কষ্টের সংসারই তো বাবা, নইলে ঐ সোনার প্রিতিমে মেয়েকে একগাদা পুরুষের মধ্যে চাকরি করতে দিতে রাজী হয়? আমি করলাম চেষ্টা ভেতরকার কথা জানতে, তা এমনভাবে শাক দিয়ে মাছ-ঢাকা দিয়ে গেলেন যে বুঝতে দিলেন কি একটুও?…'চলে যাচ্ছে দিদি, আপনাদের আশীর্বাদে।' …আমি বললাম—না হয় ওঁকে বলি, কি করতে পারেন মেয়ের জন্যে। আপিসে ফেলে রেখে বড়বাবু হবে, না, ডিরেক্টার হবে ওঁর মতন?…হাত দুটো আমার ধরে ফেললেন গিন্নি—'দিদি শুধু আশীর্বাদ করুন আমার মেয়েকে, কাউকে কিছু বলবেন না, ওঁর যথেষ্ট দয়া, বড় লজ্জায় পড়ে যাব আমরা।'… কত লোক এসে কতরকম ক'রে বলছে কাজের জন্যে, আমায় দিয়েও বলাচ্ছে, গিন্নির হাতের মধ্যে পেয়েও কী ভয়! মন গরীব হলেই গরীব বাবা, মন আমীর হলেই আমীর।…তুই অমন করে ভাবছিস যেন? না-হয় তুই-ই বল্, কর্তাকে বলি আমি।"

একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল দোলু। প্ল্যানের পরিণাম যাই হোক, আপাতত চাকরির ফাঁড়াটা তো কাটা দরকার। আজ চাকরি গেলে, চোখের আড়াল হয়ে পড়লে এ-মেয়ে সম্বন্ধে আর তত কার ভাবনা তখন? খুবই লুব্ধ হয়ে পড়েছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল—"নাঃ, আপনার ঐ কথাটাই ভাবছিলাম জ্যাঠাইমা—মনে গেঁথে যাওয়ার মতনই কথা তো—ঐ যে বললেন, মন গরীব হলেই গরীব। না, ওঁরা যা চান তাই দিন ওঁদের জ্যাঠাইমা—আপনার আশীর্বাদের চেয়ে আর বড় কি আছে?"

এবার উনিই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, সব কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না। পান-জর্দার অভ্যাস আছে, বিশেষ করে একটু জোরের সঙ্গে কিছু বলতে করতে হলে দরকার হয়। একটা মুখে পুরে দিয়ে বললেন —"শোন দোলু, আমি যা ঠিক করেছি, ও মেয়েকে আমি আর আপিসে যেতে দোব না, থাকবে আমার কাছে।"—মুখটা একটু শক্ত হয়ে উঠেছে।

—প্রচণ্ড একটা আশা, তার সঙ্গে তেমনি প্রচণ্ড একটা আশঙ্কাও। একটু হতভম্ব হয়ে মাথা নীচু করল দোলু। নিজের প্ল্যানের এত কাছাকাছি এসে

গেছে যে সমস্ত চৈতন্য একত্র করে প্রতীক্ষা করতে লাগল, তার পর ভয়ের দিকটা ধরেই বলল—"কিন্তু জ্যাঠামশাই তাতে…"

"চটেন তো হবে আমার সঙ্গে একচোট। আমি আর কোনমতেই ও মেয়েকে আপিসে যেতে দোব না। চাকরি করতেই হয় তো আমার করুক। আমি ঠিক করে ফেলেছি।"

ওর উগ্র কুতূহলী দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললেন—"আর, চাকরিই বা কিসের? মেয়ের মতন থাকবে, যেমন শীলা, তেমনি ও—মোটরে আসবে, যাবে—সলিলকে হলো তো একটু পড়িয়ে দিলে, শীলাকে কিছু শেখালে, যে টাকাটা আপিসে পায় আমিই সেই টাকাটা দোব।"

"কিছু শেখাল মানে?"—বিস্মিত হয়ে উঠল দোলু, বলল—"কী জানে না জ্যাঠাইমা ও? আপনাদের আমলের ভালো ভালো খাবার থেকে—চন্দ্রপুলি, মুগসামলি—যতরকম হাতের কাজ হতে পারে—তার পর গান—শ্যামাসঙ্গীত থেকে নিয়ে হালফ্যাশানের যা কিছু (সব কিছুই চাই তো আজকাল)—তার পর ঠাকুর-ঘরের দিকে নিয়ে যান, আলপনা থেকে নিয়ে পুজোপার্বণ, যতরকম ব্রত—একটা দশকর্মান্বিত ভট্টচাজ্জিকে শিখিয়ে দিতে পারে।"

"সত্যি রে!"—অবাক হয়ে শুনতে শুনতে প্রশ্ন করলেন উনি।

দোলু বলল—"থামুন, এখনও বাকি আছে। আপনি দিয়ে দিন না শীলাকে ওর হাতে—কলেজে গিয়ে হচ্ছে কি?—ধুম্বো, বাচাল, লঘুগুরু জ্ঞান নেই—ভোল ফিরিয়ে দেবে মেয়ের। এইখানেই শেষ নাকি? এর ওপর জড়ি—বুটি—টোট্‌কা—মাদুলি—জলপড়া—এই সবে তা-বড় তা-বড় সেকেলে বুড়িরা দাঁড়াক্ দিকিন্ ওর কাছে।"

পান চিবোনো বন্ধ হয়ে গেছে, "তাই নাকি রে!"—বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন বরদাসুন্দরী। বললেন—"অথচ একটু আঁচ পেতে দিলে না, এতক্ষণ যে রইল! যেমন চাপা মা তেমনি কি চাপা মেয়ে হতে হয়? পেটে এত বিদ্যে অথচ বুড়ো মানুষকে দিব্যি বুঝিয়ে দিয়ে গেল—নিরীহ গোবেচারি, ভাজামাছটি উল্‌টে খেতে জানে না! কোথায় যাব মা! আজকালকার মেয়ে!…"

ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেন আর দুলে দুলে হাসেন। প্রাণখোলা মানুষের হাসি তো খুব বড় হাসির-কথার অপেক্ষা রাখে না, মনের উদার প্রসন্নতায় আপনিই আসে বেরিয়ে।

একটু লোভ হয়েছিল বৈকি দোলুর—এনেই ফেলে আসল কথাটা, যার জন্যে ওর এত তোড়জোড়। কিন্তু ছেড়েই দিল, এত সূক্ষ্ম ব্যাপার, তাড়াতাড়ি না করাই ভালো।

। ছেচল্লিশ ।

ওঁর ওখান থেকে উঠে সরিতের ঘরের দিকে যেতে যেতে মনে হলো, ওর নিজের মুখে প্রস্তাবটা বোধ হয় না করাই ভালো। সরিৎ আসে নি তখনও। ও গিয়ে বাসবীদের নম্বর ডায়াল করল। ধরল চাকরটা, জানাল দুজনেই আছে, তবে এখুনি বেরুবে, জামাকাপড় পরা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তখনই আবার বলল—"দিদিমণি আসছেন নেমে সিঁড়ি দিয়ে।"

বাসবী এসে ধরল ফোন—

"কে?"

"আমি দোলু।"

"দোলুদা! বাঃ, দিব্যি! তার পর তিনদিন ধরে আর দেখা নেই; যেখানেই ফোন করি—নেই—নেই—নেই। হার মেনে বেরুচ্ছিলাম—বাড়ি গিয়ে বসে থাকি, দশটা, বারোটা—যতক্ষণ না ফেরেন। কত কথা রয়েছে…"

"তার চেয়ে ঢের বেশি কথা এদিকে রয়েছে, কিন্তু আমার ওখানে সুবিধে হবে না। বাড়িতেই থাকো; সরিতের ওখান থেকে কথা বলছি আমি।"

একটু পরে এসে উপস্থিত হলো। সদর বৈঠকখানা ছেড়ে নিভৃত দেখে পাশের একটা ঘরই বেছে নিল ওরা। তার পর দোলু কালকে ওদের আপিস ছাড়া থেকে সুবর্ণাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কথা বলল—সুবর্ণার তেজস্বিতা, তার সৌজন্য, শেষ পর্যন্ত দোলুর প্রথম প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সব ইতিহাসটুকু একটি একটি করে কথা ধরে।

তার পর ওর দ্বিতীয় প্ল্যান—সলিলকে মেয়ে-কেরানি দেখবার জন্য নাচিয়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আজ জ্যাঠাইমার সঙ্গে যা যা কথা হলো—সব। আজ প্রায় একটি অভঙ্গ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বিবরণটা দিয়ে গেল দোলু। শেষ করে বলল—"এবার তোমার পালা বাসু। অনেক ভেবে দেখলাম, আমার পক্ষে বিয়ের কথাটা তোলা ঠিক হবে না। অত্যন্ত ডেলিকেট্ (delicate)

ব্যাপার। আমার মনে হয় পুরো একটা দিন ওখানে থেকে, জমি তোয়ের করে ঠিক মুহূর্তটিতে, ঠিক জায়গা বুঝে তবেই আসল কথাটা তোলা ভালো। ঠিক মুড্ (mood) বুঝে। আমি একবার একটুখানির জন্যে গিয়ে এসব ঠিকমতো বোধ হয় বুঝবও না। অনেক কষ্টে আজ সামলে এসেছি।"

আলোকও সমস্ত বিবরণটা গম্ভীরভাবেই শুনে গেল আজ। শেষ হলে শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বাসবী বলল—"এতেও ফোঁস করে নিশ্বাস? কেন, ঠিক হচ্ছে না?"

"নিখুঁত সব দিক দিয়েই"—উত্তর করল আলোক—"ঠিক ম্যানেজও করে নেবে তুমি; আমি নিজে ভুক্তভোগী তো। শুধু ভাবছিলাম…"

"কি?"—বাসবীই প্রশ্ন করল।

"ভাবছিলাম…"

চুরুটটা সরিয়ে বেশ দুলে দুলেই হেসে উঠল আলোক, বলল—"ভাবছিলাম ওয়েডিং কেক্ (wedding cake) থেকে একেবারে পুলিপিঠে—হোয়াট্ এ ফল্!" (what a fall?—কী মর্মান্তিক পতন!)

আস্তে আস্তে এদের দুজনের মুখেও একটু একটু করে হাসি ফুটল—চিত্রটা কল্পনা করে; তার পর এরাও বেশ সজোরেই যোগ দিল হাসিতে। তবে, আলোকের এটা নিতান্তই সম্বন্ধীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করে নেওয়া সুযোগ বুঝে। এর পরই বাসবী যখন সরিৎকেও একবার দেখিয়ে দেওয়ার কথা বলল কোনরকমে, ও গম্ভীর হয়েই আপত্তি করল—"না, আমার মতে সেটা ঠিক হবে না। একবার 'না' বলে বসলে অপছন্দর কথা তুলে, ব্যাপার আরও জটিল হয়ে পড়তে পারে। তার চেয়ে, মেয়ে যখন সবদিক দিয়েই ভালো, একটা ঝুঁকি নেওয়াই ঠিক হবে। মামিমা হবেনই রাজী, তা থেকে আশা করা যায়, মামাও। তবে হ্যাঁ, একটা কথা তো ঠিকই—কোনরকমে ওঁর কাছেও 'হ্যাঁ'-টুকু আদায় করে নিতেই হবে।"

দোলু মনে মনে কি-সব যেন খতিয়ে দেখছিল, বলল—'সে ভার আমার।'

ব্যাপারটা এত দ্রুত চরম পরিণতির কাছাকাছি এসে পড়েছে যে তাড়াহুড়ো না করে একটু সময় দিয়ে মনটাকে গুছিয়ে নেওয়াই সমীচীন মনে হলো দোলুর। ভেবে দেখল মেয়ে না দেখিয়েই কাজ করিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটা একটু যেন ঝোঁকের মাথায় নিয়ে বসেছে। সদ্য সফলতার উৎসাহ তখন মনে,

অত ভেবে দেখে নি। সরিতের মত একজন যুবা, তার যা শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে তার যা অভিজ্ঞতা কেতকীকে নিয়ে, তাতে মনে হয় বেশ শক্তই হবে, নিতান্তই যদি অসম্ভব না হয়। অন্তত শেষ মোহাড়ার বেশ সন্তর্পণেই এগুনো ভালো।

ক'টা প্ল্যানই নিজে হতে বাতিল করে দিতে হলো। এইসময় বাড়ি-সংক্রান্ত একটা মকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত পড়ায় দিন-পাঁচেক গেল কেটে। এর পর কিন্তু এগুবার পথটা আপনা হতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

সরিতের চেম্বারের আসবাবপত্র সব তোয়ের হয়ে গেছে। নরহরিবাবুই সংবাদটা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—ডেলিভারি নিয়ে সাজিয়ে ফেলা হবে?

দোলু দেখল মিস্টার রায়ের মুখটা যেন একটু কিরকম হয়ে গেল। নরহরিবাবুর প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে, সরিৎ যে বিশেষ কোন একটা পারিবারিক কারণে আপিসে আসছে না, এটা আপিসের সবার অজানা। ফার্নিচার বেশ একটা অজুহাত ছিল এতদিন, সেটা হঠাৎ সরে যেতে ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হয়ে পড়বে।

অর্থাৎ, সরিৎ যদি এখনও আসতে না চায়। একটু ভাবলেন, তার পর ওঁর মনে পড়ে গেল, দোলুকে প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের সেই পার্টির প্ল্যানটা ঠিক হয়েছে?"

কাজের চাপে ওদিকে খেয়াল ছিল না; ভেবে দেখলেন এতে একটু সময় পাওয়া যাবে মন বোঝবার।

দোলুও বুঝে গেল উদ্দেশ্যটা, বললে—"এদিকে ক'টা দিন ভাবতে পারা যায় নি বেশ। আজই গিয়ে ঠিক করে ফেলছি দিনটা দুজনে মিলে।"

আপিস থেকে সোজা সরিৎদের বাড়ি চলে গিয়েছিল, সরিৎ কিন্তু আরও দেরি করেই এল। ভালোই হলো, যে-সময়টা হাতে পাওয়া গেল, তাতে বরদাসুন্দরীর সঙ্গে সুবর্ণার প্রসঙ্গটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুবিধা হলো। সেইরকম উচ্ছ্বসিত উনি। না, কর্তাকে বলা হয় নি এখনও, একটা পুজার হিড়িক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তবে ওকে উনি নেবেনই সরিয়ে আপিস থেকে। শীলাও ছিল, বলল—সে যবে আসবে তবে আসবে, এখন একবার শীপ্‌গির আনিয়ে দিক দোলু। একটা প্যাটার্ন্‌ দিয়ে গিয়েছিল বোনার, এক জায়গায় খট্‌কা লাগছে, বুঝিয়ে দেবে।

ওর একটা ছুতো অবশ্য। একদিনেই ভয়ানক অনুরক্ত হয়ে পড়েছে,

আলোচনায় যোগ দিল বরদাসুন্দরীর চেয়ে কম উচ্ছ্বসিত হয়ে নয়। এবার ওকে আর চটাবার দিকে গেল না দোলু। কাজে লাগাতে হবে, জ্যাঠাইমাকে হাত করতে। আদুরে মেয়ে, মিস্টার রায় পর্যন্ত চালানো যাবে।

সরিৎ এল একটু রাত করেই। কাজ সংক্রান্তই খাটুনি। দোলু যে রয়েছে সেটা আসামাত্রই জানাতে মানা করা ছিল সবাইকে, ও যখন থিতিয়ে-জিরিয়ে চায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছে, দোলু এক কাপ চা হাতে করেই গিয়ে উপস্থিত হলো ওর ঘরে, বলল—"তোর জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি; জ্যাঠাইমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। একটু বিশেষ কাজ ছিল। আজ ক্লান্ত রয়েছিস, কাল সকালেই না হয় আসবখন।"

"কাজটা কি বল না; ক্লান্ত আর কি এমন? সেই যে একটা ফ্যাচাং তুলেছিল ওদের দিক থেকে, সামলে দিয়ে এলাম। বল।"—টীপট্ থেকে চা ঢালড়ে ঢালতে বলল সরিৎ। টীপট্টা বাড়িয়ে ধরে বলল—"নিবি একটু? আয়, নে।"

দোলু কাপটা নামিয়ে বলল—"জ্যাঠামশাই আজকে সেই পার্টির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন রে। এদিকে তোর চেম্বারের ফার্নিচার সব তোয়ের হয়ে গেছে, এইবার···"

"পার্টি!"—বাধা দিয়ে বিশেষভাবে চাইল সরিৎ, অজ্ঞতার ভান করে প্রশ্ন করল—

—"কোন্ পার্টি?"

"বাঃ, অত কথা হলো!"

"ন্যাকা সাজছিস দোলু?"—এমনভাবে হাসল মুখের দিকে চেয়ে, ম্লান অথচ উৎকট ব্যঙ্গের হাসি একটা সে, ঐটুকুতেই সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ হয়ে গেল ওর। চিত্রগুলিও ফুটে উঠল দোলুর চোখের সামনে—চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখতে গিয়ে; তার পর লাইটহাউস; নিউএম্পায়ারে শুভলক্ষ্মীর নাচ, ব্যালে।

মাথা নীচু করে চা ঢালতে লাগল সরিৎ, শেষ হলে দুজনেই দুজনের কাপ তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল। এক সময় দোলু প্রশ্ন করল—"জ্যাঠামশাইকে কি বলব তা হলে? ওঁর আইডিয়া ছিল তো আপিসে আসবার বেশ একটা ফরম্যাল সেরিমনি (formal ceremony) হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের বড় কাজ পাওয়াটার বেশ একটা অ্যাড্ভারটাইজমেণ্টও

হবে একটা ওদিকে। আপিসের প্রেস্টিজটা (prestige) খুব উঁচু হয়ে গেল তো কাজটা পেয়ে।"

"তা হলে আমার কথাটাও বলি শোন। ওরকম একটা বড় জাঁকজমক করে আপিসে ঢোকবার ইচ্ছে নেই আমার। ফার্নিচারগুলোর ডেলিভারি নিয়ে সাজিয়ে ফেলতে বলুন চেম্বারটা, তোয়ের হলেই আমি এসে পড়ব। তার পর আপিসের প্রেস্টিজের জন্যে বাবা যদি দেনই পার্টি, তার সঙ্গে আমার আপিসে প্রবেশের কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

"উত্তম কথা।"—দোলু বলল ;—তুই শুধু জ্যাঠাইমার দইয়ের ফোঁটা আর ধানদুব্বো নিয়ে…"

"বরং ঐ দিকটা সামলা দিকিন্, বন্ধুর কাজ হবে।" ভীতভাবে বলে উঠল সরিৎ—"মা যে সেদিন আমায় কী ভাবে সাজিয়ে বাড়ি থেকে বের করবেন ভেবে আতঙ্কে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে! হয়তো বলে বসবেন ফেল্ট্ হ্যাটটা নামিয়ে মাথায় একটা টোপর পড়ে যা, মা মঙ্গলচণ্ডীর স্বপ্ন পেয়েছি।"

খুব একটা অভিনব আজগুবি কিছুর কথাই ভেবে বলেছে সরিৎ; কিন্তু ভাবী ঘটনার অদ্ভুত ছায়াপাতে দোলুর মুখে একটু হাসি ফুটল, বলল যা তার মধ্যেও সেই ইঙ্গিত—"তুই তো আপিস থেকে বৌ আনতে যাচ্ছিস না।"

সরিৎ বলল—"মাকে বিশ্বাস নেই, বলে দিলেই হলো কিছু একটা।"

এখান থেকে সোজা আলিপুরে চলে গেল দোলু, খানিকটা রাত হয়ে গেলেও। আলোক বলল—"নাউ ইজ দ্য টাইম (এই ঠিক সময়) দোলবাবু। সিদ্ধি অব্যর্থ, আপনি পেড়ে ফেলুন কথাটা। সুইং অব্ দ্য পেণ্ডুলাম (ঘড়ির দোলকের গতি)—এক চরমে ঠেলে উঠেছিল, এবার অন্য চরমে গিয়ে উঠতেই হবে।"

দোলু বলল—"বাসবী তোয়ের আছে তো? আমি তা হলে এইবার তুলি কথা। দেবেই সম্মতি, ওর হয়ে এসেছে।"

॥ সাতচল্লিশ ॥

দরকার হলো না কিছুরই আর।

বেলা প্রায় দুটো। নিজের টেবিলে কাজ করছিল দোলু, মিস্টার রায়ও রয়েছেন, টেলিফোনটা বেজে উঠল। উনি তুলে নিয়ে একটু শুনে প্রশ্ন করলেন—"কাকে ?—দোলুকে ?…বেশ যাচ্ছে।"

দোলুও মুখ তুলেছে, বললেন—"তোমার জ্যাঠাইমা ডাকছেন।"

ওর গাড়ি প্রবেশ করবার আগে এঁদের বাড়ির গাড়িটা গেট থেকে বেরিয়ে উল্টা দিকে চলে গেল। পাশ থেকে একটু যা আভাস পেল তাতে মনে হলো যেন দোলুর মা-ই ভেতরে বসে আছেন। মনটা অন্যদিকে, ও নিয়ে আর বিশেষ কৌতূহল জমতে পেল না। পোর্টিকোয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেতরে চলে গেল দোলু।

বরদাসুন্দরী নীচের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে কম্বলটার ওপর বসে ভাগবত পড়ছিলেন, পাশে রতন-ঝি একটা কুলোয় তিল বাছছে, এদিকে যব, আলোচাল আরও অন্য কিছু কিছু পুজার উপচার রয়েছে। দোলু আসতে বইটা মুড়ে রেখে বললেন—"এসে গেছিস ? বোস।"

আপিস থেকে আসছে বলেই সামনে একটা কুশান-চেয়ার রাখিয়ে দিয়েছেন, দোলু বসতে বসতে প্রশ্ন করল—"অসময়ে যে ডেকে পাঠিয়েছেন জ্যাঠাইমা ?"

"জ্যাঠাইমার অসময় নয়।"—একটু মুখ টিপে হাসলেন। রতন-ঝির সঙ্গে একটু দৃষ্টি-বিনিময়ও হলো আড়চোখে। সেও হেসে আবার তিল বাছায় মন দিল। বললেন—"আমি জেনেশুনেই ডাকিয়েছি এ-সময় বাবা।"

একটু থামলেন, টেপা হাসিটুকু লেগেই রয়েছে মুখে, একটু পাশে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি করে আরম্ভ করি বল্‌দিকিন্ রতন ?"

রতন তিল বাচতে বাচতে উত্তর করল—"চুরি করছ না, চামারি করছ না, একটু ভুল হচ্ছিল, শুধরে দিচ্ছ, এই তো সামান্যি কথা। বলতে অপরাধটা কি ?"

একটু পান আর একটু দোক্তা আলগোছে মুখে ফেলে দিলেন বরদাসুন্দরী—শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই, বারকয়েক চিবিয়ে নিয়ে বললেন—"আজ —কি যে বলে—সেই মেয়েটি আপিসে গিয়েছিল ? স্বর্ণার কথা বলছি।… নামটিও কি মিষ্টি—দেখেছিস রতন।"

"হবেই তো।" সংক্ষেপে উত্তর দিল রতন-ঝি। দোলু তার প্রতি প্রশ্নটার উত্তর দিল—"খোঁজ রাখি নি জ্যাঠাইমা।"

"তা রাখবে কেন?"—অহেতুক টিপ্পনী করলেন বরদাসুন্দরী। বললেন —"আসে নি, আর আসবেও না।"

দৃষ্টি নামিয়ে আড়ে চাইলেন রতন-ঝির দিকে; হাসিটুকু যাওয়া-আসা করছে দুজনের ঠোঁটে।

আসাটা আজ কাজে লাগাবে ভাবতে ভাবতে এসেছিল দোলু, যদি তেমন সুবিধা পায়; বাড়িটা বেশ খালি পাওয়া যাবে। সংকল্পটা রয়েছেও মনে, তবে কথাবার্তার গতি লক্ষ্য করে একটু যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। একবার চারিদিক থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল—"কিন্তু এখানেও তো আসে নি বলে মনে হচ্ছে জ্যাঠাইমা—মানে, যেমন আপনি বলেছিলেন আর কি।"

কেমন একটু ভয়ও হচ্ছে, মেয়েলী খেয়ালের মধ্যে পড়ে দুদিকই না যায় বেচারির।

ওদিকে দৃষ্টি-বিনিময় চলছেই দুজনের। এবার একটু বেশি সময়ও নিলেন বরদাসুন্দরী উত্তরটা দিতে, আর এক টিপ দোক্তা নিতে হলো, তার পর বললেন—"এখানে যখন আনব বিধিমতেই আনব বাবা।...আমি মেয়েটিকে নিচ্ছি দোলু, হ্যাঁ, আমার সরিতের জন্যেই। আমার চোখ খুলে দিলে রতন..."

"তা দিতে হলো বৈকি। দেখলুম—বাড়িতে এতজোড়া চোখ, কিন্তু কারুর যেন নজর নেই।"—তিল বাচতে বাচতেই বলল রতন।

বরদাসুন্দরী বললেন—"রতন বলে—ঐ লক্ষ্মীপ্রিতিমে—দেখতে শুনতে কাজেকর্মে, আচারে-নিষ্ঠেয়.—তাকে তুমি কেরানিগিরি থেকে ছাড়িয়ে বাড়ির মাস্টার করে রেখে কী উবগার করছ তার? এর চেয়ে, ছেড়ে ছাও, নেকাপড়া জানা মেয়ে, ও যেদিকে গেছে সেদিকেই উন্নতি করবে—আজকাল যখন ঐ হয়েছে, লাটের গদিতে পর্যন্ত বসছে মেয়েরা..."

"ভুল বলেছিলুম!"—মাথা নীচু করেই মন্তব্য করল রতন।

বরদাসুন্দরী বললেন—"এই কথা দোলু। না বাবা, তোমাদের কোন ওজর-আপত্তি শুনব না। ভাবলাম—আগে দোলুকে ডেকেই বলি। কিন্তু নড়চড় হবে না আমার কথা—সংসার একদিকে আর বরদাদাসী একদিকে— এই তোকে বলে দিচ্ছি দোলু।"

"আর রতনমাসি?"

"থাকবেই তো রতনমাসি।"—রতনই উত্তরটা দিল—"ভয় নাকি তোমাদের জ্যাঠামশাইয়ের ?"

চাপা উল্লাসে ভেতরটা যেন খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে দোলুর ; সাফল্য যে এভাবে নিজের পথ কেটে এগিয়ে আসবে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তর্ক কিন্তু যা আরম্ভ করল তা একটু বিপরীতই। ঠিক বিরোধিতা নয়, তবে সংশয় প্রকাশ করে বৈকি ; উনি কতদূর পর্যন্ত প্রস্তুত সেটা দেখা তো আবশ্যক। প্রশ্ন করল—"তা, জ্যাঠামশাইয়ের মত নিয়েছেন ?"

"তোমার জ্যাঠামশাই মেয়ে-কেরানি রাখবার সময় জ্যাঠাইমার মত নিয়েছিলেন ?"—তিল বাচতে বাচতেই প্রশ্ন করল রতন। দোলু একটু যে চুপ করে গেল, তার মধ্যে বরদাসুন্দরী বললেন—"দে রতনের কথার উত্তর, বড় যে জ্যাঠামশাইয়ের হয়ে ওকালতি করতে এসেছিস। তাঁর এলাকায় আমি পা দিতে যাই না, আমার এলাকায় পা দিতে এলে ··"

"আমি ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব।"—রতন-ঝির কথা। কর্তার শ্বশুরবাড়ির ঝি তো। একেবারে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন বরদাসুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করেই বললেন—"তোর বড় মুখ হয়েছে রতন। লোকে শুনলে বলবে কি ?"

আবার হেসে উঠেই সামলে নিয়ে বললেন—"বাবাঃ! কোথায় যাব মা!"

দোলু বলল—"কিন্তু আপনি যে তাঁর কেরানি ভাঙিয়ে নিচ্ছেন জ্যাঠাইমা।"

"আদালত খোলা আছে।"—আবার রতন-ঝি। একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন বরদাসুন্দরী। হাসির ঢল নেমেছে, রতনের সুরেই সুর মিলিয়ে বললেন—"খুব করেছি, যা। পাপের প্রাচিত্তির হয়েছে—একটা গেরস্তর মেয়েকে পুরুষদের মাঝখানে টেবিলে বসিয়ে···তা, হ্যাঁরে, তোকে আমি ডাকলাম কি জন্যে, আর তুই সমানে উল্টো গেয়ে যাচ্ছিস এসে অবধি!"

"বলবেন তো জ্যাঠাইমা, কেন ডেকেছেন। উল্টো গাইছি কৈ ? জ্যাঠামশাই যে কথাগুলো তুলবেন, আগেভাগে জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।"

"ছাখ্, তাই তো ? আমি ডেকেছিও তো এইজন্যে···"

তার পরেই আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন। চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন—"তুই বল্ রতন। আমার এই এক পোড়া হাসি হয়েছে, একবার যদি শুরু হলো, সব কথাতেই নাড়ি গুবুগুরিয়ে উঠবে। জ্বালা এক!"

তার পর নিজেই বললেন—"ঐ জন্তেই ডেকেছি। ভোটের তুনিয়া তো আজকাল, আমিও ভোট একাটুঠা করে যাচ্ছি। ধর যদি কর্তা উল্টে যান, তুই তখন কার দিকে ? খবরদার চাকরির কথা ভাববি নি দোলু—জ্যাঠাইমার কাছেও যা আছে…"

একবার দৃষ্টিটা আপনিই রতন-ঝির দিকে চলে গেল। সে একটু ঠোঁট টিপে হাসল।

দোলু বলল—আমার ভোট আপনার দিকেই জ্যাঠাইমা; এ ভোটা-ভুটিতে বরং যদি চাকরি থেকে রেহাই পাই…"

"বালাই, ষাট!—অলুক্ষুণে কথা শোন ছেলের!"—গম্ভীর হয়ে উঠেই আবার কৌতুকের সুরে রতন-ঝির দিকে চেয়ে বললেন—"ক'টা হলো রে রতন এদিকে ?—আমি, তুই, শীলা, রুণাকেও নোবই টেনে, দোলু—এই পাঁচ…"

"আমি আপনাকে আরও তুটো যোগাড় করে দোব জ্যাঠাইমা; বাসবী, আলোক। কিন্তু আসলটাই যে বাদ পড়ে যাচ্ছে। সরিতের কথা বলছি, সে যদি বেঁকে বসে ?"

বরদাসুন্দরী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—"মেয়েছেলে হয়ে, তা ছাড়া সরিতের মা হয়ে এত কাঁচা কাজ করি বাবা ? মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, তার পর আরও সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি। একটা ঝোঁকের মাথায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে এখন একটা ভাবনায়ই পড়ে গেছি দোলু। যদি মানুষটা 'না' বলে বসে! এতো আর জোর করে মাতুলির জল খাওয়ানো নয়।"

বললেন সব। হাতের-কাজের প্যাটার্ন বুঝিয়ে দেওয়ার নাম করে আনিয়ে নিয়েছিলেন সুবর্ণাকে; বুদ্ধিটা শীলারই। বাড়ি দেখাবার নাম করে সরিতের ঘর পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনে। একটু পরিচয়ও করিয়ে দেয় সরিতের সঙ্গে; কথা নয়, শুধু নমস্কার বিনিময়। তার পর মতটাও পেয়েছেন। অরুণাকে আনিয়ে নেন, অরুণা-শীলা মিলে আদায় করে নিয়েছে। তার পর সেইদিনই তুপুরে সবাই যখন আপিসে, ওদিকে সুবর্ণা পর্যন্ত, উনি অরুণাকে নিয়ে ওদের বাড়ি চলে যান। গিন্নির কাছে কথাটা পেড়ে ঠিকুজী নিয়ে আসেন। মিলও ভালো হয়েছে। তার পর কাল থেকে সুবর্ণার আপিসে যাওয়া বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে; বরদাসুন্দরীর পরামর্শেই বন্ধ করে দিয়েছেন সুবর্ণার মা। সুবর্ণা অবশ্য এসব কিছুই জানে না।

সবটুকু বলে বরদাসুন্দরী একটু ব্যাকুলভাবেই দোলুর দিকে চেয়ে বললেন

—"এই এতখানি এগিয়ে গিয়েছি বাবা, এখন তোরা সবাই একজোট হয়ে না দাঁড়ালে মানসম্ভ্রম যায় আমার সবার কাছে। ঐ তো বললাম—সরিতেরও মত নিয়ে রেখেছি—অবিশ্যি, নিমরাজিই এখন বলতে গেলে…"

"নিজের বিয়ে, সে নিমরাজি না হয়ে একেবারে হামড়ে পড়বে!"—রতন-ঝি সেই ভাবেই ঘাড় হেঁট করে মন্তব্য করল। বলল—"এত বাজে কথাও তুমি কইতে জান বাছা!"

"আর একটা কথা ভেবে দেখেছেন জ্যাঠাইমা?"—প্রশ্ন করল দোলু। কোন দিকটা বাদ দিয়ে রাখতে চায় না বলে আপত্তির আকারেই বলল—"বড্ড গরীব কিন্তু।"

এত অনুরোধের ওপরও আবার নূতন ফিকড়ি, বরদাসুন্দরী এবার চটে মুখ ঝামটা দিয়েই উঠলেন—"তা হলে তোর জ্যাঠাইমাকেও বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে। কোন্ এক বড়লোকের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলি শুনি?"

"তুমিও বড় আবোল-তাবোল বকছ যেন দোলু-বাবাঠাকুর…", রতন আরম্ভ করেছিল, দোলু বলল—"পেটে কিছু না থাকলে আবোল-তাবোল বকবে না লোকে? টিফিনের ঘণ্টি বাজবে, তার জায়গায় টেলিফোন—জ্যাঠাইমা ডেকে পাঠিয়েছেন। তার পর এমন বৌ নিয়ে পড়েছেন, একেবারে ভুলে বসে আছেন ছেলেদের কথা!"

রাগ ভাঙিয়ে, চা খেয়ে সোজা বাসবীদের বাড়ি চলে গেল দোলু।

পরদিন প্রায় ঐ সময়েরই কথা। আপিসে কাজ করছে, নরহরি প্রবেশ করে মিস্টার রায়কে জানালেন—সুবর্ণা চৌধুরী—সেই মেয়ে-কেরানিটি আজ তিনদিন থেকে আসছে না। ছুটি-ছাটার দরখাস্তও নেই কোন।

খুব চিন্তিত তো নয়ই, বরং মুখে একটা চিন্তার ভাব ফোটানোর করুণ প্রয়াস দেখে দোলুর মনে হলো খুশীই ভেতরে ভেতরে।

"তাই নাকি!"—বলে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাব ফোটাবার চেষ্টা দেখে দোলুর মনে হলো মিস্টার রায়েরও যেন কথাটা অজানা নয়। ফাইল থেকে চোখ তুলে ওঁর দিকে চিন্তিতভাবে একটু চেয়ে রইলেন, তার পর—"আচ্ছা দেখি ভেবে। আপনি যান"—বলে আবার ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। দোলুও কাজে মন দিল।

একটু পরে একটা দস্তখৎ বসিয়ে ফাইলটা ঠেলে রেখে চেয়ারে পিঠ দিয়ে

পাইপ ধরালেন। গোটাকয়েক টান দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"দোলু বোধ হয় শুনে থাকবে—?"

মনটা কাজে ছিলই না, দোলু মুখ তুলে প্রশ্ন করল—"কিসের কথা বলছেন?"

"সুবর্ণা যে আর আসছে না কেন; তোমার জ্যাঠাইমা বলেন নি তোমায়?"

"ও! আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল ঐ জন্যেই ডেকেছিলেন।"

"হুঁ।"—গোটাকতক টান দিলেন আবার পাইপে, তার পর প্রশ্ন করলেন—"তা তোমার মতটা কি?"

"আজ্ঞে, উনি তো দেখলাম কারুরই মতামতের অপেক্ষা রাখেন নি।"

ভেতরকার উল্লাসে আবার সেই আগেকার মতোই মুখটা আলগা হয়ে গিয়ে ওঁকেও টান দিয়ে বলা। প্রথমে পাইপের আড়ালে একটু হাসি, তার পর সে হাসি বাড়িতে বাড়তে বেশ স্পষ্ট আকারই নিল, বললেন—"বড্ড জেদী মেয়েছেলে—বড় সেল্‌ফ্-উইল্‌ড্ (self-willed)!"

হাসতেই লাগলেন। তার পর বললেন—"কাল যেমন শুনলাম, অনেকদিন ধরেই বাড়িতে একটা চক্রান্ত চলছে। সরিতের জাহাজ থেকে নামার পর থেকেই।"

একটু ভাবল দোলু, ক্ষণেকের একটু দ্বিধা। কিন্তু ওর মতামত সম্বন্ধে ওর উত্তরটাও তো দেওয়া হয় নি। ঘাড় নিচু করে বলল—"আজ্ঞে, ওটার মধ্যে আমিও ছিলাম। স্নেহ করেন বলে বোধ হয় জ্যাঠাইমা বলেন নি আপনাকে।'

আবার সেই স্বল্প হাসি বিস্তার লাভ করে দিল দুলিয়ে মিস্টার রায়কে। তারই মাঝে বেল টিপে আর্দালিকে বললেন—"নরহরিবাবু।"

উনি এসে দাঁড়ালে বললেন—"সুবর্ণা…ঐ যে মেয়েটি—ও আর আসবে না। আপনি আর একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন।"

॥ আর একটি অধ্যায় ॥

দোলু নিজেকে নিয়ে কী যে করবে বুঝে উঠতে পারছে না। প্রথমে তো আপিস থেকে ছুটে গিয়ে খবরটার বখরা দেওয়া দরকার—সরিৎ, বাসবী, আলোককে। কিন্তু পাওয়া যাবে তো এখন শুধু বাসবীকে। নাঃ, তাতে মন ভরবে না। চারজনে থাকবে, তার পর সরিৎকে কেন্দ্র করে…

কেন্দ্র করে কী—তার কিন্তু কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারছে না মনের উত্তেজনায়।

তার পর ও-ভাবটা একটু কাটলে মনে পড়ে গেল লক্ষ্ণৌয়ের পরাশর-কাকার কথা। আগে তো জানানো দরকার তাঁকেই। আশ্চর্য! সেই ভয়, সেই সংশয় সব ঘুচে গিয়ে লোকটার প্রতি কী এক অপরিসীম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় যে মনটা ভরে গিয়েছে! দোলু ভাবল এরা তো জানবেই, এদের জানানো তো একটা উল্লাস, ওঁকে জানানো একটা অবশ্যকর্তব্য যে ওর) এত অদ্ভুত একটা বিশ্বাস এসে গেছে যে, মনে হচ্ছে উনিই এমন নিপুণতার সঙ্গে জালটি পেতে রেখে গেছেন যে, ঘটনাসমাবেশ এরকম ছাড়া আর কিছু হওয়াই সম্ভব ছিল না। এমন কী, স্বর্ণা যে এইভাবে আপিসে এসে জুটবে, পরে কেতকীকে ছেড়ে যথাকালে তার সঙ্গেই সরিতের বিবাহ হবে, ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যে এটাও কি করে তাঁর সেই দূরদর্শিতার পরিণাম বলেই মনে হল দোলুর।

আগে খবর পাওনা ওঁরই।

চিঠিতে নয়, ট্রাঙ্ক টেলিফোনে। বাড়ি এসেই একটা কল্ বুক্ (Call Book) করে দিল। তার পর সেটা নাকচ করেও দিল আধঘণ্টার মধ্যে। না, সশরীরে গিয়ে দিতে হবে খবরটা। আজই যাবে বেরিয়ে রাত্রের গাড়িতে। তা হলে আর সময় কোথায়? বাড়িতে যাওয়ার কথাটা বলে দিয়ে গাড়ি বের করে বেরিয়ে গেল দোলু ছুটি নিয়ে আসতে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে। অবশ্য, লক্ষ্ণৌ নয়, হঠাৎ কানপুরে যাওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। পরে সামলে নেবে তখন।

গাড়ি থেকে নামতেই সলিল খবরটা দিল—"কে এসেছেন বলো তো।··· পারবে না, লক্ষ্ণৌয়ের কাকা—এখুনি এলেন—ঐ ঘরে।"

ব্যস্ত হয়ে কি করছিল, খবরটা দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

দোলু ডানদিকে ঘুরে গোল সিঁড়ির দু'টো করে ধাপ একসঙ্গে অতিক্রম করে উঠে গেল। উনিও ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসেছেন।

"আরে দোলু নাকি! আমি যে এখুনি তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম; যোগাযোগ ভাখো ভগবানের!"

"আর আমি যে লক্ষ্ণৌ ছুটছিলাম—আপনার ওখানেই। কখন এলেন?"

"এই সন্ধ্যের এক্সপ্রেসে। আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পেয়ে।"

"সব শুনেছেন নিশ্চয়। সব সামলে গেছে আপনার আশীর্বাদে। তার পর সম্পূর্ণ এক নতুন ডেভলপ্‌মেণ্ট (Development) সরিৎ রাজিও।"

আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে শান্তভাবে একটু হাসির সঙ্গে শুনছিলেন, বললেন—"ওতো হবেই; আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি রাজি আছ কিনা।…দাঁড়িয়ে কেন? এসো বসো।"

সামনা-সামনি হয়ে বসে ঐভাবে ঐ প্রশ্নটারই পুনরুক্তি করে মুখের ওপর বড় বড় চোখ দুটি ফেলে চেয়ে রইলেন। হাসি একটা প্রায় লেগেই থাকে চোখে।

দোলু বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—আমরা সবাই-ই তো রাজি—খুবই পছন্দ মেয়েটিকে।"

"কোন্ মেয়েটির কথা বলছ তুমি বাবাজী?"

দোলুর এতক্ষণে একটু সাড় হলো—হাসিটা যেন ওঁর সেই রহস্যময় হাসি, যার বাইরের সঙ্গে ভেতরের সম্বন্ধ থাকে না। নিজেও তখনও হাসিটা ধরে আছে, তবে কণ্ঠস্বর স্তিমিত। উত্তর করল—"কেন? স্বর্ণা—আপিসের মেয়ে-কেরানি—শুনেছেন নিশ্চয় তার কথা?"

"ও, তাই একটু কেমন কেমন ঠেকছিল। আমি শীলার কথা বলছি কিনা।"

"শীলা!!"—চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে দোলুর।

"হ্যাঁ, শীলার। আমার তো সরিতের কথা ভাববার দরকার নেই বাবাজী; অত ফুরসৎই বা কোথায়? সেবার এসে তোমায় দেখলাম, সব শুনলাম—এমন বন্ধু, নিশ্চিন্দি আছি সব আপ্‌সে ঠিক হয়ে যাবে। ওটা তো সে ধরনের কিছু ছিলও না। ওটা ছিল, ওরা যাকে বলে 'লব্'—ওরা—মানে আমরা যাদের পদে পদে নকল করতে চাইছি। জানি ও 'লব্' টেঁকবে না। আমি ভাবছিলাম শীলার কথা—যার কথা দেখলাম এরা কেউ-ই ভাবছে না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—তা—ভাববার কথা বৈকি একটা।"—যতই চেষ্টা করছে অর্থ টা ধরবার, যেন আরও গুলিয়ে ফেলছে।

"তুমিও তা হলে ভাবছিলে?—ভালো, ভালো। আমি শীলার কথা ভাবছিলাম—বাপ-মায়ের কারুর যেন লক্ষ্য নেই; তারই পাশে ভাবছিলাম তোমার কথাও। কেন রে বাপু!—এমন একটা হীরের টুক্‌রো ছেলে, অথচ কাজকর্ম কিছু করবে না, বিয়ে করবে না! শেষে দুজনের ভাবনা এক করে নিয়ে…"

"আজ্ঞে—আপনি—ওর সঙ্গে—কী যে বলে…"

"হ্যাঁ, বিয়ের কথাই। জানি তুমি নেবেই বুঝে, একটু দেরি হলো এই যা।"—হাসতে লাগলেন বুকের ওপর দাড়ি টানতে টানতে।

"—সে কি বলছেন—বিয়ে! আমার? শীলার সঙ্গে!"

"অসম্ভবটা কিসে?"

"আমি যে করবই না বিয়ে।"

"সেইটেই তো অসম্ভব বাবাজী।"

"আর ভেবে দেখুন—শীলা—সরিতের বোন—তাকে এতটুকু থেকে জানি। এত বেশি জানি যে তার বিয়ের কথা…"

"এঃ!—এবার সজোরেই হেসে উঠলেন পরাশরকাকা, বললেন—"এতো কাঁচা কথা বললে বাবাজী এত বুদ্ধিমান হয়ে? একটা মেয়ের সবটুকু জেনে নিয়েছ, যাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রই বলে গেছেন—দেবা ন জানন্তি! দেখবে কত নিত্যনতুন রহস্য…"

"তার পর—ধরুন, কেউ বলেও নি তো আমায়।" নিজের চিন্তা নিয়েই রয়েছে দোলু, প্রশ্ন করল—"আর কেউ জানেন?"

"তুমি ছাড়া সবাই। বেয়াড়া পাত্র, আমার মানা ছিল কিনা, তাই বলে নি কেউ।"

"জ্যাঠাইমা,—জানতেন তিনি?"

"আলবৎ। জানবেন না? তাঁর মেয়ে।"

"জ্যাঠামশাই?"

হাসতে হাসতে মাথা কাৎ করলেন।

"সরিৎ?"

"খুব—খুব।"

"মা?—আমাদের বাড়ির সবাই?"

অনেক আগে। মেয়ে দেখা। কুষ্ঠি-ঠিকুজি। বৌদির আবার এসব বাই আছে তো?"

"আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যেই?"

"আর কার জন্য তাঁর মাথা-ব্যথা বাবাজী? ঘটকিনীর ব্যবসা করেন না তো।" দাড়ি চুমড়ে হেসে উঠলেন। বললেন—"বলা ছিল সরিতের দিকটা ঠিক হয়ে গেলেই আমায় আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করবেন। আমিই নিজে এসে কথা পাড়ব। ওদের কারুর সাহস হচ্ছিল না তো।"

কী ভীষণ চক্রান্ত!…আজকেই আপিসে মিস্টার রায়ের ব্যবহার করা কথাটা মনে পড়ে গেল, যদিও তিনি মোটেই এ অর্থে বলেন নি। একটু মরিয়া

হয়েই বলল—"আপনি কথাই পাড়তে পারেন, এ বিয়ে কিন্তু কোনমতেই হবে না—হতে পারে না। বাঃ!…হ্যাঁ, এই যে হয়েছে! সরিৎ বলে, ওর সঙ্গে আমার সাপে-নেউলের সম্বন্ধ, জিজ্ঞেস করুন বরং তাকে ডেকে। সাপে-নেউলে বিয়ে হতে দেখেছেন কখনও—বলুন না?"

"না; তাই তো আরও ইচ্ছে হয়, কেমনটা দাঁড়ায় দেখি। সাপে-সাপে আর নেউলে-নেউলে তো নিত্যিই হচ্ছে, তাতে আর নূতনত্ব কি?"

—হাসিতে সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"হবে না কিন্তু, এই শেষ কথা বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমি চললাম সবার কাছে।"

সরিৎ বলল—"যার বিয়ে তার চাড় নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। দুনিয়া-সুদ্ধ সবাই জানে, তুই-ই যদি এখন খোঁজ না রাখিস!"

জ্যাঠাইমা মুখ ভার করে বললেন—"রক্ষে করো বাবা—একটা নিয়ে ভুগছি, তোমায় বলে আবার একটা ফ্যাসাদ বাধাই!"

রতন-ঝি যুক্তিও হাজির করল, বলল—"সরিৎ-বাবাঠাকুর ত্মাখে নি, না হয় বুঝলুম, তোমার কোন্ অদেখা অজানা নয় বাছা যে মিছে বায়নাক্কা লাগিয়েছ?"

মা বললেন—"আমি ভেবে দেখলাম, জানবিই তো একদিন। শুধু ভেবে সারা হচ্ছিলাম—এতগুলো লোকের মধ্যে কারুর কি মনে হতে নেই কথাটা! অমন একটা মেয়ে, জানা ঘর…হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত তো?"

কাউকে কিছু উত্তর দিল না দোলু।

বাইরের বারান্দায় নিঝুম হয়ে ভাবছিল। যতই ভাবছে, সব যেন একটু একটু করে মিলে যাচ্ছে।…পরাশরকাকা যেদিন ফোন্ করেন, কি কথা হলো জানবার জন্য বরদাসুন্দরীর সেই উৎকট আগ্রহ—ওর ওপর ওঁর সেই ছেলে-বেলার স্নেহটাও নূতন হয়ে ফিরে এসেছিল ইদানীং—কাছে টেনে নিয়ে বসানো, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প করা, খাওয়ানো। এক একটা কথাও যেন মাঝে মাঝে কেমন ঠেকত কানে। এই তো কালই ভোট দেওয়ার সময় বললেন—"খবরদার চাকরির ভাবনা ভাববি নি দোলু, আমার হাতেও যা

আছে !”—হঠাৎ যেন থেমেও গেলেন বলতে বলতে !···আর মা-ই না মোটরে করে বেরিয়ে গেলেন তখন ! কতদিন চলছে এরকম যাওয়া আসা ? ···হ্যাঁ, আর শীলাও কি এদিকে ওকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল ? পেয়েছিল কি কোনরকম আঁচ ?

ও এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে সরিৎ—কেতকী—সুবর্ণা নিয়ে ব্যস্ত ! ধিক্কার দিল নিজেকে দোলু—এক চক্ষুহরিণ !

কি করে বেরিয়ে আসবে এই বেড়াজালের মধ্যে থেকে তাই ভাবছিল। সরিৎদের গাড়ি এসে দাঁড়াল, এবং শীলা নামল। বারান্দায় নজর পড়তেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে গট্‌গট্‌ করে সোজা ভেতরে চলে যাচ্ছে, দোলু হঠাৎ উঠে পড়ল। হয়েছে, একেবারে গোড়ায় কোপ বসাবে ! হন্‌হন্‌ করে এগুতে এগুতে বলল—“ওরে শীলা, শোন ! তোকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। বিপদের কথা শুনিস নি বোধহয় ?”

“কৈ না তো !”—হলঘর পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শীলা, ভাসা ভাসা নিরীহ দৃষ্টি।

“তোর বিয়ে দিচ্ছে !!”

“মস্ত বড় বিপদ !”—গট্‌গট্‌ করে উঠে যেতে লাগল।

“ওরে শোন শীলা—বিয়েটা আমার সঙ্গে !—ভাবতে পারিস !···ওরে শোন—দ্যাখো, দাঁড়ায় না ! মা নেইও, যাচ্ছিস কোথায় ?”

“নেই তা জানি। আমার রাধার সঙ্গে দরকার ; ফোন করা আছে !”—সিঁড়ির মাথা থেকে উত্তর হলো।

দোলু সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলল—“কিন্তু ভেবে দ্যাখ একবার সাংঘাতিক বিপদের কথাটা। এই বিয়েতে কখনও রাজি হবি নি, দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকবি।”

“যার বিপদ সে দাঁতে দাঁত চেপে থাকুক্ বসে।”

—এবারে ওদিককার ঘর থেকে উত্তরটা ভেসে এল ; সঙ্গে সঙ্গে দুটি তরল কণ্ঠের হাসি। উঠতেই যাচ্ছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্থর পদক্ষেপে নেমে এল দোলু।

সমাপ্ত